শিশুর বিকাশ ও শিক্ষা
সুবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুর বিকাশ ও শিক্ষা

সুবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি., ডি. ফিল.
শিশুশিক্ষা শিক্ষণ বিভাগের পরিচালিকা
এবং
অধ্যাপিকা, ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন,
কলিকাতা

নিবেদন

দেশে এবং বিদেশে দীর্ঘদিন আমাকে শিশুদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। ওদের সংস্পর্শে এসে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মা-বাবা তাদের সন্তানদের স্নেহ করেন ঠিকই ; তবে শিশুদের সম্যক বিকাশের পক্ষে কোন্ পন্থা গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ পন্থাই বা বর্জনীয়, অধিকাংশেরই এ জ্ঞান না থাকায়, অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বে শিশুদের ক্ষতিই করে থাকেন। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে পরিণত জীবনের অনেক অপসংহতির মূল নিহিত থাকে শিশুকালের নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে ; অথচ আমরা যদি বিবেচনা করে, ধীরভাবে ও সহানুভূতি নিয়ে শিশুদের সঙ্গে ব্যবহার করি, তবে এসব অপসংহতি বিকাশের কোন সুযোগই থাকে না। তাই আমার স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী এবং নূতন যারা মা হয়েছেন, তাদের সহায়তা করার জন্যই এ গ্রন্থ লেখার প্রচেষ্টা।

এই গ্রন্থে দুই থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সময় সময় দেখেছি যে অভিভাবকেরা অতি অপরিণত বয়সে শিশুদের লেখা, পড়া ও গণনা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এতে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ না হয়ে,—বরং অপকারই হয়। ছাপার অক্ষরের ছোট ছোট লেখা পড়তে শিশুর চোখের ওপর চাপ পড়ে। লিখতে গেলে সূক্ষ্ম পেশীসঞ্চালনের দরকার হয়,—তা অতি শৈশবে কোন শিশুর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই বিশেষ স্তরটিকে অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরকে প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে গণ্য করে শিশুদের সেই অনুপাতে বিকশিত হতে সুযোগ দেওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়সমূহের সম্যক পরিচালনা ও পরিমার্জনা হলে, তবেই শিশু বিধিবদ্ধ জ্ঞান সহজে আয়ত্ত করতে পারে, নতুবা তার জ্ঞানলাভ যথার্থ হতে পারে না।

শিশুদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি স্বরূপ এই বইখানি লেখা হয়েছে।

এই বই লেখার ব্যাপারে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অশোককুমার সরকার মহাশয়, এবং গোখেল মেমোরিয়াল কলেজের শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষা শ্রীমতী অনিমা সিংহ পাণ্ডুলিপিটি পড়ে নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন।

শরীরতত্ত্ব স্বাস্থ্যবিধির জন্য বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালের ডঃ সুভাষ দে, খাদ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে চেতলা হেলথ সেণ্টার-এর ডঃ প্রভাস রায় ও শ্রীমতী নিভা সেনগুপ্তার নিকট আমি যথেষ্ট ঋণী। এই বইএর কয়েকটি ছবি যোধপুর পার্কের "শিশুমেলার" শিশুদের ; এ প্রসঙ্গে শিশুমেলার কর্তৃপক্ষ আমার ধন্যবাদার্হ। ছবিগুলি তুলেছেন চিত্রদীপের সত্বাধিকারী আমার আত্মীয় শ্রীঅমিয়কুমার সেন। তার তোলা ছবিতে শিশুদের স্বাভাবিক ভাবটি অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। শ্রীতুষার মিত্র যত্ন করে প্রুফ দেখার কাজটি সম্পন্ন করেছেন ; জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস বইটির প্রকাশনের দায়িত্ব বহন করেছেন। এদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কলিকাতা

সুবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ আগস্ট, ১৯৭২

সূচীপত্র

নার্সারী স্কুলে শিশুরা

নার্সারী স্কুলের
আর একটি দৃশ্য

নার্সারী বিদ্যালয়—কী ও কেন ?

নার্সারী বিদ্যালয় কি ?

নার্সারী বিদ্যালয়কে স্থূলভাবে "বিদ্যালয়" বলা হলেও, সাধারণভাবে বিদ্যালয় বা স্কুল বলতে আমরা যা বুঝি, নার্সারী বিদ্যালয় ঠিক তা নয়। স্কুলে ছেলেমেয়েরা যায় পড়াশোনা করতে, লিখতে বা অঙ্ক শিখতে। শিক্ষক-তাড়িত পুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষালয়গুলি তাই ছেলেদের নিকট কারাগারস্বরূপ।

নার্সারী বিদ্যালয় গৃহের বিকল্প নয়, একে বলা যেতে পারে গৃহের প্রসার (—not a substitute for but an expansion of the home)। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বাড়ি তৈরী করার সময় একথা স্মরণ রেখে, এগুলিকে যথাসম্ভব বসত বাড়ির ধরনের করা উচিত। এখানে কেবল সারি সারি বেঞ্চ, ডেস্ক-ভরা শ্রেণীকক্ষ থাকবে না—থাকবে বড় বড় ঘর এবং স্থানের প্রাচুর্য, যাতে ছোটরা মনের আনন্দে খেলা করতে পারে ; আর থাকবে খেলার মাঠ বা বাগান যেখানে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অবাধে ছুটোছুটি করতে পারবে ; এখানে আরও থাকবে শোবার জায়গা, রান্না ও খাবার ঘর, বাথরুম প্রভৃতি। বাড়িতে শিশু বাবা-মার কাছে যে স্নেহ ও ভালবাসা পায়, নার্সারী স্কুলে শিশু ও শিক্ষিকার মধ্যে সেরূপ প্রীতিপূর্ণ সস্নেহ আদান-প্রদানের মনোভাব বজায় থাকে। শিশু-সন্তান কোন অসুবিধায় পড়লে বা তার কোন কষ্ট হলে, বুদ্ধিমতী মা যেমন তাকে অনাবিল আদর দিয়ে আচ্ছন্ন করেন—তার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন, নার্সারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকেও তাই করতে হয়। শিশু যখন সুখী থাকে, তার নিরাপত্তাবোধ যখন ব্যাহত হয় না, তখন তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছাকে সম্মান করা এই শিক্ষিকারই কর্তব্য। মা তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য যেমন সর্বদাই উন্মুখ থাকেন, নার্সারীর শিক্ষিকাও তেমনি শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, তিনি কেবল "রুটিন মাফিক" কাজ করে যাবেন না ; সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁর মনোযোগের মধ্যমণি হবে শিশুরাই।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—এ ধরনের বড় বাড়ি, খোলা বাগান, অবারিত মাঠ—এসব তো অনেক ধনীর বাড়িতে আছে ; তবে তাদের সন্তানদের নার্সারীতে পাঠাবার প্রয়োজন কি ?

নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো যে ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সকলেরই নার্সারী বিদ্যালয়ে আসা উচিত। যে গরীব শিশু অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর কুঁড়ে ঘরে বাস করে, যার খেলার কোনও **জায়গা** নেই—খেলার কোন **সামগ্রী** নেই—যার নেই কোনও খেলার সাথী—যে শিশুর বাবা বা মা দুমুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে, আর তাদের অনুপস্থিতির দরুন শিশুরা একেবারেই অবহেলিত হয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, তাদের জন্য নার্সারী স্কুলের একান্তই প্রয়োজন—একথা সকলেই মেনে নেবেন ; কেননা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আনন্দে খেলাধুলা করে এদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয় ও নানা কু-অভ্যাস দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে ধনীগৃহের যেসব শিশু, তাদেরও নানা অভাব-বোধ থাকতে পারে। তাদের হয়তো ভাল ঘরবাড়ি, বা খোলা জায়গায় অভাব নেই, খেলার মাঠেরও প্রাচুর্য রয়েছে—রয়েছে অজস্র দামী দামী খেলনা—তবুও স্বাভাবিকভাবে বিকাশের জন্য যা যা দরকার, তারই মৌল প্রয়োজন তার মিটছে না। ধনী মা-বাবা নানা সভা-সমিতি-পার্টি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, শিশুরা অবহেলিত হয় মাইনে করা আয়ার হাতে। মায়ের স্নেহের উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, শিশুর মনের অবচেতনে অভিমানের মেঘ পুঞ্জীভূত হতে থাকে,—**জীবনের নিরাপত্তা-বোধ হারিয়ে ফেলে**, সে দিনের পর দিন অন্ধকারে অতলে তলিয়ে যায়। দামী দামী অজস্র খেলনায় তার মন ভরে না। কিছুক্ষণ এটা, কিছুক্ষণ ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অজস্র খেলনায় অর্থাৎ উপকরণের প্রাচুর্যে সে **অতিমাত্রায় উত্তেজিত** (over excited) হয়, যেটা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। Mechanical toys অর্থাৎ চাবি দিয়ে যে খেলনা চালানো যায়, তার দাম বেশী নিশ্চয়ই, কিন্তু শিশুর শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এসব খেলনা ততটা দামী নয় ; কারণ এই সকল খেলনায় **সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র** পথই আছে, অর্থাৎ চাবি দিলে ঐ খেলনা কার্যকরী হয়—অন্য উপায়ে নয় ; চাবিটি ভেঙে গেলে খেলনার আর কোনও মূল্য থাকে না। কাজেই এই ধরনের খেলনা দিয়ে খেলে শিশুরা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে—খেলে তার কোনও তৃপ্তি হয় না। অনেক অভিজাত পরিবারে দেখা যায় যে তাঁরা তাঁদের শিশুকে অন্য কারও সঙ্গে মিশতে দিতে চান না ; কারণ অন্য শিশুর সঙ্গে মিশলে তাঁদের আভিজাত্যের হানি হবে—শিশু গালাগালি,

মারামারি শিখবে – অর্থাৎ 'ছোটলোক' হয়ে পড়বে। তাঁরা চান, তাঁদের শিশুরা আদর্শ কাঁচের ঘরে থেকে একলা একলা বড় হয়ে উঠুক—তাদের বংশগৌরব বজায় রাখুক। কিন্তু একটু চিন্তা করলে, এ ব্যবস্থা যে কত অলীক মতবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা উপলব্ধি করা যায়। শিশু তো গাছপালা বা পাথর নয়— সে মানুষ, সে চায় সঙ্গী ; আর শিশুর সুষম বিকাশে সমবয়স্কদের সঙ্গ যে কতটা প্রয়োজন, তা আজকের দিনে কোন মনোবৈজ্ঞানিকের অজানা নয়। কারণ, পরস্পরের সঙ্গে সহজ আদান-প্রদানের মাধ্যমেই শিশু স্বাভাবিকভাবে সামাজিক গুণের অধিকারী হয়।

ধনী-গৃহের শিশুদের আরও একটা অসুবিধা আছে। মা-বাবা তাদের সব সময় দেখাশোনা করেন না—ফলে তারা আয়া বা দাস-দাসীর হাতে মানুষ হয়। এইসব মাইনে-করা লোকেরা অনেক সময় শিশুদের খুব অযত্ন করে, কিংবা শিশুদের সঙ্গে থেকে তাদের সব কাজে হস্তক্ষেপ করে। এতে শিশুর পক্ষে নূতন কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বাধার সৃষ্টির হয়। বড়রা সবসময় শিশুকে আগলে রাখলে অথবা সবসময় শিশুর কাজে হস্তক্ষেপ করলে—শিশুর দিক দিয়ে তা Over Protection হয়ে—তার মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটায়। যে কাজ শিশু সহজে, খুশী হয়ে, স্বাভাবিকভাবে করতে চায়, সেকাজ করতে সে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দাস-দাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ; বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক শিশু তা একেবারেই পছন্দ করে না। ধরা যাক, একটি ছোট ছেলে একটা বালতিতে একটা একটা করে নুড়ি কুড়িয়ে রাখছে। তার কাজ খুব দ্রুত হচ্ছে না ; সে হয়তো খুঁজছে, চারিদিক তাকাচ্ছে, তারপর টুক করে একটা নুড়ি নিয়ে খুশী মনে তার বালতিতে রাখছে। ছেলেটির সঙ্গে যে চাকর ছিল, সে দেখল যে শিশুটি তাড়াতাড়ি কুড়োতে পারছে না ; সে তখন তাড়াতাড়ি অনেকগুলি পাথর কুড়িয়ে এনে শিশুর বালতিতে রাখল। ভাবল, এতে শিশু খুব খুশী হবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! বালতি থেকে সবগুলি পাথর ঢেলে ফেলে দিয়ে শিশুটি প্রথমে কাঁদল, তারপর আবার নিজে একটা একটা করে পাথর কুড়োতে লাগল। এই ছোট্ট ঘটনাটির উল্লেখ করা হল এ কথাটি বোঝাবার জন্য, যে শিশু যতই ছোট হোক না কেন, তার স্বাধীন কাজে বয়স্কদের হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না ; সে নিজে যা করতে পারে, তা তার **নিজস্ব গতিতে সম্পন্ন করার** সুযোগ দিতে হবে ; সময়ের হিসাব বা বয়স্কদের মূল্যায়ণের মাপকাঠি এখানে অচল। তাছাড়া

Over Protection-এর ফলে শিশুর পরবর্তী জীবনে অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়। শিশুকে তো জীবনে বড় হতে হবে, তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং সে-সকল সমস্যার সমাধানের উপায়ই বা কি, তাও তাকে খুঁজে বের করতে হবে—নইলে সে জীবন-সংগ্রামে কোন দিনই জয়ী হবে না। যে শিশু over-protected, সে বড় হয়েও পরনির্ভর হয়ে থাকে—জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হয়েও নির্লিপ্ত ও উদাসীন থেকে সংসারে নানা অশান্তির সূত্রপাত করে।

দিনে দিনে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা পালটাচ্ছে; এখন একান্নভুক্ত পরিবার বড় একটা চোখে পড়ে না। ছোট বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর সংসার—তাতে দু' একটি ছেলেমেয়ে। সে-সব বাড়িতে যখন নূতন আর একটি শিশুর আগমন হয়, তখন প্রায়ই নবজাত শিশুর ২।৩ বৎসরের দাদা বা দিদিকে নিয়ে তাদের মা-বাবা খুব বিপদে পড়েন। আগে হয়তো ২ বা ২½ বৎসরের শিশুটি নিজে নিজেই চুমুক দিয়ে দুধ খেত, হাত দিয়ে ভাত খেত এবং ভালভাবে হাঁটতেও পারত। নূতন শিশুর জন্মের পর হঠাৎ দেখা গেল, সেই আড়াই বৎসরের শিশু চুমুক দিয়ে আর দুধ খেতে পারছে না—ঝিনুক দিয়ে বা বোতলে খেতে চাইছে; হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছে না—মাকে খাইয়ে দিতে বলছে; আরও মজার ব্যাপার, সে হাঁটতেও পারছে না—আবার হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য, একে তো নূতন বাচ্চার জন্য নানা ঝামেলা, তারপর আবার বড় শিশুর এরকম আব্দারের হেতু কি, অনেক বাবা-মাই জানেন না,—ফলে শিশুর কপালে জোটে প্রহার! কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে নবজাতকের আগমনে ছোট দাদা বা দিদির ঐরকম ব্যবহার মোটেই **অস্বাভাবিক** বা **অপ্রত্যাশিত** নয়। নূতন ভাইটি আসার ফলে শিশু তার মায়ের কোলের একাধিপত্য হারিয়েছে—হারিয়েছে তার মায়ের একান্ত মনোযোগ। এতে সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। মায়ের হারানো ভালবাসাকে ফিরে পাবার জন্য সে আবার ছোট্ট খোকাটি হয়ে যেতে চাইছে; তাই তো সে চুমুক দিতে পারে না—তাই তো তার হামা দেবার প্রচেষ্টা! পরিবারে এরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে ছোট শিশু যখন নানাভাবে দুঃখ পায়, যখন তার নিরাপত্তা-বোধ ব্যাহত হয়,—তখন নানাপ্রকারের অসামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে শিশু তার অভিব্যক্তি ঘটায়। এইসব শিশুরা নার্সারী স্কুলে এসে, মাতৃকল্পা শিক্ষিকার সাহচর্য ও সহানুভূতি লাভ করে; এখানে

অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে তার মনের বিক্ষোভ বহুল পরিমাণে দূর হয়ে যায় আর ব্যবহারও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

কবিরা চিরকাল খোকাখুকুকে মাতৃহৃদয়ের 'যুগল দেবতা' বলে অভিনন্দিত করেছেন ; কিন্তু সাধারণ বাঙালীদের বাড়িতে এই যুগল দেবতার জন্য বিশেষ কোন স্থানকে পবিত্র বলে চিহ্নিত করে আলাদা করে রাখা হয় না। আমাদের বসতবাটি যখন তৈরী হয়, তখন তা করা হয় একান্তভাবে বয়স্কদের উপযোগী করে—ছোটদের কথা তখন আমরা একদম ভুলে যাই। অতিথি-অভ্যাগত বা বন্ধুবান্ধব এলে কোথায় ড্রয়িং রুমে বসাতে হবে—সেই বসার ঘরটিকে কেমন করে সাজিয়ে রেখে, শিল্প-প্রতিভায় পরিচয় দিতে পারা যায়—রান্নাঘরে কোন্ নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আমদানি করলে অন্যদের 'চমক' লাগানো যায়, এসব দিকেই আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। বাড়িতে থাকার সময় প্রাণচঞ্চল শিশুকে তাই 'এটা করো না', 'ওটা না', 'চুপ করে বসে থাক'—এমনি ধরনের আদেশ বার বারই শুনতে হয়। বলা বাহুল্য, এসব আদেশ পালন করা শিশুর স্ব-ভাবের বিরোধী (against his own tendency)। শিশুর কৌতূহলী মন চায় জানতে ; তাই তো সে জিনিস ভাঙে, আবার জিনিস জোড়াও লাগায়। তাই তো সে গিয়ে গ্যাসের চাবি হঠাৎ ঘুরিয়ে দেয়, দেশলাই-এর বাক্সে কাঠি ঘষে দেখতে চায় আগুন জ্বলল কিনা। কথা না বলে থাকা, একেবারে চুপ করে বসে থাকা—এগুলি শিশুর প্রকৃতির একেবারেই বিপরীত ; তাই শিশুর স্বভাবজ কাজের বিরুদ্ধে আদেশ করলে, বয়স্ক ও শিশুতে সংঘাত দেখা দেয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমনি করে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাতে সহজেই শিশুরা তাদের মৌল চাহিদাগুলিকে চরিতার্থ করতে পারে ; সেখানে তার চিরজিজ্ঞাসু, বৈজ্ঞানিক মনটির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহজভাবে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। মাকে তরকারি কুটতে দেখে, ছোট মেয়ে যদি মায়ের অনুকরণে বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসে, তবে তরকারির থেকে হাতই বোধহয় বেশী কাটবে। নার্সারী স্কুলে ছোটদের এই প্রবণতাকে চরিতার্থ করার জন্য থাকে নানা রকমের রান্নাবান্নার সাজসরঞ্জাম ; সঙ্গে ছোট ছোট ভোঁতা বঁটি। ছোট শিশুরা স্বচ্ছন্দে মায়েদের মত গিন্নির কাজ করে যায় ; রক্তারক্তি হবার, অথবা নিষেধের ফলে অযথা কান্নার স্থান এখানে থাকে না।

এক একটা সংসারে কাজের তো আর অন্ত নেই। সকাল থেকে রাত্রি অবধি

সংসারের চাকা চলছে—আর এটা চালাচ্ছেন সংসারের কর্ত্রী। সংসারের নানা কাজে মায়েদের খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়, বিশেষতঃ সকালের দিকটিতে। স্বামী খেয়ে অফিসে যাবেন, ৯টায় তাঁর রান্না চাই ; বড় ছেলের জামার ইস্ত্রি করা দরকার, আজ কলেজে তার "ডিবেট" আছে ; মেয়ের রচনা লেখা দেখে দিতে হবে ; আজ আবার রান্নার লোকের অসুখ করেছে ;—এমনি বহুলতর কাজের দরুন মা যখন দিশেহারা হয়ে আছেন, তখন তিন বৎসরের শিশু তার জিজ্ঞাসু মনের চাহিদা মেটাতে এসে মাকে প্রশ্ন করে—"মা, দিনের পর রাত্রি কেন আসে ?" অথবা "আমি যে হাতুড়ি দিয়ে শব্দ করছি, তার আধখানা শব্দ কোথায় যায় ?" মায়ের অবস্থাটা তখন কেমন হয়, চিন্তা করে দেখুন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মা বলেন—"যা যা, এখন বকবক করিস্ না," অথবা—"এখন যা, দেখছিস না আমার মরার ফুরসত নেই"—বলে শিশুকে সরিয়ে দেন। এতে সাধারণ শিশুর, বিশেষ করে বুদ্ধিমান শিশুর, অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি ব্যাহত হয়। শিশু দেখে, প্রশ্ন করলে মা বিরক্ত হন ; পাছে মায়ের বিরাগভাজন হতে হয়, এজন্যে মনের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হলেও সে তা বাইরে প্রকাশ করে না। ফলে, তার মানসিক বিকাশের পথ অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মা যখন এমনিতর সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন শিশু যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য নার্সারী স্কুলে কাটায়, তবে তার জিজ্ঞাসু মনের চাহিদা বহুল পরিমাণে শিক্ষিকাই মেটাতে পারেন, কারণ শিক্ষিকাকে সেই সময় সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় না ; তিনি শিশুর জন্যেই তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করতে পারেন। তাছাড়া, মা ও শিশুর এই ক্ষণস্থায়ী ছাড়াছাড়ি উভয়ের সম্পর্ককে মধুরতর করে তোলে। মা ব্যস্ত সকালের পর, অলস মধ্যাহ্নে যখন সময় থাকে, তখন শিশু মায়ের কাছে শুয়ে বসে, তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে। তখন তার অন্তহীন জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া মায়ের কাছে ততটা সমস্যা বলে মনে হয় না।

আদর্শ নার্সারী বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর **খোলা জায়গা** থাকা একান্ত প্রয়োজন। দিনের মধ্যে অনেকটা সময় শিশু এখানে ছুটোছুটি করে খেলার সুযোগ পায়। সে খুশীমত দৌড়োতে বা বল খেলতে পারে, মই বা 'স্লিপ' চড়তে পারে, Climbing Frame বা Jungle gym-এ উঠতে পারে—কেউ তাকে মানা করে না। খোলা জায়গার প্রাচুর্যের হেতু, ছোট ছোট গাড়ি টানা, ট্রাই সাইকেল চড়া, দোলনা দোলা—এসব শিশুরা মনের আনন্দে করে। ইচ্ছা হলে শিশু

এখানে খুব জোরে চেঁচাতেও পারে (যা অনেক সময় তার আনন্দেরই অভিব্যক্তি)। এই পরিবেশে এই চীৎকারের দরুন সে বড়দের বা প্রতিবেশীর অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে না, বা তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে না। বৃষ্টির দিনে বাড়ির স্বল্প পরিসরে, ছোট্ট ঘরে আবদ্ধ থেকে শিশুরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে ; নার্সারীতে বাইরে যেমন অবারিত খেলার মাঠ, তেমনি বৃষ্টির দিনে খেলবার জন্যে আচ্ছাদনযুক্ত খোলা জায়গা আছে—তাতে আলো বাতাসের কোন অভাব নেই। এখানে বৃষ্টির দিনেও তাই খেলার মজা হয়। একেবারে স্বল্প পরিসরের অতি ক্ষুদ্র জায়গায় বন্দী হয়ে থাকাটা তিন থেকে পাঁচ বৎসরের স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত শিশুদের পক্ষে একরকম **অসম্ভব ব্যাপার**। এতে তাদের অযথা বিরক্তির ও স্নায়ুবিকারের কারণ ঘটে। খোলা জায়গায় খেলা করতে পারলে, দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া ছাড়াও, শিশুর মনের দিক দিয়ে অনেক প্রসার হয়।

শিশুর শারীরিক বিকাশের যেমন বিভিন্ন স্তর আছে, মনের বিকাশেরও তেমনি পৃথক পৃথক ধাপ আছে। তাই বিকাশোন্মুখ শিশুকে এমন ধরনের খেলনা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তার শরীর ও মন—এই দুয়েরই বিকশিত হবার সুযোগ ঘটে। অধিকাংশ জনক-জননীরই শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই ; তাই তাঁরা ভালবেসে শিশুকে যে খেলনা কিনে দেন, সেই খেলনা দ্বারা শিশুর সত্যিকার চাহিদা মেটে না। শিশুর শারীরিক বিকাশের যখন "springing up period" অর্থাৎ দ্রুত বাড়ার সময়, তখন তাকে বসে বসে খেলবার খেলনা দিলে তার তৃপ্তি হয় না ; সেই সময়ের জন্যে চাই এমন খেলনা, যার দ্বারা দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি—এসব করা চলে। আবার যে শিশু মানসিক বিকাশের এমন স্তরে পৌছেছে যে, সে তখন নিজে নিজেই সৃষ্টি করতে চায়,—তখন তাকে অন্য দামী খেলনা না দিয়ে, যদি কিছু ক্রেয়ন, রঙ্গীন পেন্সিল, রং, তুলি ও কাগজ দেওয়া যায়, অথবা কাঠের ছোট ছোট ছবি-আঁকা টুকরো দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ছবি বানাতে বলা হয় (Zigsaw Puzzle), তবে শিশুর তৃপ্তি হয় অনেক বেশী ; আর এসব কাজ ও খেলাতে শিশুর বিকাশের পথ অধিকতর সুগম হয়। শিশুর বিকাশের ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে, পিতামাতা হয়তো শিশুর জন্যে অনেক দাম দিয়ে খেলনা কিনে আনেন, কিন্তু তা শিশুর সত্যিকারের চাহিদা মেটায় না বলে, চার পাঁচ দিন খেলার পর, খেলনাটি অনাদৃত হয়ে আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা মনস্তত্ত্ব ও শিশুর

বিকাশের ধারাগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন ; তাই কোন্ কোন্ উপাদান বা ক্রীড়নক শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে প্রয়োজন, তা বেছে নিয়ে, সেভাবে শিশুদের দিতে পারেন ; এ:তে **টাকা-পয়সা, সময় ও শিশুর শক্তি**—কোনটারই অযথা **অপচয় হয় না**।

আরও একটি কথা। শিশু হয়তো খুবই শিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছে ; কিন্তু তার বাবার, অথবা বিশেষ করে মায়ের যদি মনস্তত্ত্বের জ্ঞান না থাকে, তা হলে অনেক সময় তাঁদের ব্যবহারে শিশুর **উপকার না হয়ে চরম অপকার হয়**। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা এদিক দিয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন ; তাই তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন, কেন শিশুর মনটা বিগড়ে রয়েছে, অথবা কেনই বা একটি বিশেষ শিশু অন্যদের সঙ্গে খেলতে চায় না ; কেনই বা একটি শিশু অবাধ্য একগুঁয়ে বা দুরন্ত ? কেন শিশু মিথ্যা কথা বলে বা চুরি করে ? কোন্ সময়ে শিশুকে নূতন ধরনের খেলনা দেওয়া দরকার ? ঠিক কখন শিশুর কাজে হস্তক্ষেপ করতে হবে—আর কখনই বা তাকে একা একা খেলতে বা কাজ করতে দেওয়া উচিত ; কোন্ সময় শিক্ষিকার গিয়ে ছোটদের ঝগড়া থামানো উচিত, আর কোন্ সময়ে চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন ?—এসব জ্ঞান একদিনেই হয় না। শিশুর পরিচালনা ব্যাপারে এজন্যই মায়েরা অনেক সময় সফলকাম হন না। নার্সারী বিদ্যালয়ে স্নেহে মাতৃকল্পা, শিশু মনোবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞা এবং সর্বোপরি শিশুদরদী শিক্ষিকার স্নেহচ্ছায়ায় শিশুরা অনাবিল আনন্দে যথাযথভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

পরিবেশে আমরা বলতে পারি যে (১) **খোলা জায়গা** (২) **উপযুক্ত খেলার সরঞ্জাম** (৩) **সহানুভূতিপূর্ণ এবং মনোবৈজ্ঞানিক সাহায্য** এবং (৪) **অপর শিশুর সঙ্গ**—এই চারটি নার্সারী বিদ্যালয়ের পক্ষে অপরিহার্য। আদর্শ গৃহ-পরিবেশে—পিতামাতা সুশিক্ষিত হলে—এর দুটি একক অভাব হয়তো দূর হয়, কিন্তু এদের সব কয়টির অভাব কোন একটি একক গৃহের পক্ষে দূর করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি আমরা বলব—নার্সারী গৃহেরই প্রসার, গৃহের বিকল্প নয়। যে কোনও সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে এই নার্সারী বিদ্যালয়কে শিক্ষা-ব্যবস্থাধারায় একটি **অতি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানরূপে** স্বীকৃতি দেবার দৃষ্টিভঙ্গীর একান্তই প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নার্সারী বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বয়স **সাধারণতঃ ছয় থেকে এগারোর মধ্যে**। এসব স্কুলে ভর্তি হবার পর ছেলেমেয়েদের বিধিবদ্ধভাবে লেখাপড়া আরম্ভ হয়, এবং পড়াশোনার জন্য কিছু পরিমাণে জোর দেওয়া হয়। "হাতে খড়ি" হওয়ার অর্থ ই—এখন আর খেলাধুলা নয়, এখন লেখাপড়ার সময়। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা, পড়া ও অঙ্ক—এই তিনটি বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। লেখা ও পড়ার জন্য—বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে, অর্থ বুঝে পাঠ করা, বানান শেখা, শ্রুতলিপি লেখা, হাতের লেখা, বাক্য-রচনা, শূন্য স্থান পূর্ণ করা, সত্য মিথ্যা নির্ণয় প্রভৃতি অজস্র কাজ করানো হয়। অঙ্কের জন্য যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ছাড়াও অন্যান্য জটিলতর বিষয়ের—যেমন ভগ্নাংশ বা দশমিকের—অবতারণা করা হয়। তাছাড়া আছে ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতি পাঠ, ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের প্রাচুর্য। পাঠ্য-পুস্তক জর্জরিত এই গুরু শিক্ষার ভারে শিশুমন বারেবারেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাই তো অঙ্ক বা শ্রুতলিপির ঘণ্টায় দেখা যায় শিশুর অশ্রুসজল ম্লান মুখ—নয়তো ঐ সব সময় শ্রেণীকক্ষে শিশুর অনুপস্থিতি! শিশুদের এই নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে কত মনীষীই না এই শিশু-তাড়ন ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছেন। রুশো, পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবল, মণ্টেসরী, হার্বার্ট, ডিউই, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই শিশুর মুক্তির জন্য এই পুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষা বর্জন করতে বলেছেন। রুশো বলেছিলেন—"Children should be children before they are men"—অর্থাৎ প্রাপ্ত-বয়স্ক হবার আগে শিশু শিশুই থাকবে। পেস্তালৎসী শিশুদের বই-এর কারাগার থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর Industrial School-এ হাতের কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফ্রয়েবেল তাঁর "Gifts" ও "Occupations" এবং বাগান করা, নাচ, গান, অভিনয় ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের আনন্দলোকের আভাস দিতে চাইলেন। মণ্টেসরী তাঁর ইন্দ্রিয় শিক্ষার উপাদানের মাধ্যমে ছোটদের কাজ করতে দিয়ে—তাদের প্রত্যেকেরই যে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে—তার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ডিউই-র কর্মভিত্তিক শিক্ষা, গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের আনন্দভিত্তিক ও মানুষ গড়ার শিক্ষা—এ সবই শিক্ষা-জগতে নূতন আলোর পথ দেখিয়েছে। তবুও দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও সেই

মধ্যযুগের "অচলায়তন" হয়েই রয়েছে। এতে **বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানই** একমাত্র লক্ষ্য ; বছরের শেষে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ফল কি করবে—এটাকেই ধ্রুব লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ এগিয়ে চলেন ; অন্য যা কিছু—যেমন—খেলাধুলা, সংগীত বা ছবি আঁকা—এ সবকেই মনে করা হয়—"এহো বাহ্য"।

কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারি সারি বেঞ্চে ঢাকা শ্রেণী কক্ষেরই প্রাধান্য। এক একটি শ্রেণীতে ৪০।৫০ জন শিশু থাকে। এখানে শিশুদের অধিকাংশ সময়ই চুপ করে বসে থাকতে হয়—যেন "পিনে বদ্ধ প্রজাপতি"। জায়গা থেকে উঠলে বা কথা বললেই শিক্ষকের রক্তচক্ষু ও তর্জন-গর্জনে—তক্ষুণি সেসব থেমে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে অঙ্ক, বাংলা, শ্রুতলিপি, হাতের লেখা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঘণ্টা, লাইন করা, খাতা, বই—এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক হয়ে আছে। শিক্ষকই এখানে প্রধান ; ছোটরা তাঁর মহামূল্য আদেশ অমান্য করতে ভরসা পায় না ; তাই তো অপরাহ্ণে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে, তখন শিশুদের কলকণ্ঠে জাগে কারামুক্তির আনন্দ।

তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারী বিদ্যালয়ের তফাত অনেকটাই ধরা পড়ে। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিশুরা বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট—সাধারণতঃ এরা ২½/৩ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সের হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যেখানে ৩০০ বা ৩৫০, নার্সারীর ছাত্রসংখ্যা সেখানে ৫০/৬০ জন। নার্সারীতে কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকায় ব্যক্তিগত নজর দেবার সুবিধে অনেক বেশী। প্রাক্-প্রাথমিক অর্থাৎ নার্সারী বিদ্যালয়ে "স্কুল" "স্কুল" ভাবটাই নেই। অনেক ছোটদের মুখে শুনেছি,—"আমি এখন স্কুলে যাই—আমাদেরটা খেলার স্কুল।" সত্যসত্যই শ্রেণী ক্লাস, পঠন-পাঠনের জোর-জবরদস্তিবিহীন এক আনন্দময় পরিবেশে এই প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলের নানা কাজ এগিয়ে চলে। 'All round development of the child'—অর্থাৎ শিশুর সমস্ত বৃত্তিগুলির সুষম বিকাশ—এটাকেই শিক্ষায় পথিকৃতেরা শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন ; কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে নির্ঘণ্ট আমরা দেখি, তাতে দেখা যায় যে এখানে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির ওপরই সমধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। বৎসরের শেষে পিতামাতার কাছে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়, তাতে কেবল ঐ একটি বিষয়েরই সবিশেষ উল্লেখ থাকে। প্রায় বিদ্যালয়ের রিপোর্টেই অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের কোন

পরিমাপ দেওয়া হয় না। কোনও কোনও প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে—Cumulative Record Card-এর মাধ্যমে শিশুর অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের মান জানানো হয়, কিন্তু এ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য।

নার্সারী স্কুলে শিশুর সকল বৃত্তির সুষম বিকাশের দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা হয়। শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক এবং নৈতিক—এই পাঁচটি দিকের প্রতিই এখানে শিক্ষিকারা বিশেষ নজর রাখেন। আমি নিজে যেখানে কাজ করেছি, এমন একটি নার্সারী বিদ্যালয়ের কর্মধারার কথা এখানে উল্লেখ করছি ; তা হলেই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কতটা পৃথক।

নার্সারীর কার্যসূচী

তিন বছরের টিংকু মায়ের সঙ্গে নার্সারীতে এলো বেলা ১০টায়। নার্স মোটামুটি ভাবে দেখে নিলেন, তার নাক দিয়ে জল পড়ছে কিনা—চোখ লাল কিনা অথবা গায়ে মাথায় কোন গুটি বেরিয়েছে কিনা ;—আরও দেখে নেন, টিংকুকে অস্বাভাবিক ক্লান্ত বা অসুস্থ দেখাচ্ছে কিনা! এইভাবে প্রতিটি শিশুকে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে দেবার আগে মোটামুটি ভাবে দেখে নেওয়া হয় যে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ কিনা। এরূপ দেখে নেওয়ার কারণ হল—হাম, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ ইত্যাদি সংক্রামক রোগ যাতে শিশুদের মধ্যে না ছড়ায়, এবং শিশুটি নিজে সারাদিন স্কুলে থাকার মত সুস্থ আছে কিনা, দেখে নেওয়া।

টিংকু তারপর তার টিফিনের বাক্স, ছাতা, রেইনকোট ইত্যাদি নিজের চিহ্নিত জায়গায় রেখে আসে। টিংকু নিজের নাম এখনও পড়তে পারে না ; তাই যেখানে তার জিনিস রাখা হবে, তার জন্য একটি বিশেষ চিহ্নদ্যোতক জায়গা আছে। টিংকুর দ্যোতক চিহ্ন হল একটি "বল"। সে ঐ "বল" দেখে বুঝতে পারে যে এটি তার জন্য নির্ধারিত স্থান ; তখন সে তার জিনিসপত্র ঐ স্থানে রেখে মাঠে খেলতে চলে যায়। নূতন কোন শিশু এলে, শিক্ষিকা তাকে তার নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্ন দেখিয়ে দেন।

নার্সারীতে এসে টিংকু বুঝতে পারে যে, এখানকার দিদিমণিরা তাকে অভ্যর্থনা করতে আগেই নার্সারীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন ; তাই দেখে সে খুশী মনে মায়ের হাত ছেড়ে মাকে বিদায় জানিয়ে, ছুটে চলে যায় তার বন্ধু-বান্ধবদের

সঙ্গে খেলতে। সে হয়তো খানিকক্ষণ দোলনায় দোল খায়, কিছুক্ষণ জল নিয়ে খেলে—সেখানে নৌকো ভাসায়—ছাঁকুনি দিয়ে জল ছেঁকে তোলে, পাথরের টুকরো ডুবিয়ে দেখে—আবার কাঠের বা প্লাস্টিকের খেলনা ভাসিয়েও খেলা করে। তারপর সেখান থেকে টিংকু পুতুল খেলার জায়গায় যায়। আজ আর সে পুতুল নিয়ে খেলল না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের পুতুল খেলা দেখল ও তাদের সঙ্গে কথা বলল।

তারপর টিংকু গেল বালি দিয়ে খেলতে। ওখানে আগেই আরও ছেলেমেয়ে বালি নিয়ে খেলা করছিল। টিংকু একটা ছোট পাত্র বালি দিয়ে ভরে, তারপর সাবধানে তা উলটে ফেলল, আর বলে উঠল—"দেখ, দেখ, আমি কেমন সন্দেশ বানিয়েছি। অন্য আর একটি বাচ্চা পারছিল না, টিংকু তাকে সন্দেশ বানাতে সাহায্য করল। খেলার সময় কিছু বালি এদিক-ওদিক পড়ে ছিল; টিংকু একটা ঝাঁটা এনে সেগুলো এক জায়গায় জড় করল; এখানে শিক্ষিকা এসে টিংকুকে ঝাঁটা কি করে ধরতে হয়, তা শিখিয়ে দিলেন। ছোট্ট 'মণি' ছুটে এসে বালিগুলি ঠিকমত জায়গায় তুলে রাখতে টিংকুকে সাহায্য করল—এতে টিংকুর কোন আপত্তি হল না।

এখান থেকে টিংকু গেল "রান্নাবান্না" খেলার জায়গায়। সেখানে অন্য ছেলে-মেয়েরা কেউ কুটনো কুটছে, কেউ বাটনা বাটছে, কেউ বা বিনা আগুনে রান্নাও করছে। টিংকু অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর শিল-নোড়া নিয়ে বাটনা বাঁটতে বসল। জল আর ইটের গুঁড়ো দিয়ে সে মনের আনন্দে অনেক মসলা তৈরী করল, আর বলতে লাগল—"আজ আমাদের অনেক রান্না হবে—মাছ হবে, মাংস হবে, চাটনি আর পায়েস হবে। আজ নেমন্তন্ন।" এমন সময় শিক্ষিকা এসে টিংকুর পাশে দাঁড়ালেন; ধীরে ধীরে বললেন—"টিংকু, কাল আবার রান্নাবানা খেলা হবে।—একটু পরেই আমরা ঘরে যাব, এখন তোমার জিনিসপত্র আস্তে আস্তে গুছিয়ে নাও।" টিংকু আরও দু' এক মিনিট খেলল; তারপর সে বাসন-কোসন গুছিয়ে ঝুড়িতে তুলতে লাগল। এমন সময় মিষ্টি একটা বাজনা বেজে উঠল—ছোটরা বুঝতে পারল এখন তাদের একত্র হতে হবে। তারা আস্তে আস্তে কাঠের ব্লক, পুতুল, খেলনাবাটি প্রভৃতি—যে যা নিয়ে কাজ করছিল,—সব গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে এল।

১১টার সময় একটু জল খেয়ে ও বাথরুমে গিয়ে টিংকু আর তার অন্যান্য

সঙ্গীরা এসে ঘরে বসল। সেখানে তারা প্রথমে গ্রামোফোনে কোন গান বা বাজনা শুনল ; তারপর শিক্ষিকার নির্দেশে সমবেতভাবে গান করল বা ছড়া কবিতা বলল ; কোনদিন Percussion Band-ও বাজাল। শিক্ষিকা এক একদিন এক একটি শিশুকে—সে সেদিন স্কুলে আসার সময় পথে কি দেখেছে, তা বলতে বলেন ; অথবা রথের মেলায় শিশুটি কি কিনেছে, তা জানতে চান ; শিশু সাধ্য অনুসারে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করে। প্রয়োজন হলে শিক্ষিকা শিশুর ভুল সংশোধন করে, তাকে ঠিকমত উত্তর দেবার জন্যে উৎসাহিত করেন।

এরপর প্রার্থনা-সংগীত। টিংকু আর সব শিশুদের সঙ্গে হাত জোড় করে "ছোট শিশু মোরা, তোমারি করুণা"—এই গানটি শান্ত ও গম্ভীর হয়ে গাইল। এই গানের পর শিশুরা বয়স-অনুযায়ী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দলগত কাজ করে। এই কাজের সময় ১১-৩০ থেকে ১২-৩০। এই একটি ঘণ্টা ঠিক একই কাজ করা চলে না—কারণ এত দীর্ঘ সময় অত ছোট শিশুরা একটানা মনোযোগ দিতে পারে না। নূতন ছড়া, কোন নূতন খেলা বা গান তারা শেখে—আর আনন্দের সঙ্গে কোন সৃজনাত্মক কাজ করে। ছবি আঁকা, মাটির কাজ—এসবে টিংকুর খুব আনন্দ। যারা টিংকুর থেকে বয়স বড়, তাদের এই সময়টা সৃজনাত্মক কাজ ছাড়াও, পড়া বা অঙ্কের জন্য প্রস্তুতিপর্বে ব্যয় করা হয়। যাদের পাঁচ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাদের পঠন-পাঠনও এ সময়টাতে হয় কোন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে—এখানে কোন পাঠ্য-পুস্তক অনুসরণ করা হয় না।

দলগত কাজের পর হাত ধোয়া, বাথরুমে যাওয়া ও খাওয়া। এতে সময় দেওয়া হয় ১২-৩০ থেকে ১-১৫ পর্যন্ত। ছোটরা বাথরুমে গিয়ে, নীচু বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে এসে নিজের নিজের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া তোয়ালে দিয়ে মুছে নেয়। তারপর নিজেই প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে, এবং নিজের টিফিনের বাক্স নিয়ে খেতে বসে। শিক্ষিকা বা সাহায্যকারিণী প্রয়োজনমত কারো বাক্স খুলে দেন, কারো ফল কেটে দেন অথবা লেবুর রস করে দেন। একেবারে ছোট শিশু যখন প্রথম নার্সারীতে আসে, সে তখন হয়তো জানে না কি করে নিজে নিজে খেতে হয় ; কারণ এতদিন পর্যন্ত বাড়িতে মা-ই তাকে খাইয়ে দিয়েছেন। শিক্ষিকা এখানে এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করেন,—কিন্তু তিনি সব সময়ই তাকে খাইয়ে দেন না। খাওয়ার পর শিশুরা নিজেদের থালা, গ্লাস নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে দেয় ; লেবুর খোসা, কলার খোসা, কেকের কাগজ—এসব তুলে নিয়ে একটা

বালতিতে ফেলে; নিজের টিফিনের কৌটো নিজের জায়গায় রেখে তারপর জল খায় ও হাতমুখ ধোয় এবং নিজের তোয়ালেটি বেছে নিয়ে হাত-মুখ মুছে ফেলে।

এরপর শোবার পালা। ১-১৫ থেকে ২-৪৫ পর্যন্ত। শুতে যাবার আগে শিশুরা জুতো, মোজা খুলে নিজ নিজ জায়গায় রাখে; শিক্ষিকা/সাহায্যকারিণী প্রয়োজনমত জুতোর ফিতে খুলতে সাহায্য করেন। তারপর তারা ঘুমোতে যায়। বিশেষ কোন শিশু যদি কোন বিশিষ্ট কারণে উদ্বেগ বোধ করে, তবে শিক্ষিকা তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন—হয়তো শোবার পর তার গায়ে একটু হাতও বুলিয়ে দেন; কিন্তু সচরাচর কাউকে "থাপড়ে" ঘুম পাড়াবার প্রয়োজন হয় না। পর্দাগুলো টেনে, ঘরটাকে খানিকটা অন্ধকার করে, গরমের দিনে পাখা চালিয়ে দিলে একটা নীরব, শান্ত ও শীতল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সেখানে পরিশ্রান্ত শিশুরা সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

২-৪৫-এ তাদের ঘুম থেকে ওঠার সময়। কারো ঘুম হয়তো আগেই ভাঙে—তবু সে চুপ করে শুয়ে থাকে। ঘুম থেকে ওঠার পর বাথরুমে যাওয়া, জুতোমোজা পরা, চুল আঁচড়ানো ও জামা-কাপড় ঠিক করার কাজ। প্রথম প্রথম সাহায্য করতে হয়েছে, এখন টিংকু নিজেই পারে। জুতোমোজা পরে, সে নিজেই নির্দিষ্ট চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায়—হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এক মিনিট দেখে নেয়; জুতোর ফিতে না বাঁধতে পারলে কোনও বড় ছেলের কাছে বা শিক্ষিকার কাছে গিয়ে বেঁধে দিতে বলে। সবাই তৈরী হয়ে গেলে, শিক্ষিকা তাদের নিয়ে বসে কথাবার্তা বলেন। ৩টে বাজলে ওদের ছুটি; তখন মায়েরা আসেন। হাসতে হাসতে শিশুরা বাড়ি যায়।

এই কর্মসূচী ভারতবর্ষের আবহাওয়ার উপযোগী করে প্রস্তুত। আমি কিছুদিন বিদেশেও নার্সারীতে কাজ করেছি; সেই নার্সারীর কার্যসূচী এখানে উল্লেখ করা হল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত চার্লসী নার্সারীর কার্যসূচী নিম্নরূপ:

৮-৪৫—৯: শিশুদের আগমান ও অভ্যর্থনা।

৯—৯-৩০: জুতোজামা বদলানো, ঘরের কাজ ও ফুল সাজানো।

৯-৩০—১০-১৫: ঘরের বাইরে অনিয়ন্ত্রিত খেলা।

১০-১৫—১০-৩০: বাথরুমে যাওয়া, কমলালেবুর রস বা দুধ খাওয়া।

১০-৩০—১১-১৫ : ঘরের ভিতর নানা শিক্ষা উপাদান, পুতুল ইত্যাদি নিয়ে খেলা।

১১-১৫—১১-৩০ : বৃত্তাকারে বা অর্ধচন্দ্রাকারে বসা, কিছু আলাপ-আলোচনা, প্রার্থনা।

১১-৩০—১২ : দলগত কাজ।

১২—১২-২০ : খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি ; বাথরুম যাওয়া, হাত-মুখ ধোয়া।

১২-২০—১২-৫০ : দুপুরের খাওয়া।

১২-৫০—১ : ঘুম বা বিশ্রামের প্রস্তুতি ; জুতো ইত্যাদি খোলা।

১—২-৩০ : নিদ্রা বা বিশ্রাম।

২-৩০—৩ : বাইরে খেলা বা বেড়ানো।

৩—৩-৩০ : গল্প, অভিনয়, গান, Percussion band ইত্যাদি। পুতুল ও পুতুলের বাড়ি নিয়ে খেলা ইত্যাদি।

৩-৩০—৩-৫০ : জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

৩-৫০—৪ : মায়েদের আগমন ও শিশুদের বিদায় গ্রহণ।

যদিও এই দুই দেশের নার্সারী বিদ্যালয়ের কর্মসূচী বিভিন্ন তবু এইসব বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখে, এদের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তফাত কোথায়, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুই থেকে ছয় বৎসরের জন্য শিশুদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর সুস্থ, সতেজ ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়তা করে—আরও সহায়তা করে তার সুস্থদেহ ও সবল মনের গঠন কার্যে। এই ধরনের শিক্ষায় শিশু সহজেই সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলীও অর্জন করে। আপাতদৃষ্টিতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা অর্থহীন খেলাধুলা মাত্র মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে তা নয়। শিশুর স্বাধীন জীবনের এই আনন্দময় শিক্ষার ফলে, পরবর্তী জীবনের শিক্ষার বিভিন্ন ধাপগুলি শিশু অতি সহজে, সাবলীলভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে। মার্গারেট ম্যাকমিলান নিজে নার্সারী শিক্ষার প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বলেছেন, যে—**স্বাধীনতার মাধ্যমে ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে শিশুরা শিখতে পারে অনেক বেশী** তারা যা শেখে, কিছুই **আংশিকভাবে শেখে না—পুরোপুরিভাবে, ভাল করেই শেখে।** আর বেশীর ভাগই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখে বলে, তা **দীর্ঘদিন মনে** রাখতে পারে। যেসব ছেলেমেয়ে এই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না—একেবারে প্রথমেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, আর যারা

নার্সারী স্কুলে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়—এই দুই দলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে এবং "follow-up programme" অনুসরণ করে আমরা দেখেছি যে যেসব শিশু নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে—**স্বাস্থ্য, সামাজিকতা, এগিয়ে আসা, সৃজনাত্মক কাজ, ভাষাজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি**—সব দিক দিয়েই তারা অন্য দলের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে যখন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করতে আসে,—তখন সে সহজেই সেই নূতন আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। পরিশেষে বলা যায়—সুদৃঢ় ভিত্তি ছাড়া যেমন গগনচুম্বী অট্টালিকা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, তেমনি সত্যিকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে হলে, শিক্ষার আয়োজন শুরু করতে হবে একেবারে শিশু বয়সেই; কেননা, জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসরের শিক্ষার মূল্য মানবজীবনে অসীম ও অপরিমেয়। এই প্রসঙ্গে গেসেল লিখেছেন—

"Never again will the child's mind, character and spirit advance so rapidly as in the formative Pre-School period. Never again will he have equal chance to lay the foundation of mental health. From the point of view of mental hygiene, the Pre-School period therefore appears to have no less significance than it has for physical vigour and survival".*

নার্সারী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে নার্সারী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। মোটামুটিভাবে তা এই—

(১) শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ—অর্থাৎ আলো, বাতাস ও সূর্যালোক আছে, এমনিতর প্রচুর খোলা জায়গা জোগানো।

(২) শিশু যাতে সুখী, স্বাস্থ্যপ্রদ ও নিয়মিত জীবনযাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। তার শারীরিক বিকাশের জন্য নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন।

(৩) প্রতিটি শিশুকে সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা।

---

*Mentel Growth of Pre-School Child.—Gesell

(৪) শিশুর কৌতূহল যাতে চরিতার্থ হয়, তার কল্পনার যাতে প্রসার হয়, তার নানা কাজের চাহিদার যেন পরিতৃপ্তি ঘটে, এমনিতর সুবিধাদান।

(৫) প্রতিদিন সম-বয়স্ক শিশু, এবং নিজের চেয়ে বয়সে ছোট ও বড় শিশুর সঙ্গে কাজ ও খেলার মধ্যে সামাজিক-বোধ জাগানো।

(৬) শিশুর গৃহের সহিত প্রকৃতই যোগসূত্র রক্ষা করা।

"জীবনই শিক্ষা"—এ কথার তাৎপর্য নার্সারী বিদ্যালয়ে তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

নার্সারী বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনা

আজকাল ভারতবর্ষের অনেক শহরে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিন্তু সংখ্যক নার্সারী স্কুল দেখা দিয়েছে। এসব নার্সারী স্কুলের যারা সংগঠক বা পরিচালক, তাদের প্রায় কারোই এই বিশেষ ধরনের স্কুলের বিশিষ্ট চাহিদা ও লক্ষ্যের প্রকৃত জ্ঞান নেই ; ব্যবসার খাতিরে, টাকার উপার্জনের প্রয়োজনে এই সব নার্সারীর গোড়াপত্তন হয়েছে। এসব পরিচালকদের ধারণা যে, ছোট শিশুদের এনে, কিছু রংচং-এ খেলনা দিয়ে আটকে রাখলে, বা দু'চারটে ইংরেজী ছড়া, কবিতা ও গান শেখালেই তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। তাই তো দেখা যায়, শিশুদের মা-বাবাকে আকর্ষণ করার জন্য স্কুলের গাল ভরা বিলেতি নাম—"Oxford Nursery School", "London Day Nursery", "Little Flowers", "Snow White Nursery"—এমনি আরও কত নাম। এ সব প্রতিষ্ঠানে মাইনে বেশ বেশীই। মাসে সাধারণতঃ ২০ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত ; শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বেতচর্মা বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিচালিকা (যিনি হয়তো নার্সারী পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞা নন),—ছোট্ট দু'তিনটি ঘর, অল্প খেলার জায়গা আর কিছু খেলার সরঞ্জাম। এ সব স্কুলে ইংরাজী বই কিনে A, B, C, D, এবং 1, 2, 3, ইত্যাদি শেখা বাধ্যতামূলক ; কেউ কেউ আবার 'বাড়ির কাজ'ও দিয়ে থাকেন।

"নার্সারী বিদ্যালয় কী ও কেন"—এই অধ্যায়ে নার্সারীর লক্ষ্য কি' তা আমরা আলোচনা করেছি। তাতে আমরা দেখেছি যে, নার্সারী বিদ্যালয়—মায়েদের কয়েক ঘণ্টা আরাম দেবার জন্য—ছেলেদের আটকে রাখার জায়গা নয় ; পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে বিধিবদ্ধভাবে লেখাপড়া করবার, অথবা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সম্বলিত অঙ্ক করারও এটা স্থান নয়। এখানে শিক্ষা আছে—তা

একান্তভাবেই বিশিষ্ট শিক্ষা; এখানে পড়া, লেখা ও অঙ্ক কষা নেই, কিন্তু ঐ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি-স্তর রয়েছে। এখানে প্রীতিপূর্ণ, স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে, খেলা ও সক্রিয় কাজের মধ্য দিয়ে, অপর শিশুদের সান্নিধ্যে এসে—ছোটরা আনন্দময় জীবন যাপন করে। শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক—এই পাঁচটি দিকেরই প্রকৃষ্ট উন্নতি এখানে হতে পারে বলে—শিশু অবলীলাক্রমে সুষম বিকাশের ক্রমবর্ধমানের পথে এগিয়ে চলে।

সংগঠন

আমাদের দেশের নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা National System of Education বা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় পড়ে না। এই জাতীয় শিক্ষায় সরকারের এখন পর্যন্ত বিশেষ দায়িত্ব নেই; ২—৫ বৎসর বয়সের শিশুদের নার্সারীতে যোগদান **বাধ্যতামূলক নয়**। কয়েকটি বিশেষ বিত্তালয় ছাড়া, কয়েকটি শর্ত পালিত হলে, এ-ধরনের স্কুল সরকার থেকে এককালীন কিছু অর্থ সাহায্য পায়। প্রয়োজন মনে করলে, কোন কোন স্থানে **স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ** নার্সারী বিত্তালয় স্থাপন করে, তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারেন।

অন্যান্য বিত্তালয় থেকে নার্সারী বিত্তালয় পরিচালনার খরচ বেশী, কারণ এ-ধরনের বিত্তালয়ের জন্য প্রচুর খোলামেলা জায়গার দরকার। কোলকাতা শহরে বাগান বা খোলা মাঠসহ বাড়ি পাওয়া একে তো দুরূহ ব্যাপার—তার ওপর ঐ ধরনের বাড়ি পাওয়া গেলেও, ভাড়া অত্যন্ত বেশী হয়; এজন্য অনেকে ছাদের ওপর নার্সারী বিত্তালয় করতে আরম্ভ করেছেন; এতে ছোটদের চাহিদা সবদিক দিয়ে মেটে কিনা, তা কি পরিচালকবর্গ একবারও চিন্তা করে দেখেন?

অন্যান্য স্কুলের তুলনায় নার্সারীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনেক কম। আদর্শ শিশু বিত্তালয়ে এই সংখ্যা ৫০ বা ৬০ জনের বেশী হওয়া উচিত নয়। কমসংখ্যক শিশু থাকার দরুন, বিত্তালয়ের যে আয় হয়, তাতে তার বিশেষ ধরনের পরিচালনা অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিদেশে কোন কোন জায়গায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫০ বা ৩০০ দেখেছি; তবে এদের আলাদা আলাদা unit-এ রাখা হয়; কোনও unit-এ ৫০-এর বেশী শিশু থাকে না। আদর্শ নার্সারীর শিশুদের বয়স হওয়া উচিত দুই থেকে পাঁচ বৎসর। তবে অনেক স্থলে তিন থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের নেওয়া

হয়। ইংলণ্ডে আবশ্যিক বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা শুরু হয় **পাঁচ** বৎসর বয়সে, ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় **ছয়** বৎসর বয়সে, সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় **সাত** বৎসর বয়সে। ৫ থেকে ৭—এই বয়সের শিক্ষাকে শিশুশিক্ষার (Infant Education) স্তর বলা হয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা চলে—এই Infant Education-এর স্তরটির শিক্ষাধারার সঙ্গে নার্সারীস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সামঞ্জস্য থাকা সবিশেষ প্রয়োজন। ইংলণ্ডে তাই আজকাল পাঁচ বৎসর বয়সে নার্সারীর কাজ শেষ না করে একটানা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত চালিয়ে যাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে—কেননা, বিশেষজ্ঞদের মতে এই ব্যবস্থায় অধিকতর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

নার্সারীর আসবাবপত্র

নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশুদেরই জগৎ—শিশুদেরই রাজ্য। তাই এর আসবাবপত্র ছোটদের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। নীচু নীচু এবং হালকা জিনিসপত্রই শিশুদের উপযোগী ; তারা সহজেই সে সব নাড়াচাড়া করে সরিয়ে রাখতে বা এগিয়ে আনতে পারে। মণ্টেসরী অবশ্য শিশুদের ব্যবহারের জন্য টেবিল, চেয়ার প্রভৃতিতে হালকা গোলাপী বা নীল রং দিতে বলেছেন—তাতে এগুলি দেখতে ভাল হবে, আর শিশু-চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারবে। আসবাবপত্র যেন পরিষ্কার থাকে—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মাঝে মাঝে সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করা ও বৎসরে একবার রং করানো দরকার। নার্সারীতে যদি কোন ব্ল্যাক বোর্ড থাকে, তবে তা একেবারে ছোট হলে চলবে না। বড়, প্রশস্ত ও লম্বা মাপের দেওয়াল-জোড়া ব্ল্যাকবোর্ডই ছোটদের উপযুক্ত। নীচু জায়গায় তাকে টাঙিয়ে দিতে হবে—যাতে একাধিক শিশু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বা বসে, তাদের সৃজনীশক্তির পরিচয় দিতে পারে। ছোটদের স্লেট ব্যবহার করতে দিলে, তা যেন খুব ছোট না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২´×১—এ মাপের ম্যাসনাইট বোর্ড কেটে, তাতে কালো বা ঘন সবুজ রং করে ব্যবহার করে আমরা চমৎকার ফল পেয়েছি। রং করার জন্য যে তুলি শিশু ব্যবহার করবে, তার হাতল যেন বেশ লম্বা হয়, আর তুলি যেন খুব সূক্ষ্ম না হয়—সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। "ইজেল" ব্যবহার করলে, তা ছোটদের মাপেই করতে হবে।

নার্সারীতে ব্যবহৃত বালতি, মগ, খাবার প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি যাতে স্বাস্থ্য-

সম্মত ভাবে নিয়মিত পরিষ্কার হয়,—সেদিকে নজর রাখা দরকার। কাচের বা কাঁসার বাসন থেকে ব্যকলাইটের বাসন ছোটদের পক্ষে বেশী উপযোগী—ভাঙবার ভয় কম, উপরন্তু এগুলি হালকা, রঙ্গীন ও সুদৃশ্য। খাবার আগে ছোটরা প্রত্যেকে একটি করে প্লেট আর গ্লাস নেবে—খাবার কৌটো থেকে বের করে ঐ প্লেটে রাখবে; খাওয়া শেষ হলে নির্দিষ্ট জলপূর্ণ টবে এঁটো থালা ও গ্লাস রেখে দেবে। পানীয় জলের পাত্রগুলি যেন পরিষ্কার থাকে, কোনমতে দূষিত না হয়—সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছোটদের ব্যবহারের জন্য ঢাকনী ও কলযুক্ত পানীয় জলের টব উপযোগী। এই ব্যবস্থায় শিশুরা প্রয়োজন মত জল কল ঘুরিয়ে নিতে পারে—জলে হাত ডোবাবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমার ব্যক্তিগত মত—নার্সারীতে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সংখ্যায় বেশী না রেখে, ঘরের ভেতরেও খোলা জায়গা রাখা উচিত। টেবিল চেয়ার অযথা ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে—তাতে স্থানের প্রাচুর্য অনেক কমে যায়। দরকার মত ছোট্ট, রঙ্গীন আসন দিয়ে বসবার জায়গা করা চলে; ছোটরা একাজ খুশী হয়েই করতে পারবে।

শিশুরা নার্সারীতে দুপুরে বিশ্রাম করে ও ঘুমায়। এজন্য নীচু ও ভাঁজ করা খাট খুব উপযোগী। কাজ হয়ে গেলে, ভাঁজ করে রেখে দিলে, জায়গা কম লাগে। বিলাতে ও আমেরিকায়—এ ব্যবস্থা সর্বত্র। আমাদের গরীব দেশে এরূপ খাট যোগাড় করা বহুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এদেশে মোটা সতরঞ্জীর ওপর—প্রত্যেকের জন্য আলাদা ছোট সতরঞ্জী ও চাদর বিছিয়ে বিছানা করতে হবে। সেগুলোকে মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে এবং ধোপাবাড়ি পাঠিয়ে ধুইয়ে আনতে হবে।

শিশুদের বাথরুমও তাদেরই অনুপাতে তৈরী করতে হবে। সেখানে ছোট ছোট ও নীচু মাপের কয়েকটি প্যান থাকবে। বাথরুমের দরজা নীচু ও sliding হলে ভাল হয়। সারি সারি নীচু বেসিন ও কল থাকলে একসঙ্গে ৩।৪টি শিশু হাত-মুখ ধুতে পারে। তোয়ালে টাঙ্গাবার জন্য যে নীচু আলনা থাকবে, তাতে অনেক হুক লাগানো থাকবে ও সেই সব হুকে প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন দেওয়া তোয়ালে ঝুলানো থাকবে। বিভিন্ন খাপে প্রত্যেকের জন্য চিরুনি থাকবে।

তা ছাড়া নার্সারীতে থাকবে একটি 'প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স' (First Aid Box)। আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য প্রয়োজন হতে পারে বলে হাতের কাছে এটি রাখা উচিত।

নার্সারীতে পরিচালিকা, শিক্ষিকা ও সাহায্যকারিণীদের ব্যবহারের জন্য বড়দের উপযোগী টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি থাকবে।

নার্সারীর অন্যতম প্রধান প্রয়োজন শিশুদের খেলার উপকরণ। অন্যত্র এই উপকরণগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে কারা কারা কাজ করেন

প্রত্যেক সুপরিচালিত নার্সারীতে একজন **অধ্যক্ষা বা পরিচালিকা** (Directress) থাকবেন। বিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত থাকবে। এই পরিচালিকার কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন ; যথা—তাঁকে সংগঠন পটিয়সী, সুশিক্ষিতা, মনস্তত্ত্বে পারদর্শিনী এবং সর্বোপরি শিশু-দরদী হতে হবে। স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানবেন—তাদের প্রত্যেকের নাম, তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতি, তাদের পারিবারিক পরিবেশ, তাদের ভাল লাগা, মন্দ লাগা, তাদের আগ্রহ বা বিরাগ—এসব বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাঁকে একলাই মায়ের, ধাত্রীর, শিক্ষয়িত্রীর ও সামাজিক কর্মীর কাজ করতে হবে। শিশু-মনস্তত্ত্বে দক্ষ হবার দরুন তিনি অনায়াসেই প্রতিটি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, সামর্থ্য ও বিকাশের স্তর লক্ষ্য করে, প্রত্যেকের উপযুক্ত কাজ ও খেলার ব্যবস্থা করতে পারবেন। কেন একটি বিশেষ শিশু ভীরু ও লাজুক কেন-ই বা অন্য আর একটি শিশু সব ভেঙে ফেলে নষ্ট করতে চায়—এর কারণগুলো তিনি খুঁজে বের করে, এবং সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে শিশুকে সহজ, স্বাভাবিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। শিশুর স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক উন্নতিকল্পে তিনি যত্নবতী হবেন। পরিচালিকাকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদেরও ভাল করে জানতে হবে ; শিশু কোন্ পরিবেশ থেকে এসেছে, তার পরিবার পরিজন কেমন, তার মা-বাবার শিক্ষাদীক্ষাই বা কতটা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির পূর্ব-ইতিহাস—শিশু কোনও বিশেষ রোগে ভুগেছে কিনা—এসবই অধ্যক্ষার জানা প্রয়োজন ; কেননা, "The whole child goes to the

School"। শিশুকে সব দিক দিয়ে জানতে হলে তাই তার অভিভাবকের সহায়তার একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া নার্সারীর আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বা খেলনা ইত্যাদি কেনা, আসবাবপত্র মেরামত করানো, ছাত্র ভর্তি করা, খরচপত্রের বাজেট তৈরী করা, ফুলবাগানের ব্যবস্থা করা, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা—এ সবও তাঁর কর্তব্যের অন্তর্গত। এককথায় নার্সারীর পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই ওপর।

প্রতিটি নার্সারীতে পরিচালিকা ছাড়া একজন অভিজ্ঞা **শিক্ষিকা** থাকবেন। এই শিক্ষিকার সদা জাগ্রত দৃষ্টি থাকবে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে। অনিয়ন্ত্রিত খেলার সময়, শিশু যখন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে প্রশ্ন করবে, তখন শিক্ষিকা সহজ ভাষায় উত্তর দিয়ে, শিশুর সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবেন। ছোটদের অনুপাতে যে ভারী কাঠের টুকরোটা তিনজন বাচ্চা নিয়ে যেতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে—তিনি অল্পক্ষণের জন্য হলেও—সেটি তুলে দিতে সহায়তা করতে পারেন। যে শিশু বেশ কয়েকদিন অনুপস্থিত থেকে স্কুলে এসেছে—শিক্ষিকার মুখের সহানুভূতি ভরা হাসিটি দেখলে তার নিরাপত্তাবোধ সহজেই ফিরে আসে। প্রার্থনার সময় শিক্ষিকার অনুকরণেই ছোটরা হাত জোড় করে স্থির হয়ে বসতে শিখবে। শিক্ষিকার কাছেই শিশুরা ছড়া, গান, গল্প ইত্যাদি শুনবে; তাঁরই সহায়তায় ছড়া, গল্প ইত্যাদিতে বর্ণিত চরিত্রগুলিকে সংগীতে অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলে, এক অপূর্ব আনন্দলোক সৃষ্টি করতে পারবে। ছবি আঁকা, মাটির কাজ, কাগজ কাটা—এ ধরনের অসংখ্য হাতের কাজের মধ্য দিয়ে—এই শিক্ষিকারই সহায়তায় শিশুদের সৃজন-প্রতিভার উন্মেষ সাধিত হয়। নাচ, গান, অভিনয় বা হাতের কাজকে শিশুদের মান অনুযায়ী বিচার করে, তাদের এসব কাজের জন্য অভিনন্দিত করতে হবে। বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এসব কাজের মূল্যায়ন হয় না, তা নার্সারীর প্রতিটি শিক্ষিকারই জানা উচিত।

শিক্ষিকার শুধু বুদ্ধি থাকলেই চলবে না—তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। যেখানে অনেক শিশু একত্র খেলা করছে, সেখানে আকস্মিক কোনও রকম দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র নয়। রক্তপাত হলে, হাড় ভেঙ্গে গেলে, হটাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে শিক্ষিকাকে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—প্রয়োজন হলে ডাক্তার ডাকতে হবে।

হঠাৎ যদি কোনও শিশু জামাকাপড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলে, তবে তাকে শিক্ষিকা কোন মতেই শাস্তি দেবেন না ; কেননা এটা নেহাতই দুর্ঘটনা—শিশুর ইচ্ছাকৃত নয়। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিকাকে মায়ের ভূমিকা নিতে হবে ; শিশুকে পরিষ্কার করে, তিনি আবার তাকে শুকনো জামা-পাজামা পরতে সাহায্য করবেন। এসব স্থলে যেসব শিক্ষিকা উন্নাসিক হন, তিনি প্রকৃত শিক্ষিকা পদের যোগ্য নন।

শিক্ষিকার অন্যতম কাজ—শিশুদের প্রস্তুতিপর্বে নানা কর্মসূচী দেওয়া ও তার সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করা। বিদ্যালয়ে সাহায্যকারিণীদের (helpers) উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে তাদের কি করা কর্তব্য—এ বিষয়ে তিনি তাদের পরামর্শ দেবেন ; তাঁকে নজর রাখতে হবে, যেন অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে, ভুল কাজ করে এইসব সাহায্যকারিণী ছোটদের অনিষ্ট না করে।

পরিচালিকা ও শিক্ষিকা ভিন্ন প্রতিটি নার্সারী বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষিতা **নার্স** থাকা আবশ্যক। দুই বৎসরের নীচে কোনও শিশু যদি নার্সারীতে থাকে, তবে সে উক্ত নার্সের তত্ত্বাবধানে থাকবে। নার্সের কাজ হলো—শিশু স্কুলে আসা মাত্রই দেখে নেওয়া যে শিশুটিকে সুস্থ দেখাচ্ছে কি না, তার চোখ মুখ লাল কি না, গায়ে কোনও গুটি বেরিয়েছে কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। শিশুকে অসুস্থ দেখালে তক্ষুনি তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নার্সারীর শিশুরা বয়সে অত্যন্ত ছোট বলে এদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে ; কোনও অসুস্থ শিশু যাতে সুস্থ শিশুদের সঙ্গে মিশে রোগ ছড়াতে না পারে, তা দেখা নার্সের কর্তব্য। প্রতিটি শিশুর শারীরিক পরিচ্ছন্নতা—অর্থাৎ তার নখ পরিষ্কার কি না, সে চুল আঁচড়েছে কিনা, মাথায় খুশকি বা উকুন আছে কি না, তার দাঁত পরিষ্কার কি না—এ সবই নার্স তত্ত্বাবধান করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি শিশুর নখ কেটে দেবেন, চুল আঁচড়িয়ে দেবেন অথবা দাঁত কি করে ভালভাবে মাজতে হয়, তা দেখিয়ে দেবেন। প্রতিটি নার্সারী স্কুলে ছোটদের নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোনও স্বাস্থ্যসংস্থা থেকে যখন কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার এই পরীক্ষা করতে আসেন, তখন নার্স তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। তাছাড়া বসন্তের টীকা বা কলেরার ইন্‌জেকশন দেওয়া ভিটামিন বা কডলিভার খাওয়ানো প্রভৃতি কাজ নার্সেরই কর্তব্য।

নার্সারীতে আর থাকেন সাহায্যকারিণী (**helper**)। সাধারণতঃ এঁরা কম বয়সের হন। কোনও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নেবার সময় এঁরা কয়েকমাস সাহায্যকারিণীরূপে কাজ করে থাকেন। শিশুদের সংস্পর্শে এসে, তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে—প্রকৃত জ্ঞানলাভ করার জন্যই সাহায্যকারিণীরা নার্সারীতে আসেন। এঁদের দিয়ে নার্সারীর অনেক সাহায্য হয়। বয়সে ছোট হওয়ায়, এঁদের মধ্যে খানিকটা ছেলেমানুষি ভাব থেকে যায়, তাই তাঁরা অনায়াসেই ছোটদের সঙ্গে মিশে খেলাধুলা করতে পারেন। শারীরিক শক্তির প্রাচুর্য থাকার দরুন, প্রচুর দৌড় ঝাঁপ, লাফালাফি করেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন না; এঁদের উপস্থিতির জন্য শিক্ষিকার শক্তিরও অযথা অপব্যয় হয় না। বাচ্চাদের জুতো মোজা খুলতে বা পরতে, টিফিনের বাক্স গুছিয়ে রাখতে, হাত মুখ ধোওয়া বা বাথরুমে যাওয়ার সময়ে, বিছানা পাতা ও তোলার সময়ে, খেলার সময়ে—এই সাহায্যকারিণীরা অপরিহার্য। তবে মনে রাখতে হবে যে এঁরা শিশুদের ব্যাপারে প্রকৃত শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ নন বলে এঁদের ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও পরিচালিকার এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কাজ শিক্ষিকা ধৈর্য ধরে, বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে একটু একটু করে শিশুকে শিক্ষা দিয়েছেন—এইসব অনভিজ্ঞা সাহায্যকারিণীর অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে, সে শিক্ষা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ সাহায্যকারিণীর কাজ দেখিয়ে প্রশংসা পেতে চান; শিশুরা তাঁদের কাছে গৌণ। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, কোন শিশু হয়তো খুব মন দিয়ে পুতুল খেলছে—হয়তো সে তার পুতুল ছেলেকে দুধ খাইয়ে জামা পরাচ্ছে—এরপর ছেলেকে সে ঘুম পাড়াবে, কিন্তু মাঝখানে সাহায্যকারিণী হঠাৎ এসে বলে উঠলেন, "এস এস, শীগ্‌গির কর—হাত ধোবার সময় হয়েছে।" বলেই শিশুর খেলার সব সরঞ্জাম নিমেষের মধ্যে গুছিয়ে তুলে নিয়ে যান। এ কাজ শিশুর মানসিক পরিণতির পক্ষে কতটা যে অন্তরায়, তা বুঝবার সাধ্য সাহায্যকারিণীর নেই। শিক্ষিকা এ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান দিয়ে, ঠিক কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করবেন।

আজকাল অনেক নার্সারীতে, বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও, সাহায্য-কারিণীরূপে অল্পবয়সের মেয়েদের নিয়োগ করা হয়। শিক্ষিকা ও পরিচালিকা এঁদের নিয়ে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন আলোচনা-সভা করতে পারেন, অথবা প্রতিদিনই তাঁদের সমস্যার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন। শিশুদের

পর্যবেক্ষণ করে—তার ফলাফল লিখে রাখতে এঁরা বেশ সাহায্য করতে পারেন। কোন্ শিশু কোন্ খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসে, কার কথাবার্তার প্রবণতা কোন্ বিশেষ দিকে,—এসব জানার জন্য সাহায্যকারিণীরা নার্সারীর অমূল্য সহায়। শিশুদের কি করে যত্ন করতে হয়, কি করে শিক্ষা দিতে হয়, তাদের শরীর ও মন কি করে বৃদ্ধি পায়—এসব জ্ঞান বই পড়ে অর্জন করে, পরে শিশুদের সংস্পর্শে এসে তাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে এইসব অল্প বয়স্কা মেয়েরা শিশুদের আনন্দময় বিকাশে প্রকৃতই **"সাহায্যকারিণী"** হতে পারেন।

নার্সারী বিদ্যালয়ের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় যোগ আছে। তাই তো দেখি, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান, লক্ষ্য ইত্যাদি বদলাতে থাকে। সমাজ ব্যবস্থা যখন ওলটপালট হয়, তখনই তার চাহিদারও পরিবর্তন হয়। প্রথম নার্সারী বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয় সমাজের এই চাহিদার ফলে।

ইংল্যাণ্ড : অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু মুষ্টিমেয় ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্রকন্যাদের মধ্যে সীমিত ছিল ; সমাজের "নীচুতলার" মানুষদের জন্য শিক্ষার কোনও প্রয়োজন রাষ্ট্র বা সমাজের নেতারা স্বীকার করেননি। কিন্তু এই অবহেলিত, অশিক্ষিত নীচুতলার সন্তানেরা যাতে সমাজের অকল্যাণকর কাজে না লিপ্ত হতে পারে, তার জন্য কোন কোন ধর্মসংস্থা এদের অল্পবিস্তর ধর্মশিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, কিছুটা লেখাপড়া বা অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের Dame School, Sunday School, Circulating School, Charity School, School of Industry প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এ-জাতীয় প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। বলা বাহুল্য এ প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

এরপর এলো ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯৫) ও শিল্পবিপ্লব (১৭৫০-১৮০০)। এই দুটি বিপ্লবের প্রচণ্ড জোয়ারের ফলে নেতৃস্থানীয় লোকেরা শিশুশিক্ষার কথাটা **গোড়া থেকেই কি করে** নতুন করে শুরু করা যায় তা ভাবতে লাগলেন ; মনীষী শিক্ষাবিদদের লেখনীতে প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায় সেদিকে মনোযোগ দিতে লাগলেন। এতদ্ভিন্ন শিল্পবিপ্লবের ফলে বহু চাষী মজুর গ্রাম ছেড়ে চলে এসে শিল্পকেন্দ্রগুলির নিকট অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করতে শুরু করল। কলকারখানায়

কাজ করতে একসঙ্গে স্বামীস্ত্রীকে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে যেতে হতো; তাদের বড় বড় ছেলে-মেয়েদেরও জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে বহু শিশুকে অবহেলিত হয়ে একা একা বস্তিবাড়ীতে দিন কাটাতে হতো। শিশুসন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করলে কারখানার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পেতে মুশকিল হতো; তাই শিল্পপতিরা বাধ্য হয়ে "ক্রেশে" (creche) বা "ডে-নার্সারী"র প্রচলন করলেন। এগুলো ছিল বাপ-মায়ের অনুপস্থিতেতে ছোটদের আটকে রাখার খোঁয়াড় বিশেষ। শ্রমিক পিতামাতা শিশুকে এখানে রেখে কাজে যেতেন—দিনের শেষে শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। প্রথম প্রথম ঐসব ক্রেশে বা ডে-নার্সারীতে শিশুদের জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা ভিন্ন, স্বাস্থ্যরক্ষা বা শিক্ষাদানের অন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। তবু বলা চলে যে, ভোরের আকাশের রক্তিমাভা যেমন সূর্যের আগমনের দ্যোতক—তেমনি এই বিভিন্ন প্রচেষ্টাগুলি নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপনেরই প্রস্তুতিপর্ব।

শিশুদরদী ওবেরলিন (J. F. Oberlin—১৭৪০-১৮১৬) ছিলেন একজন পুরোহিত; তিনি আলসাস অঞ্চলের ওয়ালডবাক নামক স্থানে একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করে নতুন পদ্ধতিতে শিশুদের মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেন। এখানে শিশুরা বেড়াতে যেতে পারতো; আর ঐ বেড়াবার সময় তারা ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরিচালিকাদের (conductrices) সহায়তায় ঐসব বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করতো। ওবেরলিনের বিদ্যালয়ে শিশুরা গল্প শুনতো, ছবি দেখতো ও চিত্ত বিকাশের সহায়ক নানা কাজের মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটাতে পারতো। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬৯। এর আদর্শে পরে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen—১৭৭১-১-৫৮) নিউ ল্যানার্ক গ্রামে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ওয়েন ছিলেন শিশু দরদী—তাই শিশুদের কল্যাণ কামনায় গড়ে তুললেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আনন্দের একটি নিকেতন। এখানে অবাধ খোলামাঠের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, সুন্দর বাগানে, আলো ঝলমলে বিস্তৃত জায়গায় এসে শিশুরা পেল মুক্তির স্বাদ। পরিবেশ যদি সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ হয়, তবেই যে সত্যিকার মানুষ গড়া যায়—পেস্তালৎসীর এই মতবাদে ওয়েন

ছিলেন বিশ্বাসী। তাই তিনি শিশুকে সুন্দর পরিবেশে, স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সু-অভ্যাস গঠন করিয়ে ও সুশিক্ষা দিয়ে—সমাজের উপযোগী প্রকৃত মানুষ হবার গোড়াপত্তনের কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ে নাচ-গান ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল; আর এর আদর্শ ছিল—"Delight & Liberty"।

এরপর শিশুশিক্ষা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আরও দুইটি নাম স্মরণীয়। প্রথমজন স্যামুয়েল উইল্ডারস্পিন (S. Wilderspin) এবং অন্যজন ডেভিড স্টো (David Stow)। উইল্ডারস্পিন তাঁর শিক্ষানীতিতে তৎপ্রচলিত সর্দার প'ড়োপদ্ধতির (Monitorial System) যান্ত্রিকতার বিপক্ষে ছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন—ছোট শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের শিশুর মতন সহজ, সরল ও সতেজ একটি মন থাকতে হবে। শিক্ষকের অন্য গুণগুলি হবে—ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম মমতা, ছোটদের কাজে অপরিসীম ধৈর্য। তিনিও শিশুদের আনন্দ ও খেলাধুলার মাধ্যমেই শিক্ষার কথা বলেছেন। নিজে স্পিটলফিল্ডে গরীব শিশুদের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি খুলেছিলেন, তাতে তিনি এইসব নীতি হাতেকলমে প্রয়োগ করে গিয়েছেন। ডেভিড স্টো প্রথমে গ্লাসগোতে যে Sunday School খুলেছিলেন, সেখানে খুব সুবিধে করতে পারেননি। পরে ১৮২৭ সালে তিনি একটি শিশু-শিক্ষা কেন্দ্র খোলেন। এই বিদ্যালয়ে দুইটি বিভাগ ছিল—নিম্নতর শ্রেণীতে **দুই থেকে ছয়** বৎসরের শিশুদের নেওয়া হতো। তাঁর শিক্ষানীতির মূলকথা ছিল যে—শিশু নিজের আগ্রহ, উদ্যম এবং সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়েই সব কিছু শিখবে। বিদ্যালয়ে আদর্শ গৃহের অনুরূপ স্নেহময় ও শুচিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে; পরন্তু অপরের জন্য স্বার্থত্যাগের অভ্যাসটিও এই শিশু বয়স থেকেই ছোটদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

শিশুশিক্ষার ধারা মন্থরগতিতে হলেও এগিয়ে চলছিল। ১৮২৪ সালে লণ্ডনে **ইনফ্যাণ্ট স্কুল সোসাইটি** স্থাপিত হয়; ২-৬ বৎসরের দরিদ্র শিশুদের পিতামাতার অবর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপূর্ণ গৃহে আশ্রয় দিয়ে, এবং ডেম স্কুলের নীচুমানের শিক্ষার পরিবর্তে সুশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা আরও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

১৮৩৬ সালে **কমিটি অব কাউন্সিল অব এডুকেশন** গঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের সমস্ত ছেলেমেয়েরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষিত হতে

পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নার্সারী বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সীমারেখা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাঁদের মতে ২-৬ বৎসর হবে নার্সারী শিক্ষার স্তর—৬ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে।

১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের ফলে স্কুলবোর্ডগুলি উচ্চতর স্কুলের সঙ্গে শিশুবিভাগের পত্তন করতে লাগলেন। শিশুবিভাগে ৩-৫ বৎসরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, এবং এই বিভাগগুলি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অগ্রদূত হিসাবে গণ্য হতে প্যরে।

ইতিমধ্যে ফ্রয়েবেল জার্মানীতে ব্ল্যাকেনবার্গে যে শিশুবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ১৮৩৭ সালে, সেই বিদ্যালয়টিকেই দুই বৎসর পরে নাম দেন "কিণ্ডারগার্টেন" বা শিশুদের উদ্যান। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করাতে দেশেবিদেশে এই প্রণালী ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৮৭৪ সালে ইংল্যাণ্ডে ফ্রয়েবেল সমিতি গঠিত হয়। এই একই বৎসরে ইংল্যাণ্ডে একটি আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন স্কুল এবং এই বিশেষ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার জন্য একটি পৃথক শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত এইখানে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে আরও একটি বিরাট পরিবর্তন হয় শিক্ষা-জগতে। উক্ত সালের শিক্ষা-আইনের বলে সমস্ত বেসরকারী শিশু-বিদ্যালয়কে Local Education Authority বা L. E. A.-এর কর্তৃত্বাধীনে আসতে বাধ্য করা হলো। এতে শিশুদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ নিষিদ্ধ হলো, শিক্ষার স্তরবিভাগ আরও সুসম্বদ্ধ হলো এবং সর্বোপরি একেবারে ছোটদের শিক্ষার ব্যাপারে সমগ্র দেশে একটা সমতা আনা গেল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রোমে মণ্টেসরী তাঁর প্রথম "বালমন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি যে বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করেন, তার সুনাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল—ক্রমে ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক মণ্টেসরী সমিতি গঠিত হলে, এই বিশেষ ধরনের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৯১১ সালে মার্গারেট ম্যাকমিলান তাঁর বোন র‍্যাশেলের সহায়তায় লণ্ডনের ঈস্ট এণ্ড-এর বস্তি অঞ্চল ডেপ্টফোর্ডে একটি আধুনিক ও আদর্শ নার্সারী স্কুল খোলেন। দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা পরিবর্তনের ফলে

মেয়েরাও বেশী সংখ্যায় ঘরের বাইরে এসে চাকরিতে যোগ দিতে লাগলেন। মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশুরা পরিত্যক্ত হতো ক্রেশে বা ডে-নার্সারীতে। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য বা শিক্ষার উন্নয়ের সহায়ক কোন কিছুই ওখানে পাওয়া যেত না ; ফলে শিশুরা উপযুক্ত পুষ্টি, আদর-যত্ন, স্নেহ-করুণার অভাবে অর্ধমৃত হয়ে জীবন কাটাত। মানবশক্তির এই বিরাট অপচয়ের দিকটির দিকে ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয়ের দৃষ্টি পড়ে ; তাই তাঁরা একটি আদর্শ নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। ক্রমে সেখানে শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণের জন্য একটি মহাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে।

ক্রমেই এরপর নার্সারী বিদ্যালয়ের চাহিদা বাড়তে থাকে। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনে আর একটি বিরাট পরিবর্তন আনে। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে সহস্র সহস্র মেয়েকে ঘরের বাইরে এসে কাজে যোগ দিতে হয়েছে ; জার্মানদের ধ্বংসাত্মক বোমার আতঙ্কে শিশুদের শহর থেকে দূরে নিরাপদ গ্রামাঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে ; এরই প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ আবাসিক নার্সারী ও সাধারণ Day Nursery-র উদ্ভব হলো। নার্সারী বিদ্যালয় এখন ইংরেজের সামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯১৮ সালে ফিশার অ্যাক্টে শিক্ষার সর্বস্তরের প্রতি, অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়। এ আইনে ঐ বিশেষ স্তরে সাহায্য করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে পাঁচ বৎসরের নীচের শিশুদের শিক্ষাদান আবশ্যিক করা হয়েছে ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে যে নার্সারীতে কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকবে, এদের সংখ্যা ৪০-এর উর্ধ্বে হবে না ; বয়স হবে দুই থেকে পাঁচ। প্রত্যেক শিশুর জন্য অন্ততঃ ⅓ একর জমি বা বাগান থাকবে। পাঁচ বৎসর বয়সে নার্সারীর আনন্দময় স্বাধীন পরিবেশ থেকে ইনফ্যাণ্ট স্কুলের সংকীর্ণ পরিবেশে শিশুরা সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না, তাই কোন কোন নার্সারী স্কুলে শিশুদের সাত বৎসর পর্যন্ত রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবার যেখানে স্বতন্ত্র নার্সারী স্কুল করা সম্ভব হবে না, সেখানে ইনফ্যাণ্ট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত **নার্সারী ক্লাশ** খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই হলো ইংলণ্ডে নার্সারী স্কুলের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

আমেরিকা ঃ আমেরিকা অপেক্ষাকৃত নূতন মহাদেশ ; কাজেই সেখানকার শিক্ষার ইতিহাসও আধুনিক।

আমেরিকার শিক্ষা কেন্দ্রের শাসনমুক্ত (decentralised) ও স্থানীয় স্বাধীনতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সুনাগরিক গড়ে তোলা। শিশুর স্বাভাবিক উদ্যম ও আগ্রহ ভিত্তি করেই এখানে শিক্ষা পদ্ধতি নিরূপণ করা। এখানে শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন, "The whole child goes to school"—কাজেই এই whole child-এর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনই শিক্ষকের লক্ষ্য। একেবারে শিশুদের জন্য রেডিও, টেলিভিশন, প্রজেক্টর প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক audiovisual aids বা শিক্ষা-উপকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা ও রাশিয়া—এই দুইটি দেশই শিক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে ও অকৃপণভাবে অজস্র টাকা খরচ করে।

আমেরিকায় প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপিত হয় ১৯১৯ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) শেষ দিকে আমেরিকাও যখন ঐ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন পুরুষের অনুপস্থিতির দরুন এবং যুদ্ধের কাজে সহায়তা করার জন্য বহু মেয়ে বাড়ির বাইরে এসে কাজে যোগ দিতে লাগল—আর তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করার জন্য আমেরিকায় বহু নার্সারী স্কুল স্থাপিত হলো। যুদ্ধ বিরতির পর ১৯২০-৩০ সাল পর্যন্ত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যখন একটা মন্দার ভাব দেখা দিয়েছে সে সময়ে নার্সারী স্কুলের প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। ১৯৪০ সালের 'নিউ ডিল অ্যাক্ট' অনুযায়ী ফেডারেল সরকারের সাহায্যে বহু নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই শিল্পে, বাণিজ্যে ও সমৃদ্ধিতে আমেরিকা সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে, তার সঙ্গে সঙ্গে নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার মানেরও দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমেরিকায় বহু বেসরকারী নার্সারীতে খুবই ছোট শিশুদের নেওয়া হয়—এদের বয়স ছয়মাস, এক বৎসর বা ১৮ মাসেরও হয়। নার্সারীর শিক্ষা অবৈতনিক নয়—নার্সারীতে ভর্তি করা আমেরিকায় পিতামাতার পক্ষে আবশ্যিকও নয়। আমেরিকায় কতকগুলি নার্সারী স্কুল রাজ্য সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা ফেডারেল সরকার দ্বারা পরিচালিত, দ্বিতীয় কিছু সংখ্যক স্কুল ধর্মীয় সংস্থাদ্বারা পরিচালিত, এবং তৃতীয় ধরনের নার্সারী স্কুল বে-সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। এই তৃতীয় ধরনের নার্সারীর সংখ্যাই

সর্বাধিক। তাছাড়া মেয়েদের তরফ থেকে ক্রমাগত চাহিদার ফলে "কো-অপারেটিভ নার্সারী স্কুল" স্থাপিত হচ্ছে ; মেয়েরা সমবেতভাবে এই সব স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, অবসর সময়ে বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ঐ দেশের স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি শিশুদের শারীরিক বিকাশে তৎপর এটাও নার্সারী স্কুলের প্রসারের অন্যতম কারণ।

রাশিয়া ঃ শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে রাশিয়া এক অদ্ভুত জাদুকর ; অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাশিয়া তার শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনে কোটি কোটি মানুষকে শিক্ষার আলোক দেখাতে পেরেছে। জারের আমলে মুষ্টিমেয় লোক শিক্ষালাভ করত—অগণিত জনসাধারণ থাকত অশিক্ষিত, অবহেলিত। শিক্ষিত হলেই মানুষ নিজের অধিকারের দাবি জানাতে পারে—এই ভয়ে রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ফেলে রেখেছিলেন। কিন্তু স্তালিন, লেনিন প্রভৃতি নেতারা প্রচার করলেন যে জনজাগরণের প্রকৃষ্ট অস্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। অযথা মানুষের মনকে স্বর্গ, ধর্ম বা ভগবানের কথা বলে এবং নরকের বিভীষিকা দেখিয়ে ভীত করা—রাশিয়ার মতে ঘৃণ্যতম পাপ।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার জনসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে বদ্ধপরিকর হন। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সর্বোচ্চ বিধান সভা (Council of People's Commission) নিরক্ষরতা দূর করার জন্য একটি আইন পাশ করেন যে আট বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকের অক্ষর পরিচয় সম্পূর্ণ করে পড়তে শিখতে হবে। বিপ্লবের আগেও রাশিয়াতে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ছিল—এদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮৫টি। এগুলো প্রায়ই বে-সরকারী এবং এতে কেবল অভিজাত বংশের সন্তান-সন্ততিদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৩ সালের মধ্যে এই শিশু বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল পঁচিশ হাজার। এগুলো ছাড়াও Seasonal Kindergarten বা অস্থায়ী শিশু বিদ্যালয়ও প্রচুর পরিমাণে দেখা দিতে লাগল।

রাশিয়ায় প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের বয়স হচ্ছে তিন থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত। রাশিয়ার ক্রম-উন্নতির ব্যাপারে মেয়েদের শ্রমের মূল্য গভীরভাবে স্বীকৃত হয়েছে ; কাজেই মেয়েদের শিশুপালনের দায়িত্ব থেকে আংশিকভাবে হলেও মুক্তি দেবার জন্যই এইসব কিণ্ডারগার্টেন গড়ে উঠেছে। এইসব প্রাক্-প্রাথমিক কিণ্ডারগার্টেনের ব্যয়ভার **রাষ্ট্রের,** এবং এতে শিশুদের যোগদান **আবশ্যিক**। সোভিয়েট

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, তার বয়স, প্রবণতা, তার শারীরিক-মানসিক প্রস্তুতি—এ সকলকে কেন্দ্র করে, এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে, তবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে নানারকমের সুপরিকল্পিত খেলার ব্যবস্থা আছে—এতে শরীরের উন্নতি ছাড়াও সংযম, ধৈর্য, বুদ্ধি, অনুভূতি, সুরুচি প্রভৃতি গুণের স্বাভাবিক বিকাশ হয়। তাছাড়া এসব বিদ্যালয়ে এসে শিশুর সামাজিক দিকটির যাতে ভালভাবে বিকাশ হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়। শিশুর পিতামাতা ও অভিভাবকমণ্ডলী, স্বাস্থ্যসংস্থা, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারের সমবেত ও ঐকান্তিক সমর্থন ও প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়ার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার অপূর্ব উন্নতি লক্ষণীয়।

ভারতবর্ষঃ পরাধীন দেশে প্রকৃত শিক্ষার আলো জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছাতে পারে না—কেননা শাসনকর্তাদের তা অভিপ্রায় নয়। তবু যুগে যুগে মনীষীরা শিশুমুক্তির জন্য, তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকল্পে কতই না প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। দেশ তখনও পরাধীন—গান্ধীজীর উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে সেবাগ্রামে তালিমী সংঘের উদ্যোগে যে শিক্ষা সম্মেলন হয়, তাতে "নঈ তালিম শিক্ষা" শুধু সাত থেকে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যেই সীমিত হয়ে রইল না ; "নঈ তালিম" বা নূতন শিক্ষা পদ্ধতিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পর্যায়ের জনগণের শিক্ষাপদ্ধতিরূপে প্রচলিত করতে হবে। আগেই প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল ওয়ার্ধা এডুকেশন কমিটিতে ; এই সম্মেলনের পর প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রৌঢ় শিক্ষা ও উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি, পদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনার জন্য তালিমী সংঘ নানা উপসমিতি গঠন করেন।

১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তা তখনকার শিক্ষা-উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেণ্টের নামানুসারে "সার্জেণ্ট পরিকল্পনা"-রূপে অভিহিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রবর্তনের মানসে তাঁরা যে নানাবিধ পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে প্রথমে সরকারীভাবে প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট স্তররূপে গণ্য করেছিলেন। সার্জেণ্ট কমিটি তিন থেকে পাঁচ বৎসরের শিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি স্তর বলে স্বীকার করে বলে গিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিশু-শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে। এ ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তারও সুব্যবস্থা করতে হবে ;

আর ৩-৫ বৎসরের প্রত্যেক শিশুকে অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে। কার্যব্যপদেশে যে সকল জননীকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাদের সন্তানদের রক্ষণের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। এসব বিদ্যালয়ে আনন্দের মধ্য দিয়ে, শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে অবলম্বন করে শিক্ষা দিতে হবে। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের মাধ্যমে, সক্রিয়তার ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা কাজটি এগিয়ে যাবে। শিশু মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞা, ধীর ও স্নেহময়ী মহিলাদের ওপর এইসব বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করতে হবে। এইসব বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য যে তিনটি অতি প্রয়োজনীয় কমিশন হয়েছিল, তাদের নাম **রাধাকৃষ্ণণ কমিশন** (১৯৪৮), **মুদালিয়ার কমিশন** (১৯৫২-৫৩), এবং **কোঠারি কমিশন** (১৯৬৪-৬৬)। উপরোক্ত কমিশনগুলির প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্বিতীয়টি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পারবর্তনের উপদেশ দিয়েছেন। কোঠারি কমিশন প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। কোঠারি কমিশনের মতে—শিশুর শারীরিক, প্রক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাই এই কমিশন বাসনা প্রকাশ করেন যে ১৯৮৬ সালের মধ্যে তিন থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুদের শতকরা পাঁচ ভাগ প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবং পাঁচ থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার সুযোগ পাবে।

ভারতবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রসারে 'মণ্টেসরী সোসাইটি'র অবদানও কম নয়। এই সংস্থার উদ্যোগে, ভারতের বিভিন্ন শহরে মণ্টেসরী পদ্ধতিতে পরিচালিত ছোটদের স্কুল গড়ে উঠতে থাকে, এবং এই জাতীয় প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্দ্রিয়জ শিক্ষার ওপরই সবিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর যে সব প্রাক্-প্রাথমিক স্কুল সরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে, তাদের নাম দেওয়া হয় **প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়**। হালকা বাগানের কাজ, সাফাই ইত্যাদি প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অবশ্যকরণীয়। এখানে লেখা-পড়া অল্প হলেও শেখানো হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এখনও পর্যন্তও জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সরকারী প্রচেষ্টায় এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান অল্পই স্থাপিত হয়েছে, এবং চাহিদার তুলনায় এদের সংখ্যা অপ্রতুল।

বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যেসব নার্সারী বিদ্যালয় চলছে, অল্প কয়েকটি ব্যতিরেকে এদের মান (standard) অত্যন্ত নীচু দরের। প্রকৃত নার্সারী শিক্ষা কি, সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকায়, এসব স্কুলে অতি অল্প বয়সেই লেখাপড়া শেখাবার ওপর জোর দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা যে শিশুর বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর, তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। ভারতের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার শিশুর প্রকৃত শিক্ষাকল্পে নার্সারী শিক্ষার বহুল প্রসার অত্যাবশ্যক ; চিকিৎসক, মনোবৈজ্ঞানিক, উপযুক্ত শিক্ষিকা, অভিভাবকবৃন্দ—সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আরও বেশি সংখ্যক নার্সারী স্কুলের প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিশুর জীবনে মৌল চাহিদা

কোন প্রাণীকে বোঝার উপায় হল, তার ব্যবহারকে পর্যবেক্ষণ করা। প্রাণীর মধ্যে কোনও চাহিদার উদয় হলে তার মনে যে অভাব বোধ জাগে, তা তাকে স্থির থাকতে দেয় না এবং নানা অস্বস্তির কারণ হয়। এই অভাব বোধ, এই অস্বস্তি, না-পাওয়ার এই আকুলতা তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

কিন্তু প্রাণীতে প্রাণীতে পার্থক্য আছে ; আর এই পার্থক্য থাকার ফলে সব প্রাণীর চাহিদা এক হতে পারে না। শামুক তার নরম শরীরটাকে রক্ষা করতে চায়, তাই তার প্রয়োজন শক্ত আবরণের ; কিন্তু মানুষের বেলায় এই শক্ত আবরণ নিষ্প্রয়োজন। এ্যামিবার চাহিদা অতি সামান্য—জীবনরক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটালেই তার চলে ; কিন্তু মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশী—অনেক বিচিত্র ও জটিল। প্রাণরক্ষার জৈব প্রয়োজনে তাকে শ্বাস নিতে হয়, দেহের উত্তাপ রক্ষা করতে হয়, শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে দিতে হয়, বিশ্রাম নিতে হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাতে হয়। তা ছাড়া মানুষের আরও বিচিত্রতর প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে হয় ; সেগুলো উদ্ভূত হয় তার মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। মানুষের সব চাহিদাই সমান মৌলিক নয়—দেশ, কাল, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ঘটনার ফলশ্রুতিতে এসব চাহিদার পার্থক্য দেখা যায়।

শিশুর মৌল (Basic) চাহিদাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—**জৈব ও অজৈব**। জৈব চাহিদাগুলিকে মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি দেহগত চাহিদা। আর অজৈব চাহিদার ভিত্তি মূলতঃ শিশুর মানসিক গঠন ও সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

শিশুর মৌল জৈব চাহিদা হচ্ছে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিচ্ছন্নতা, মল-মূত্রত্যাগ, সূর্যালোক, খোলা হাওয়া, সক্রিয়তা, বিশ্রাম ও ঘুম। শিশুর এইসব মৌল প্রয়োজন না মিটলে সে সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারে না। সুতরাং জীবনের ভিত্তি গড়ার জন্য, জীবনব্যাপী সুস্থ সবল হয়ে বাঁচার জন্য শিশুদের এই চাহিদাগুলি যাতে উপযুক্তভাবে মেটে, সেদিকে শিশুর পিতামাতা এবং নার্সারীর শিক্ষিকাদের

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এইসব জৈব চাহিদার সঙ্গে যুক্ত **সৎ-অভ্যাসগুলি** যদি শিশুরা একেবারে শুরু থেকেই গড়ে তুলতে পারে, তবে পরিণামে তারা সুস্থ ও আনন্দময় জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

মানুষের জীবনের মৌল চাহিদা কি কি, এ সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মারে (Murray) এই সব চাহিদার একটা বেশ বিরাট ফর্দ করেছেন। ম্যাকডুগাল (Mcdougal) মানুষের চৌদ্দটি সংস্কারের কথা বলেছেন। তার সঙ্গে তিনি আবার সমসংখ্যক প্রক্ষোভ, অনুভূতি ও ক্রিয়ার উদ্যমকে যুক্ত করেছেন। উইলিয়ম জেমস (James)-এর মৌল চাহিদার তালিকার সংখ্যা আবার চৌদ্দটিরও বেশী ; পরিচ্ছন্নতার আকাঙ্ক্ষাকেও তিনি তাঁর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফ্রয়েড (Freud)-এর মত আরও অদ্ভুত—তিনি মানুষের একটিমাত্র মৌল চাহিদাকে স্বীকার করেছেন, এবং সেটি হচ্ছে *libido* বা আদিম কামাকাঙ্ক্ষা। ডব্লিউ টমাস (Thomas) মানুষের চারটি মাত্র মূল চাহিদার কথা বলেছেন ; যথা—(১) নূতন অভিজ্ঞতার প্রাত আগ্রহ, (২) নিরাপত্তার প্রতি আগ্রহ, (৩) সহযোগিতার প্রতি আগ্রহ এবং (৪) নিজের মূল্যায়ণের স্বীকৃতির প্রতি আগ্রহ।

ডঃ সুজান আইজ্যাক্স (S. Isaacs) প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের চাহিদার জন্য প্রচুর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিশুর সুষম বিকাশের জন্য শিশুর মৌল চাহিদাকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা পাবার আগ্রহ। (২) সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহ। (৩) নিরাপত্তাবোধের প্রতি আগ্রহ। (৪) স্বাধিকার ও স্ব-মত সমর্থন করার এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং (৫) অন্য শিশুর সঙ্গলাভের ও তাদের সঙ্গে খেলার প্রতি আগ্রহ।

আমার মনে হয়, ডঃ সুজান আইজ্যাক্স্-এর এই শ্রেণী বিভাগ সংখ্যায় কম হলেও, মোটামুটিভাবে ছোটদের চাহিদা ও ব্যবহারকে পরিস্ফুট করতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে যে, শিশুর এইসব **চাহিদা প্রবল হলেও,** তারা তখনও **অসংস্কৃত ও অসম্বদ্ধ**। এই অসংস্কৃত ও অসম্বদ্ধ চাহিদাগুলিকে যদি উপযুক্ত শিক্ষা ও যথার্থ পরিচালনার দ্বারা সুপথে চালিত করা যায় তবেই এ শক্তিগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও সুষম বিকাশের প্রকৃত সহায়ক হবে—শিশু তার জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রেখে, সহজ গতিতে ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হবে।

(১) **অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা পাবার আগ্রহ**ঃ এমন শিশু কে আছে যে অন্যদের আদর না চায়? শুধু শিশুর কথাই বা কেন? অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করার প্রবণতা আমৃত্যু বয়স্ক লোকেদের মধ্যেও দেখা যায়। একটি ছোট্ট শিশু-তরুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সূর্যালোক ও জল-সেচনের যেমন প্রয়োজন, কোমলপ্রাণ অসহায় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অনুরূপভাবে প্রথম মৌল প্রয়োজন হল বয়স্কদের প্রাণঢালা ভালবাসা ও সজাগ মনোযোগ। একেবারে শিশু বয়সে শিশুর মা তার এই মৌল চাহিদা মেটায়—কেননা, ঐ অসহায় শিশুর মা-ই আশ্রয়, মা-ই একাধারে খাদ্য-পানীয়, মা-ই তার দৈহিক আরাম, মানসিক সান্ত্বনা ও নিরাপত্তার মধ্যমণি! তাই মা-ই শিশুর সবচেয়ে প্রিয়। এক বৎসর পর্যন্ত শিশুর দেহ যেন মায়ের দেহেরই অঙ্গ। জন্মের আগে সে মাতৃ-জঠরের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল—জন্মের পর এই পৃথিবীতে এসে সে মায়ের কোলেই শান্তিতে ঘুমাতে চায়—মায়ের দেহের তপ্ত, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তার তৃপ্তি—মার পাশে পাশে থাকা, অস্বস্তি হলে কান্না দিয়ে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করা, মাকে দেখলে হাসি দিয়ে মনের আনন্দ ব্যক্ত করা—এসবের দ্বারা বোঝা যায়, শিশু মায়ের ওপর কতটা নির্ভরশীল—মা তার কত বেশী প্রিয়।

এর পর শিশু বড় হয়। সে জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়—অন্য লোকের সংস্পর্শে আসে; তবুও মায়ের অথবা **মাতৃসমা** অন্য কারো অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হয়। ক্ষণকালের জন্য মাকে ছেড়ে নার্সারীতে গেলেও, শিশু সেখানে স্নেহে মাতৃসমা শিক্ষিকার আদর-যত্ন লাভ করতে পারে—যেমন একান্নভুক্ত পরিবার হলে দিদিমা, ঠাকুমা, জ্যেঠিমা, কাকিমা, মাসিমা বা পিসিমা—এঁরা যে কেউ **মায়ের বিকল্প হয়ে** শিশুকে আদর ও ভালবাসায় ঘিরে রাখতে পারেন।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছেন যে শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে—তার জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসরে—**পিতামাতার অনাবিল স্নেহের** সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। জীবনের বুনিয়াদ গঠনের এই অতি প্রয়োজনীয় সময়টিতে শিশুর মাতা (বা মাতৃকল্পা কেউ) ও শিশুর মধ্যে একটি অতি **নিবিড়, ঘনিষ্ঠ, অকৃত্রিম, অবিচ্ছিন্ন** ও **প্রীতিকর** সম্পর্ক বজায় থাকবে। মাতা ও সন্তানের এই অনাবিল, পরম কল্যাণময় সম্বন্ধের সঙ্গে একে

একে যুক্ত হবে পিতা, ভাই-বোন বা অন্যান্য আত্মীয়দের ভালবাসা ও নানা অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ।

আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি, যে শিশু অতি শৈশবেই পিতামাতা উভয়কে হারিয়েছে—যে শিশু বাপমায়ের পরিত্যক্ত—যে শিশুর মা মারা যাওয়ায়, বাবা আবার বিয়ে করেছেন—যে অনাথাশ্রমে অবহেলার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—যে শিশুর মা শিশুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না অথবা মায়ের প্রাণঢালা ভালবাসা থেকে যে বঞ্চিত, সে-সব শিশুর মধ্যে নানা অপসঙ্গতি দেখা দেয়। স্নেহরসে বঞ্চিত হয়ে জীবনধারণের মূল ছন্দটি তারা হারিয়ে ফেলে—ফলে অসামাজিক, ধ্বংসপরায়ণ, ঝগড়াটে, সন্দেহবাতিক, নিষ্ঠুর, উদাসীন হয়েই বড় হতে থাকে।

সুতরাং অকৃত্রিম স্নেহ, দয়ামায়া ও ধৈর্যে পরিপূর্ণ মাতৃ-মনের সাহচর্য শিশুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণদায়ক চাহিদা।

(২) **সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহ :** শিশুর জীবনকে সুখী ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার অন্য একটি চাহিদা হল—তার সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ। ছোটদের পারিপার্শ্বিক জগতের বিচিত্র প্রকৃতি, নানাবিধ ঘটনা—তাদের আশপাশের পশুপাখি, গাছপালা, লোকজন—এ সব সম্বন্ধে শিশুমনে কৌতূহল জাগা এবং বহুল প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। শিশু যখন তার বল নিয়ে খেলা করে, তখন বলের গতি, প্রকৃতি, রং ইত্যাদি সম্বন্ধে তার আগ্রহ জাগে। জল নিয়ে খেলার সময় কোন্ জিনিস ভাসে আর কোন্টা ডুবে যায়—আর কেন-ই বা ঐ রকম হয় তা সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝতে চেষ্টা করে। বালি নিয়ে খেলার সময় কয়টি ছোট ছোট গ্লাস ভরে বালি দিলে, তবে খেলার বালতিটি ভরে যাবে—এসব অসংখ্য সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে, সে নিজে নিজেই ঐসব সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। শিশুরা যখন জানতে চায়, তখনই তারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। **শিশুদের এই সব প্রশ্নের** যখন উত্তর দিতে হয় (মনে রাখতে হবে আমাদের কৃত প্রশ্নের নয়), তখনই শিশুদের জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে আমরা প্রকৃত সহায়তা করি।

"ভাষা ও সাহিত্য" অধ্যায়ে শিশুর বাক্-শক্তির বিকাশ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি, কি করে পারিপার্শ্বিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলী শিশুর বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করে। নানা ঘটনা অথবা নানা জিনিসের সম্মুখীন হয়ে,

শিশু-মনে অজস্র প্রশ্নের স্রোত বয়ে চলে ; তার ফলেই আমাদের শুনতে হয় "কি", "কেন", "কেমন করে" ইত্যাদি প্রশ্নের ঝড়।

আমার ৩ বৎসরের ছাত্রী ভাস্বতীর কয়েকটি প্রশ্ন এখানে তুলে দিচ্ছি—

১। দিদিমার দাঁত নেই কেন ?

২। ওটা তো ছবি—তোমার বাবা কেমন করে হবে ?

৩। মাছের মুখ কোথায় ?

৪। মাছ সু করে কোথা দিয়ে ?

৫। মাছের পা নেই কেন ?

৬। লাইট নিভে যায় কেন ?

৭। লাইট কেমন করে জ্বলবে ?

৮। (Loud Speaker দেখে) দেওয়ালে ওটা কি ?

৯। ওখান থেকে কেমন করে কথা শোনা যায় ?

১০। ওখানে লাল টোপর কেন ?

এই রকমের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই তার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। এই ধরনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই পরে সে অঙ্কের যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির ধারণা করতে পারে ; ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতিও বুঝতে ও শিখতে তার কষ্ট হয় না।

কাজেই শিশুকে খোলা জায়গায়, উপযুক্ত খেলার সরঞ্জাম দিয়ে খেলতে দিতে হবে। সে দৌড়াবে, লাফাবে, বেয়ে বেয়ে উঠবে, দোলনায় দুলবে, স্লিপ চড়বে, জল, কাদা, মাটি দিয়ে ভাঙবে গড়বে—ছবি আঁকবে, মাপবে, এবং এসব কাজের মধ্য দিয়েই সে নিজে নিজে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক কিছু শিখবে। **তার কৌতুহলী মনে** যেসব জিজ্ঞাসার উদয় হবে, তার সঠিক উত্তর পাওয়া প্রয়োজন। কাজেই শিশু যখন অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যস্ত থাকবে, তখন কাছাকাছি বয়স্কদের উপস্থিতি দরকার ; কেননা যেসব প্রশ্নের উত্তর শিশু নিজে নিজে বের করতে পারে না, সেসব উত্তরের জন্য সে বড়দের সাহায্য চায়। **ধীরতার সঙ্গে** শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বয়স্কদের একান্ত প্রয়োজন। কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানলে, শিশুকে বলে দিতে হবে যে তিনি শিশুর প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে পরে তাকে জানাবেন। **মিথ্যা উত্তর** কোন মতেই দেওয়া চলবে না। আর চলবে না—শিশুর প্রশ্নের ফলে **বিরক্তিজনক ভ্রূকুটি**।

এরূপ ব্যবহারের দ্বারা শিশুর জানার ইচ্ছার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। শিশুর সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহের সঙ্গে (ক) উপযুক্ত পরিবেশ, (খ) বয়স্কদের সহানুভূতিসুলভ আচরণ ও (গ) উত্তর প্রদান—এগুলি একান্তই প্রয়োজন।

(৩) **নিরাপত্তাবোধের প্রতি আগ্রহ ঃ** শিশুর বিকাশের জন্য নিরাপত্তাবোধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই নিরাপত্তাবোধ হারিয়ে ফেললে, শিশু নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে অথবা অন্য লোকের সঙ্গে মিশতে ভয় পায়। শিশুর নিরাপত্তাবোধ রক্ষা করার জন্য আমাদের তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রথমতঃ, তার **জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি সুন্দর ছন্দ থাকা প্রয়োজন**। নিয়মিত স্নান, আহার, খেলা ও বিশ্রাম যেমন তার দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য দরকার—তেমনি দরকার তার মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য ; এজন্যই এই সব দৈনন্দিন কাজের একটি সু-অভ্যাস গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন। রোজ রোজ একই সময়ে, একই কাজ করলে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় ; ফলে সেই বিশেষ কাজটি ঠিক সময়ে করতে কোন কষ্ট হয় না, অথবা অযথা তাড়ন-পীড়নেরও প্রয়োজন হয় না। শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য এই ছন্দোময় অভ্যাস গঠন করতে হলে, আমাদের বয়স্কদের জীবনও তদনুসারে অতিবাহিত করতে হবে ; কেননা, শিশু আমাদের জীবনের ধারাকেই অনুকরণ করে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, নিরাপত্তাবোধের জন্য শিশুর প্রয়োজন—**বয়স্কদের অচঞ্চল ও অটল মনোভাব।** শিশুর আশপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা যদি ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের মত বদলান, একই কাজের জন্য একবার শিশুকে আদর করেন, আবার পর মুহূর্তেই বকুনি দেন, তবে সত্য সত্যই বড়রা কি চান, তা শিশু বুঝতে পারে না। ফলে সে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে, তীক্ষ্ণভাবে আমাদের মুখভঙ্গী লক্ষ্য করে। আমরা তার ঐ কাজের জন্য তাকে আদর করব, না তিরস্কার করব—সেটা সে বুঝতে পারে না। ফলে সে তার নিজের অনুভূতিগুলিকেও আয়ত্তাধীনে আনতে পারে না। মা বা মাতৃকল্পা নারীর অকৃত্রিম স্নেহ ও অচঞ্চল, অটল, স্থৈর্যময় মনোভাব শিশুর বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, নিরাপত্তাবোধের জন্য শিশুর মনে এমন একটি ধারণা সৃষ্টির

প্রয়োজন যে শিশুর ধ্বংসাত্মক, কলহপরায়ণ মনোভাব থাকাসত্ত্বেও বড়রা তাকে ভালবাসেন, এবং সাহায্য করতে চান। শিশুর জানা দরকার যে, সে যে মারামারি করে, রাগ করে, জিনিসপত্র ভাঙে বা ঘরদোর নোংরা করে, তা বড়রা পছন্দ করেন না; তাঁরা ঐ সব কাজ করতে নিষেধও করেন, কিন্তু ওগুলি করার জন্য বড়রা গুরুতর শাস্তি দিয়ে **নিশ্চয়ই প্রতিহিংসা** নেবেন না। মনে রাখা দরকার, অযথা প্রশ্রয়ে শিশুদের কোনই সাহায্যই হয় না। শিশু বয়সে এত বেশী ছোট বলেই মানসিক দিক দিয়ে তার যথেষ্ট সংযম শিক্ষা হয় না—তাই তো তার মধ্যে রাগ, হিংসা, ভেঙে নষ্ট করার প্রবণতা দেখা দেয়। তার এই প্রবণতাগুলিকে যথাযথভাবে সংযত করার জন্য বয়স্কদের বিচারবুদ্ধির দরকার। বাধ্যতার সুস্পষ্ট কারণ যেখানে বর্তমান, সেসব জায়গায় ছোটরা খুশি হয়ে বাধ্য হয়। বয়সে যাঁরা বড়, তাঁরা যদি ছোটদের সৃজনাত্মক কাজের ইচ্ছাকে সম্মান করতে পারেন—আর ছোটদের স্বাভাবিক খেলায় বাধা না দেন, তবে সেসব বয়স্কদের আদেশ ছোটরা সহজেই মেনে নেয়। প্রকৃত শাসন ও নিয়ন্ত্রণ—ছোটদের নিরাপত্তা বোধকে ব্যাহত করে না।

(৪) **স্বাধিকার, স্বমত সমর্থন করার ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি আগ্রহ**: স্বাধীনতা ও নিজের অধিকার রক্ষা করার প্রবণতা হচ্ছে শিশুদের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। সাধারণতঃ ২½ বৎসর বয়স থেকে শিশুর এই চাহিদা খুব বেশী বেড়ে ওঠে। তখন থেকেই খাবার সময়, নাইবার সময়, খেলাধুলা করতে বা অন্য নূতন কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময় সে আর কারো হস্তক্ষেপ একেবারেই সইতে পারে না। ঐ বয়সের শিশু হয়তো নিজেই হাত দিয়ে খেতে চায়; তার muscular co-ordination তখনও ঠিকমত হয়নি—তাই তো কিছু ভাত যায় তার মুখে, কিছু পড়ে জামাকাপড়ে, কিছু মাটিতে, আর অবশিষ্ট ভাগ থালাতে। জামাকাপড়ের এই দুরবস্থা করার ফলে শিশুর কপালে জোটে প্রহার। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, নিজের অধিকার রক্ষা করার প্রবণতা আরও ছোটদের মধ্যেও দেখা যায়; তাই তো শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্নান করালে বা খাওয়ালে সে হাত-পা ছুঁড়ে আপত্তি জানায়—তার অধিকৃত কোন জিনিস হাত থেকে কেড়ে নিলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। শিশুদের মানুষ করতে হলে, তাদের শরীর ও মনের বিকাশের ক্রমটি জানা একান্তই প্রয়োজন। বিকাশতত্ত্বের এই ধারাগুলি জানলে আমরা মোটামুটিভাবে

বুঝতে পারব, কোন্ বয়সে শিশুর দৈহিক উন্নতি খুব বেশী দ্রুত হয়; সেই বয়সে তাকে বসে বসে খেলার সামগ্রী না দিয়ে, যাতে সে বেশী ছুটোছুটি করতে পারে, এমনি ধরনের খেলনা দিতে হবে। নয়তো কোন কোন বয়সে শিশু হঠাৎ মায়ের আঁচল ছেড়ে 'কেমন যেন' নতুন মানুষ হয়ে যায়—কথা শোনে না—সব কাজ নিজেই করতে চায়,—শিশুর এই যে বিদ্রোহী মনোভাব, এটা শিশুর বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তর, যে স্তরে তার দেহ ও মন প্রস্তুত হয়ে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে প্রেরণা দিচ্ছে; এটা যদি আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারি, তবে শিশুর ঐ ধরনের স্বাধীন কার্যকলাপে আমরা বিস্মিত হব না, বরং সাগ্রহে তার ঐ ধরনের কাজই প্রত্যাশা করব। শিশুর বিদ্রোহী মনোভাবে—শিশু যে অন্তর রাজ্যে অসুখী—তা বোঝা যায়। তাইতো বয়স্কদের কাজে বাধা দিয়ে, সে তার বিদ্রোহী ও অসুখী মানসাবস্থার অবসানের চেষ্টা করে। স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য ছোটরা যখন প্রথম নিজে নিজে খেতে আরম্ভ করে, তখন অপচয় হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু তবু আমরা তাদের অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টাকে এই বলে অভিনন্দিত করতে, উৎসাহিত করতে পারি—"বাঃ বাঃ! খোকন সোনা কেমন সুন্দর খাচ্ছে!" ছোটরা মা-বাবার কাছে কান্নাকাটি করে বা অন্যভাবে বিদ্রোহী হয়ে যে স্বাধীনতা লাভ করে—আর যে স্বাধীন কাজের প্রচেষ্টায় সে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত—এই দুই স্বাধীনতাপ্রয়াসের মধ্যে শিশুর বিকাশের ধারায় দ্বিতীয়টি অধিকতর মূল্যবান, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(৫) **অন্য শিশুর সঙ্গ ও তাদের সঙ্গে খেলার প্রতি আগ্রহ:** অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গলাভ ও তাদের সঙ্গে খেলা করার আগ্রহ—শিশু-জীবনের প্রয়োজনীয় শ্রেষ্ঠ মৌল চাহিদার অন্যতম। অন্য শিশুর সঙ্গ লাভ করে—তাদের সঙ্গে আদান-প্রদান করে ও খেলা করে, শিশু শুধু যে সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে, তা নয়,—শিশুমনের বহু অপসঙ্গতি দূর হয়ে যায়, শিশু পরিপূর্ণ ও সার্থক জীবন-পথে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, নার্সারী বিদ্যালয়ে এসে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলার ফলে, অনেক শিশুর খাওয়া-সংক্রান্ত নানা সমস্যা দূর হয়ে যায়—অনেক শিশুর আঙ্গুল চোষা বা জননেন্দ্রিয় ঘর্ষণ করাও থেমে যায়—রাত্রের অন্ধকারে বৃথা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠত যে শিশু, তার কান্নারও উপশম হয়,—বড়দের সম্বন্ধে অযথা

ভীতির পরিমাণও আস্তে আস্তে কমে যায়। তাছাড়া প্রশস্ত জায়গায় খেলা করার ফলে শিশুদের শারীরিক উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়; তাদের খিদেও বেড়ে যায়। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে সক্রিয় খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ হয়; সে অন্য ছোটদের দাবির কথা ভাবতে শেখে, দোলনা দোলার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে, দলের নেতার কথা (অল্পক্ষণের জন্য হলেও) মেনে নিতে হবে, এটা বুঝে অনুসরণ করে—লাজুক শিশুর লাজুকতার ভাবটি কেটে যায়। তাছাড়া এসব খেলাধুলায় অন্য শিশুদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে শিশুর ভাষাজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। সাধারণ ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা ছাড়াও, সে যুক্তি দেখাতে পারে, তর্ক করতে পারে, সমস্যা উপস্থিত করতে পারে এবং বাক্যে তার সমাধানও করতে পারে। খেলার মধ্যেই শিশু স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হয়ে নানা কল্পনা করতে পারে, বাবা বা মা সেজে রোজকার কাজ করে—খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর রুদ্ধ আবেগ অনুভূতি প্রকাশিত হয় এবং তার প্রক্ষোভজীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়। এজন্যই বলা হয়—"Play is the child's means of living and of understanding life". অর্থাৎ খেলার মধ্যেই শিশু বেঁচে থাকে এবং জগৎ ও জীবনকে বুঝতে পারে।

একেবারে ছোট শিশুদের শিক্ষায় সফলতা লাভ করতে হলে, তাদের স্বাভাবিক আগ্রহের পথেই কাজ শুরু করতে হবে; প্রথমেই বিপরীত পথে গেলে, শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শিক্ষায় শিশু মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান ও প্রয়োগ

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা রুশোর "এমিল" গ্রন্থে সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠে। পেস্তালৎসীও রুশোকে অনুসরণ করে বলেছিলেন, 'শিক্ষকের প্রধান প্রয়োজন শিশুর মনটিকে জানা।' ফ্রয়েবেল ও মণ্টেসরী উভয়েই শিশুর মনটিকে জেনে তার ভাল-লাগা, সৃজনস্পৃহা, তার আনন্দের অভিব্যক্তি প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত 'কিণ্ডারগার্টেন' ও 'মণ্টেসরী পদ্ধতি' নামক মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে গিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে শিশু-মনস্তত্ত্বের নির্ভুল জ্ঞানের ওপর ভিত্তিস্থাপন না করতে পারলে কোন শিক্ষাপদ্ধতিই সফল হতে পারে না। কাজেই, শিশুশিক্ষায় যিনিই আগ্রহী হবেন, তাঁর পক্ষে শিশুর শিক্ষার জন্য তার মনটিকে জানা, তার ভাল-লাগা বা মন্দ-লাগা, তার রুচি, প্রবণতা, তার আগ্রহ ও সহজাত ক্ষমতা, পরিবেশের প্রভাব, তার আবেগ-অনুভূতি, তার সমস্যা ইত্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা একান্তই প্রয়োজন। তাই তো শিক্ষক-সমাজের কাছে রুশো মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন—"Encourage childhood ; O men, be human ! It is your foremost duty ; love childhood, encourage its sports, its pleasures, its amiable instincts."* অর্থাৎ—"শৈশবের প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দাও ; (শিশুর প্রতি) সদয় হও—এটাই তোমার সর্বপ্রধান কর্তব্য ; শিশুকে ভালবাস, তার খেলাধুলা, তার আনন্দ, তার শুভ-প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দাও।"

বহুকাল ধরে এই ধারণাই চলে এসেছে যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও বিষয়-বস্তুই প্রধান। শিক্ষক যা শেখান, শিশু তাই শেখে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের জ্ঞানের ফলে আমরা এখন জানতে পেরেছি যে শিশু শেখে আপন মনের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুসারে ; বাইরের ঘটনা stimulus বা উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই ধারণা থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অসীম গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করা হয়েছে ; কারণ শিক্ষাকার্যকে সফল করতে হলে শিশুর মনের আভ্যন্তরীণ প্রবণতার কথা জানতে হবে—তার মনের স্বাভাবিক বিকাশের ক্রমটিকে অনুসরণ

*John Morley—*Rousseau*, Vol II.

করে চলতে হবে। শিক্ষা দিতে গেলে, কি করে শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, কেন শিশু ভুলে যায়, বুদ্ধি জিনিসটা কি, কেন শিশু অসামাজিক হয়, শিশুর অনুভূতির প্রগাঢ়তা কতখানি, কেনই বা তার ক্ষুদ্র জীবনটিতে বিক্ষোভ দেখা যায়—এইরূপ বহু সমস্যার ও প্রশ্নের সমাধান মনস্তত্ত্বের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। বর্তমান কালে শিক্ষা কেবলমাত্র আন্দাজের ব্যাপার নয়; শিক্ষা এখন বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; আর তাই শিক্ষার পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলেছে।

শিশুর মন কি, অথবা তার স্বরূপ কি—এরূপ প্রশ্নের আলোচনা করার সময় আমাদের শিশুর **বংশানুক্রম** (heredity) এবং **পরিবেশ** (environment সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। পিতামাতার কাছ থেকে শিশু যেমন অনুরূপ দেহাকৃতির অধিকারী হয়, তেমনি তার মনটিও মা বাবার মনের গঠনের অনুকৃতিতেই গড়ে ওঠে। গাছের বীজ ও শিশু-তরুকে লক্ষ্য করলে আমরা এই একই জিনিস দেখতে পাই; আম গাছের বীজ থেকে আম গাছই হবে—লেবু বা আপেল গাছ হবে না। কাজেই বংশানুক্রম বললে কি বোঝায়, পিতামাতার গুণাগুণ কিভাবে শিশুতে সংক্রমিত হয়—শিক্ষকের এ সব কথা জানা দরকার।

কিন্তু বীজই তো গাছের বিকাশের শেষ কথা নয়; উপযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত হলে, জল, আলো, বাতাসের সান্নিধ্য পেলে সঠিক পরিবেশে এই ক্ষুদ্র বীজই বিরাট মহীরুহে, পরিবর্তিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবেশের অসীম প্রভাব লক্ষণীয়। শিশুর আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গীসাথী, তার গৃহ ও প্রতিবেশী, তার স্কুল ও শিক্ষিকা, তার সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ মনের ওপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে—হয় তাকে বাধা দিতে বা বিকৃত করতে চেষ্টা করে, নয়তো তার মনকে আরও প্রসারিত করে সম্যক বিকাশের পথে এগিয়ে দেয়।

হাডফিল্ড পরিবেশ ও শিশুদের বিকাশের সম্বন্ধের কতগুলি সূত্র উল্লেখ করে গিয়েছেন। **প্রথম সূত্রটি** হচ্ছে, শিশুর পরিবেশ অর্থাৎ তার আশ-পাশের ঘটনা ও জিনিসের মধ্য দিয়েই শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, অনুকূল পরিবেশ হলে, শিশুর বিকাশও সুন্দর হয়। **তৃতীয়তঃ**, প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করে, কিন্তু তাকে একেবারে রুদ্ধ করতে পারে না। **চতুর্থতঃ,** শিশুর জন্মগত শক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্টভাবে বিকশিত হবে, আর কোন্‌টিই বা অবদমিত থাকবে, তা পরিবেশের ওপরই নির্ভর করে ; পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী, পারিবারিক প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের প্রভাব—এগুলিই পরিবেশের মধ্যে প্রধান। **পঞ্চমতঃ,** প্রতিটি শিশু একই পরিবেশে থেকেও একই ভাবে প্রভাবিত হয় না ; শিশুর মেজাজ, আগ্রহ, প্রবণতাই তাকে বলে দেয় যে সে পরিবেশ থেকে কোন্ প্রভাব গ্রহণ করবে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে যেখানে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত গড়ার কাজ চলছে, সেখানে সুনিয়ন্ত্রিত, অকৃত্রিম ও কল্যাণদায়ক পরিবেশ শিশুর নিকট আশীর্বাদস্বরূপ।

শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে গেলে, **দেহের সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ** তা জানতে হবে, কারণ দেহ ও মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষাকার্যের সময় যে যে প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে তাতে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট দেহের অঙ্গ সম্বন্ধে শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ; মস্তিষ্ক, স্নায়ুকেন্দ্র, স্নায়ুমণ্ডলী, বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড, পেশী ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রত্যেক শিশু-শিক্ষককেই জানতে হবে।

মনের ক্রমবিকাশের ন্যায় দেহেরও ক্রমবিকাশের স্তর আছে। শিশুর মন যখন কোন শিক্ষাগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়, তখন তার উপযোগী দেহের ও স্নায়ুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটা শিশুর প্রস্তুতির স্তর। হ্যাডফিল্ড একে 'The principle of anticipation' আখ্যা দিয়েছেন।

আবার এও দেখা গিয়েছে যে শিশু নিজের আগ্রহে যদি কোন কাজ করতে শেখে, তবে সে বার বারই সে কাজটি করে—আর তার তা করতে ভালও লাগে। এ ভাবেই শিশুর শিক্ষা পাকাপাকিভাবে হয়। হ্যাডফিল্ড এর নাম দিয়েছেন 'The principle of recapitulation'।

শিশুর ক্রমবিকাশের ছন্দ ও বেগ লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক স্তরের পরিণতি শিশুকে পরের স্তরের জন্য অগ্রসর করে দেয়। তবে এই ক্রমবিকাশের অগ্রগতি সব সময় একই রকম থাকে না ; এক এক বয়সে এই উন্নতির হার দ্রুত হয়—এই সময়ের নাম Springing up period ; অন্য সময় যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তাকে ধরে রাখা ও তার পরিণতি দেওয়া—এর নাম Filling up period. ক্রম-পরিণতির এই স্তরের কথা জানা থাকলে, কোন্ সময়ে শিশুর কাছে কি প্রত্যাশা

করা চলে, তা শিক্ষক জানতে পারবেন। শিশু মনোবিজ্ঞান শিক্ষককে বলে দেবে, শিশু যখন শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন সে তা কি নিয়মে করে। শিক্ষা গ্রহণের **মূলগত নিয়মগুলি** (Laws of learning) মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই শিক্ষক জানতে পারেন। **থর্নডাইক** শিক্ষার তিনটি মূলসূত্র আবিষ্কার করেন এবং এগুলির নাম দেন—(ক) ফললাভের সূত্র (The law of effect), (খ) পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার সূত্র (The law of exercise) এবং (গ) উন্মুখতার সূত্র (The law of readiness)।

ফললাভের সূত্রের মূলকথা হচ্ছে, যে কর্মগুলির পরিণতি নিরাশাব্যঞ্জক ও অসফল, সেগুলি ভুল—সেগুলিকে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে; আর যে কর্মের ফল প্রীতিপ্রদ, সেটা স্বভাবতই বারে বারে করা হয়—সেটা মনে গভীর হয়ে বসে—সেটা শেখা হয়।

পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার সূত্রের মূলকথা হল—একই কাজ বারে বারে করা। যখন একটা উত্তেজকের সঙ্গে একটা প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন যতই বেশীবার সেটা করা যায়, তত বেশী সেটা শেখা যায়। অর্থাৎ যে কাজ আমরা বার বার করি, সেটাই ভাল শিখি।

উন্মুখতার সূত্রে, আমরা শিশুদের উন্মুখতাকে শিক্ষার কাজে লাগাই। থর্নডাইক বলেছেন—"যখন দেহ ও মন কোন একদিকে কাজের জন্য উন্মুখ, তখন সে কাজটি করলে তৃপ্তি হয়।"

থর্নডাইকের শিক্ষা গ্রহণের এই মূলগত নিয়ম ছাড়া, মণ্টেসরী, হারবার্ট, স্পেন্সার প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসূত্রের কথা বলেছেন। প্রথম সূত্রটি হচ্ছে যে—শিশুর **স্বাভাবিক আগ্রহ না জাগলে**—শিক্ষাদানে কোন **সুফল পাওয়া যায় না**। শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌছায়—শিশুকে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক না করে, ততক্ষণ **শিক্ষাদান কার্য নিষ্ফল হয়**। শিশু নিজের আগ্রহে যখন শিখতে চায়, তখনই শিক্ষা সার্থক হয়।

দ্বিতীয় মূল্যবান সূত্র হল—প্রত্যেক শিশুর মধ্যে শিক্ষার জন্য একটি **শুভ মুহূর্তের** (Psychological moment) আবির্ভাব ঘটে। এই শুভ-মুহূর্তে শিশুর উন্মুখ মনটির সুযোগ নিয়ে শিক্ষা দিলে, তবেই সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়। এই শুভ মুহূর্তটি হেলায় নষ্ট করে ফেললে, পরে সেই শিশুর পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

শিশু জন্মাবধি কয়েকটি স্বাভাবিক কার্যপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়—পূর্ব অভ্যাসের সাহায্য না নিয়ে, ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার না করে, স্বভাব ও সংস্কারবশে কোন কাজ করার যে প্রবৃত্তি জীবমাত্রেই দেখা যায়, তাকেই **সহজ বৃত্তি** বলা হয়। এই সহজ বৃত্তির কাজগুলি শিশুকে শিক্ষা করতে হয় না—এগুলি তার সহজাত। বস্তুতঃ, সহজ বৃত্তির কাজগুলিই শিশুর স্বাভাবিক কর্ম-প্রচেষ্টার উৎস; তাই এদের **ভিত্তি করেই শিশুর শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত**। রুশো বলেছিলেন—"শিশুর প্রকৃতিকে অনুসরণ কর।" শিশুর **সহজাত প্রবৃত্তিই** তার প্রকৃতিকে নির্দেশ করে দেয়। এই সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে **কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা, ক্রীড়াপ্রবৃত্তি, সংগ্রহের প্রবৃত্তি, আত্মবোধ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, ভয় ও যোধন প্রবৃত্তি, কর্ম ও সৃজন প্রবৃত্তি, হাতে ধরে পরীক্ষা করার প্রবৃত্তি, দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি**—এইগুলিই প্রধান। সহজ বৃত্তির প্রভাবে যে সকল কাজে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সকল কর্ম-প্রবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হলে, শিক্ষায় শিশুর অনুরাগ জন্মে ও তাতে সে মনোযোগী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শিশুর খেলা করার প্রবৃত্তি খুব প্রবল; সুতরাং খেলার মাধ্যমে কোন কিছু শিখতে পারলে শিশু স্বভাবতঃই মনোযোগ দিতে পারে। অথবা শিশুর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে তাকে সুযোগ্য পরিবেশ দিলে, শিশু আনন্দের সঙ্গে নিজেই অনেক বিষয় শিখতে পারে। শিশুর প্রকৃতি চঞ্চল—কাজেই শিক্ষক কখনই শিশুকে দীর্ঘকাল একটানা একই কাজ করতে বলবেন না; চুপ করে "পিনে-বদ্ধ সারি সারি প্রজাপতির ন্যায়" অচল হয়ে শ্রেণীকক্ষে বসে থাকা শিশুর স্ব-ভাবের বিরোধী। শিশুর অনুকরণপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সঙ্গীদের সাহচর্য ও সদ্ব্যবহার, পিতামাতা বা শিক্ষকশিক্ষিকারও আদর্শ তার সামনে স্থাপন করলে, সে সহজেই সদগুণের অধিকারী হয়। শিশু মাত্রেই ভালবাসার কাঙ্গাল। বাল্যকালে মা বাবার অজস্র স্নেহধারাই শিশুকে নানা অপসঙ্গতি ও অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করে ও সুস্থ রাখে। শিশুর আত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল—এটি সবল ব্যক্তিত্ব গঠনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তাই শিশুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে—এমন কিছু করা বয়স্কদের অনুচিত।

সহজ প্রবৃত্তিগুলি প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং স্থূলভাবে অমার্জিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষা দ্বারা এই সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে

নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করা যায়। হাতে ধরার প্রবৃত্তিকে মার্জিত করে, পর্যবেক্ষণ প্রবৃত্তিতে, আত্মবোধ ও যোধন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে সহযোগিতা প্রবৃত্তিতে, নিজস্ব করার প্রবৃত্তিকে উন্নত করে সঞ্চয় করা, তৈয়ার করা বা উপার্জন করার প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়।

সমস্ত শিক্ষবিদ্‌রা একথা মেনে নিয়েছেন যে, জোর করে কোন কিছু শিশুকে গিলিয়ে দিলেই তার শিক্ষা হয় না। শিক্ষা সফল হতে হলে, তাকে **জীবনের সঙ্গে যুক্ত** হতে হবে, **বাস্তবধর্মী** ও **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য** হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে জ্ঞান আহরণের দ্বারস্বরূপ ; কাজেই, শিক্ষা দেবার আগে **ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার** প্রয়োজন—একথা রুশো বার বারই বলেছেন। মণ্টেসরীও ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষার ওপর তাঁর শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত করে, স্পর্শেন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন, এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। শিশুরা তাদের চারপাশের জিনিসকে হাত দিয়ে ধরে নেড়ে চেড়ে দেখে—কান দিয়ে শব্দের পার্থক্য শোনে—জিভ দিয়ে আস্বাদ গ্রহণ করে—নাক দিয়ে গন্ধ নেয়—বিভিন্ন আকৃতি, রং ইত্যাদি চোখ দিয়ে দেখে, তবেই চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে তার প্রকৃত জ্ঞান হয়। **হাতে কলমে** হলেই শিক্ষার ভিত পাকা হয়—একথা গান্ধীজি, ডিউই, কিলপ্যাটিকও বলে গিয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানের আর একটি অবদান—শিশুর **বুদ্ধির পরীক্ষা করে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়** করা। এই পরীক্ষার দ্বারা শিশুতে শিশুতে পার্থক্য সহজেই বোঝা যায় ; তাদের ভাল, মাঝারি ও মন্দ—এইভাবে ভাগ করে নিয়ে, সেই অনুযায়ী শিক্ষা দিলে, বহু মনস্তাপ ও পরিশ্রমের অপচয় বন্ধ হতে পারে। বুদ্ধির পরীক্ষা দ্বারা শিশুর বিভিন্ন ও বিশেষ প্রবণতার কথাও জানা যায় ; ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ লাইনে গেলে সে ভাল করবে, তার আগাম আভাস পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতার ফলে, শিশুর বিশেষ কোন ত্রুটি থাকলে তা ধরা পড়ে এবং প্রথম অবস্থায় সাবধান হলে, শিশু অপরাধ-প্রবণতার দিকে পা বাড়ায় না।

শিশু শেখে—আবার ভুলেও যায়। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পারি, কি **উপায় অবলম্বন করলে স্মরণ রাখার কাজে সাহায্য হয়।** মনে রাখার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে আমরা নিম্নলিখিত পন্থাগুলিকে প্রধান বলে অভিহিত করতে পারি—প্রভাবের শক্তি, মনের সতেজ অবস্থা, অধিক ইন্দ্রিয়ের

ব্যবহার, গভীর মনোযোগ, আনন্দদায়ক ফললাভ, আগ্রহ ও অনুরাগ, ভাব-সংহতি গঠন, পৌনঃপুন্য, অর্থবোধ, কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের ফলে আমরা **শিশুচিত্তের সামাজিক চেতনা ও তার বিকাশ** সম্বন্ধে জানতে পারি। ছয় মাস থেকে চার-পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুর ব্যবহারে তার আশপাশের মানুষ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর আগ্রহ দেখা দেয়। সুজান আইজ্যাকস, গেসেল প্রভৃতি শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের মতে—শিশুর সমাজচেতনার ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর আছে। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুর সমাজ-চেতনার প্রথম স্তরে **অন্যের প্রতি অনীহা,** দ্বিতীয় স্তরে **বিরোধ ও বিদ্বেষ** এবং তৃতীয় স্তরে **সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব** দেখা যায়। দু'বৎসর পর্যন্ত শিশু মাকে বা মাতৃসমাকে প্রবলভাবে ভালবাসে সত্যি—তথাপি সে তখন পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক; নিজের খেলনা বড় একটা অন্যকে দিতে চায় না—তার খাবারের ভাগ দিতেও অনিচ্ছা। অন্য শিশুদের সম্বন্ধে বড় একটা মন দেয় না। তিন বৎসর থেকে সে অন্য শিশুদের কাজ বা খেলা লক্ষ্য করে—তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য খেলায় ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তার মধ্যে তখনও দলগত ভাবটি জাগ্রত হয় না। নার্সারীতে আসার পর শিশুর এই সমাজ-চেতনার বোধটি জেগে ওঠে—অন্য শিশুদের সম্বন্ধে ভীতি, সংকোচ ইত্যাদি কেটে যায়—শিক্ষিকার সতর্ক দৃষ্টির পরিচালনায় তারা ক্রমে ক্রমে সহযোগিতার কাজে এগিয়ে চলে। নার্সারীর একেবারে শেষের দিকে দেখা গেছে, কয়েকটি শিশুর মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও হয়েছে—তারা স্কুলে এসেই অন্য সঙ্গীদের খোঁজ করে—আর দল বেঁধে খেলা করতে ভালবাসে। এ সময়ে তারা শিক্ষিকাদের সম্মান দেখায় এবং বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন অনেকাংশেই মেনে চলতে ভালবাসে।

শিশুর **অনুভূতিময় জীবনকে জানা**—শিশু-শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; মনোবিজ্ঞান এদিক দিয়েও খুবই সহায়ক। শিশুর সহজাত সংস্কারের সঙ্গে অনুভূতির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। শৈশবে এই অনুভূতিগুলি সংখ্যায় কম হলেও, এরা অত্যন্ত জাগ্রত ও প্রবল; তবে সুখের বিষয় শিশুর প্রক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। চার বৎসরের শিশু কমল একদিন খুব রেগে গিয়ে তার ঠাকুমাকে বলেছিল, 'তুমি খুব দুষ্টু—তুমি মরে যাও।' আধঘণ্টা পরে ঠাকুমার আদরে বিগলিত হয়ে, ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে কমলকে বলতে শোনা গেছে—'ঠাম্মা, তুমি খু-উ-ব ভাল—বড় হয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করে, আমার বউ করব।'

আঠারো মাস থেকে চার বৎসর পর্যন্ত শিশুর অনুভূত জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে শিশুর স্বাধীনতা-স্পৃহা, ভালবাসা ও নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা, প্রতিরোধের বাসনা—সবই প্রবল থাকে। তাই দু-তিন বৎসরের শিশুদের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও অশান্তি সব সময়ই বর্তমান থাকে। তার আশপাশের বড়দের দেখে সে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বুঝতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের শক্তি সামর্থ্যের অপ্রাচুর্যের কথা চিন্তা করে দুঃখ পায়—বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করে। শিশুরা যখন মেজাজ-মর্জি নিয়ে কান্নাকাটি করে, তখন অনেক সময়ই তার স্বাধীনতা-স্পৃহার সূচনার জন্যই করে। এর মধ্য দিয়েই শিশু অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

De Lissa বলেছেন—"There is no aspect of early education more important than the cultivation of emotional harmony." শিশুর জীবনে প্রক্ষোভগুলির **সমতা** আনা ছোটদের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। কথাটি সর্বাংশে সত্য। শিশু-মনের অনুভূতিগুলিকে অযথা দমিয়ে রাখলে, পরবর্তী জীবনে তার মধ্যে **নানা অপসঙ্গতি** দেখা দেয়। শিশু অসামাজিক হয়, নয় চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, দিবাস্বপ্ন দেখে, বুড়ো আঙ্গুল চোষে, তোতলামি করে—এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজে সে তার অপসঙ্গতিকে রূপ দেয়। এই সব **সমস্যার কারণ মনোবিজ্ঞানের সহায়তায়** জেনে নিয়ে, সেই অনুসারে শিশুকে সাহায্য করলে, তার প্রক্ষোভজনিত অশান্তি দূর হয়—শিশু আবার শান্ত, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়ে বিকাশের পথে এগিয়ে চলে। বাড়িতে যে শিশুর এতদিন পর্যন্ত একাধিপত্য ছিল, হঠাৎ নূতন শিশু-ভ্রাতার আগমনে তার মেজাজ, ব্যবহার সবই বদলে যায়। সে অযথা কান্নাকাটি করে, হাঁটতে ভুলে যায়, নিজে নিজে খেতে পারে না, স্পষ্ট কথা না বলে আধ আধ কথা বলে, বিছানা ভেজায়—এবং এরূপ আরও নানা সমস্যা শিশুর ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখব—এখানে শিশুটি **নিরাপত্তার অভাব** বোধ করছে। এতদিন মায়ের কোল, মায়ের স্নেহ সে একাই ভোগ করছে; মায়ের সান্নিধ্যে এসে বাইরের জগতের ঝড়-ঝাপটা থেকে সে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে। আজ ছোট ভাই মায়ের কোল দখল করাতে সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে—তাই তো তার ব্যবহারে যত ছেলেমানুষি অপসঙ্গতির প্রকাশ; এতে করে শিশু আবার ছোট্টটি হয়ে মায়ের কোলের

সান্নিধ্য চাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় শিশুর এই ধরনের অপসঙ্গতির কারণ বুঝতে পারলে, আমরা তার ওপর অযথা বিরূপ না হয়ে, বরং সদয় হয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। শৈশবে ও বাল্যে প্রক্ষোভগুলি সম্পূর্ণ স্থূল ও নিরাবরণ থাকে; পরে এগুলি সূক্ষ্মতর ও মার্জিত হয়। অনুভূতিকে দাবিয়ে না রেখে, **শিক্ষা দ্বারা উর্ধ্বগামী করাই** হচ্ছে সুশিক্ষিকা ও সুমাতার কর্তব্য।

শিশু-তরুর বিকাশের জন্য যেমন জলসিঞ্চন ও পর্যাপ্ত সূর্যালোকের প্রয়োজন, তেমনই ছোট শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সহানুভূতিরূপ জলসেচন ও আনন্দরূপ সূর্যালোকের একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের মধুর ব্যবহারে, তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতিতে যে শিক্ষা শিশু আনন্দের সঙ্গে লাভ করে, সে শিক্ষাই যে প্রকৃত স্থায়ী শিক্ষা—একথা মনোবিজ্ঞানের মারফতেই আমরা জানতে পেরেছি।

শিশুর দেহ, শারীরিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যবিধি

দেহকে অবলম্বন করেই মানুষ জীবনধারণ করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য অংশের স্বচ্ছন্দ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়ার উপরই শিশুর সুষম শারীরিক বিকাশ একান্তভাবে নির্ভর করে। তাই শিশুদের নিয়ে যাঁরাই নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের শিশু-দেহের প্রধান প্রধান অঙ্গ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত।

(১) **পরিপাক তন্ত্র** (Digestive System): খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিপাকক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রথমেই জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা এবং তারপর দাঁত দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ভেঙে ফেলা হয়; তখন বিভিন্ন লালাগ্রন্থি থেকে পাচক রস এসে খাদ্যগুলিকে জীর্ণ করতে সাহায্য করে। এই রসে টায়ালিন (ptyalin) নামে এক রকমের দ্রাবক পদার্থ থাকে; এরা স্টার্চজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। মুখগহ্বর থেকে এই আংশিক জীর্ণ খাদ্য অন্ননালীর ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে এসে পাকস্থলীতে (stomach) উপস্থিত হয়। পাকস্থলীতে পৌছাবার পর—তার ভেতরের গাত্রের পরিপাক গ্রন্থিগুলি থেকে পাচক রস (gastric juice) নির্গত হয়ে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশতে থাকে; এই রসে পেপসিন (pepsin), রেনিন (rennin) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। পেপসিন খাদ্যের প্রোটিনকে আংশিক রূপান্তরিত করে **পেপটোনে** পরিণত করে; আর রেনিন **দুধকে ছানায় পরিণত** করে। অজীর্ণ রোগে তাই শিশুদের দেহে অতিরিক্ত প্রোটিন সরবরাহ করার জন্য এই আংশিক জীর্ণীকৃত পেপটোনে পরিবর্তিত খাদ্য দেওয়া হয়। তারপর খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে মন্থন হতে হতে অধিকতর জীর্ণ হয়ে গ্রহণী বা duodenum-এ প্রবেশ করে। গ্রহণী ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine) সকলের ওপরের অংশ এবং এর কাজও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্রান্ত্র একটি অতি বৃহৎ নল, এবং এটি পেটের মধ্যে জড়িয়ে পাকিয়ে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের নিজস্ব রস পরিপাকক্রিয়ার সহায়ক; কিন্তু আরও দুই প্রকারের রস বাইরে থেকে এসে গ্রহণীতে প্রবেশ করে—এদের একটি হচ্ছে প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে নির্গত **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice), অপরটি হচ্ছে পিত্তকোষ থেকে **ক্ষরিত পিত্তরস** (bile)।

এসব রস দ্বারা যে রাসায়নিক ক্রিয়া সংগঠিত হয়, তাতে খাদ্যের সারাংশ তরল নির্যাসে পরিণত হয়ে রক্তস্রোতের মধ্যে গৃহীত হয় এবং দেহের পুষ্টি সাধন করে। অন্ত্রমধ্যস্থ **ভিলাই** (villi) যন্ত্রের সাহায্যে শোধিত হয়ে তা রক্ত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

(২) **লিভার বা যকৃৎ ঃ** লিভার শরীরের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য থেকে রূপান্তরিত গ্লুকোজ যখন রক্তে প্রবেশ করে, তখন এই লিভারই তাকে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত করে, তাকে সঞ্চিত করে রাখে; পরে আবশ্যকমত আবার গ্লুকোজে পরিণত করে রক্তস্রোতে ছেড়ে দেয় তাপ উৎপাদনের জন্য। এই লিভারের আর একটি কাজ হচ্ছে—খাদ্যরস থেকে এ্যামিনো অ্যাসিড পৃথক করে নিয়ে, রক্তের মধ্যে প্রেরণ করা। আর এই অ্যাসিডের অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে ইউরিয়া (urea) তৈরি করে, মূত্ররূপে দেহ থেকে নির্গমনের ব্যবস্থা করা। চর্বিজাতীয় খাদ্যকেও যকৃৎ রূপান্তরিত করে নিয়ে রক্তস্রোতে প্রবাহিত করে দেয় এবং দেহের নানাস্থানে মেদ সঞ্চয় করে রাখে। মেদই হচ্ছে শক্তি ও উত্তাপের আধার; তাই পেটের গোলমাল প্রভৃতির জন্য লিভারের কাজ ভাল না চললে আমাদের 'শীত শীত' বোধ হয়। যকৃৎ যখন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন বিপজ্জনক কামলা বা ন্যাবা (jaundice) রোগ দেখা দিতে পারে। এতে পিত্তরসের অস্বাভাবিক ক্ষরণ হয় বলে সমস্ত দেহ পীতবর্ণ ধারণ করে; প্রস্রাবও খুব হলদে অথবা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়। শিশুদের এ ধরনের রোগ হলে, খুব বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এ সময় দুধ বা ভাজা জিনিস দেওয়া একেবারেই চলবে না; প্রচুর জলীয় জিনিস ও ফল খাওয়ানো দরকার; একান্তভাবে বিশ্রাম ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

(৩) **বৃহদন্ত্র** (Large Intestine): ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাদ্যের যে অংশ পরিপাক হতে পারেনি, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। তার থেকে লবণজাতীয় ও জলীয় কিছু কিছু জিনিস দেহে শোষিত হয়। অসার আবর্জনাগুলি তিনটি কোলন (colon)-এর মধ্য দিয়ে মলভাণ্ডে জমা হয় এবং পরে মলরূপে নির্গত হয়। মলের বেগ হলেই যাতে শিশু মলত্যাগ করার সুঅভ্যাসটি গঠন করে, সেদিকে বড়দের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হবার সম্ভাবনা। পরিপাক যন্ত্রের নানা গোলমালের ফলেই শিশুদের উদরাময়,

আমাশয়, কামলা এবং পরে ডুয়োডেন্যাল বা গ্যাস্ট্রিক আলসার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের সূত্রপাত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এজন্যই অতি-ভোজন বা গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ একান্তভাবে বর্জনীয়।

(৪) **শ্বাসতন্ত্র** (Respiratory System): শ্বাসকার্যের মূলতঃ দু'টি ভাগ—প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। দেহের লক্ষ লক্ষ কোষ রাত দিন কাজ করে যাচ্ছে; তার ফলে শরীরে যে বিষ ও আবর্জনা সঞ্চিত হয়, তাদের বিশুদ্ধিকরণের জন্য অক্সিজেন সিঞ্চন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস বের করে দেওয়া প্রয়োজন। এই কাজটি প্রধানতঃ সাধিত হয় **ফুসফুস** (lungs) ও তৎসংলগ্ন অন্য যন্ত্রাদি দ্বারা। এইসব যন্ত্রগুলির মধ্যে নাক, মুখ, স্বরযন্ত্র (larynx), শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা (bronchus), প্লিউরা (pleura) প্রভৃতি প্রধান। ফুসফুস একবার করে অসংখ্য বায়ুকোষসমন্বিত বেলুনের মত মলের সাহায্যে দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিচ্ছে—আর প্রশ্বাসের দ্বারা বিশুদ্ধ অক্সিজেনপূর্ণ বায়ুদ্বারা তার থলেটিকে পূরণ করে নিচ্ছে। রক্ত সংবহণতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে গভীর যোগাযোগ আছে, কারণ ফুসফুসে এসেই রক্ত শোধিত হয়। ফুসফুসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডপূর্ণ দূষিত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। শোধিত রক্ত তখন তার অক্সিজেনের ভাণ্ডার নিয়ে, হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে দেহের প্রতিটি অঙ্গ, যন্ত্র, তন্তু ও কোষে প্রায় নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়; তখন রক্ত আবার ফুসফুসে ফিরে এসে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাবার দাবি জানায়; পর্যায়ক্রমে সারা দিনরাত ধরেই এই ক্রিয়া চলতে থাকে। শ্বাসতন্ত্রের কার্য চক্রাকারে চলতে থাকে; নাসিকার মাধ্যমে, গৃহীত অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে কোষে কোষে পৌছায়, এবং সেখানে দহনক্রিয়া ঘটিয়ে সমস্ত দেহে শক্তি যোগাতে সহায়তা করে। এটাই হল শ্বাসক্রিয়ার মূল লক্ষ্য (end); শ্বাসক্রিয়ায় ফুসফুস বা নাকের কাজকে এই লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় (means) বলে মনে করা চলে।

লোক কথায় বলে, বায়ুই জীবন। এই জন্যই ছোট এবং বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। কলকাতার মত শিল্পাঞ্চলে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবের জন্য বায়ুবাহিত নানা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সর্দি, কাশি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হুপিংকাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথিরিয়া,

যক্ষ্মা প্রভৃতি বিপজ্জনক রোগগুলির সবই বায়ুর দ্বারা সংক্রামিত হয়। নার্সারী স্কুলে **খোলামেলা আবহাওয়ায় দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত** করতে পারলে, শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এই কারণেই সম্ভবপর হয়।

(৫) **রক্তসংবহন তন্ত্র** (Circulatory System): মানুষের গৃহীত খাদ্য জীর্ণ ও শোধিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যকে দেহের সর্বত্র পৌঁছে দেবার দায়িত্ব রক্তস্রোতের ; কিভাবে একাজ হয়,—তার একটু আভাস দেওয়া যাক।

রক্তসংবহন তন্ত্রের কেন্দ্রটি হচ্ছে **হৃৎপিণ্ড** (heart)। হৃৎপিণ্ড পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং রক্তকে পাম্প (pump) করে রক্তবাহী শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। চুল, নখ প্রভৃতি কয়েকটি অংশ ছাড়া, দেহের এমন কোনও স্থান নেই, যেখানে রক্ত চলাচল করতে পারে না, জীবনে এমন কোনও সময়ও নেই, যখন রক্ত চলাচল স্থগিত থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রধান অংশগুলি হচ্ছে—অলিন্দ (auricle) ও নিলয় (ventricle)। এই দুইটির মধ্যে একটি বিশেষ আকৃতির কপাটক (valve) আছে ; দরজা যেমন কেবল একদিকেই খোলে, কপাটকের পাল্লাগুলিও তেমনি একদিকে খুলে গিয়ে শুধু অলিন্দ থেকে নিলয়ে যাবার পথ করে দেয়। রক্তস্রোত দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যে সব কাজ করে, মোটামুটিভাবে সেগুলি নিম্নরূপ—

(ক) ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সারাদেহে সরবরাহ করা ;

(খ) রক্তে রসের দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বহন করে নিয়ে এসে, ফুসফুসের মাধ্যমে তা পরিত্যাগ করা ;

(গ) দেহের প্রতিটি অংশে খাদ্য সরবরাহ করে, দেহের গঠনকার্যে সহায়তা করা, দেহে তাপ উত্তাপ ও পেশীতে শক্তি সঞ্চার করা ;

(ঘ) দেহযন্ত্রের কাজগুলি সংঘটিত হওয়ার দরুন উৎপন্ন ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড, প্রভৃতি বিদূরিত করা ;

(ঙ) রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি দ্বারা দেহ আক্রমণকারী জীবাণু ও তাদের বিষ থেকে দেহকে রক্ষা করা ; এবং

(চ) গ্রন্থি নিস্থত রস বা হরমোন গ্রহণ করে শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকে উদ্বোধিত করা।

রক্তের চারটি প্রধান উপাদান হচ্ছে—

(১) **লোহিত কণিকা :** এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে প্রায় ষাট লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে ; এর প্রধান উপাদান হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ হল—অক্সিজেন গ্যাসকে ধরে রাখা।

(২) **শ্বেত কণিকা :** এদের সংখ্যা লোহিত কণিকার চেয়ে বহুলাংশে কম। তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে প্রতি ৫০০টি লোহিত কণিকার অনুপাতে একটিমাত্র শ্বেত কণিকা বর্তমান থাকে ; বিষাক্ত জীবাণু খেয়ে ফেলে, এরা শরীরের মহা উপকার করে।

(৩) **ব্লাড প্যাটেলেটস :** রক্তের এই উপাদানের ফলে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।

(৪) **ব্লাড প্ল্যাজমা :** প্ল্যাজমার একশত ভাগের মধ্যে নব্বই ভাগই হচ্ছে জল। একে শুষ্ক করে সংরক্ষিত করে রাখা যায় বলে—অনেক সার্জিক্যাল অপারেশনে রোগীকে রক্তদান কালে বিশেষ সহায়তা করে। এদের কাজ হল লবণ, স্নেহপদার্থ, গ্লুকোজ ইত্যাদি বহন করে কোষে কোষে পৌঁছে দেওয়া।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যেসব রক্তবাহী তন্ত্রীগুলির যোগ আছে তাদের প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—**শিরা** (veins), **ধমনী** (artery) ও **কৈশিক** (capillaries)। যেগুলির ভেতর দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে, তাদের বলা হয় **শিরা** ; আর যার ভেতর দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাইরে আসে, তাদের নাম **ধমনী**। ধমনী ও শিরা—উভয়েই শেষ প্রান্তে গিয়ে কেশ বা চুলের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জালে পরিণত হয়েছে—এরই নাম **কৈশিক** বা **জালক**। এরাই হল শিরা ও ধমনীর সংযোগস্থল।

(৬) **রেচনতন্ত্র** (Excretory System) **:** রেচন অর্থ : **অপ্রয়োজনীয় বর্জনীয় পদার্থ বাইরে নিক্ষেপ করা।** আমাদের দেহযন্ত্রের ভেতরে অনবরতই যে ভাঙাগড়ার কাজ চলছে, তার ফলে নিঃশ্বাসে, রক্তস্রোতে পেশী ও তন্তুতে নানা আবর্জনা জমা হচ্ছে। এসব আবর্জনাকে যদি স্বাভাবিকভাবে নিষ্কাশিত করা যায়, তবেই দেহ সুস্থ থাকে। যেসব পথে এইসব আবর্জনা নিষ্কাশিত হয়, তারা হচ্ছে—(১) বৃহদন্ত্রের মলনালী, (২) ফুসফুস, (৩) বৃক্ক (kidney), (৪) ত্বক এবং (৫) ঘর্মগ্রন্থি।

শ্বাসতন্ত্র প্রসঙ্গ আলোচনা কালে আমরা দেখেছি কি করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড

জাতীয় গ্যাস নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে বের হয়ে যায়। **পরিপাক তন্ত্রের** আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি কি করে বৃহদন্ত্র থেকে খাদ্যের অসার ও অজীর্ণ অংশ মল হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। **বৃক্ককেই** প্রকৃত **রেচন যন্ত্র** বলা যায়। পেটের ভেতরে বড় সীমের বীজের আকারের দুইটি বৃক্ক যন্ত্র আছে। শরীরের ভেতরের দ্রবণীয় দূষিত পদার্থ জলে দ্রবীভূত করে বের করে দেওয়াই হল বৃক্কের কাজ। এ যন্ত্রটি আবার ছাকনির মত কাজ করে; শরীরের উপযোগী পদার্থকে পৃথক করে ছেঁকে রেখে অসার আবর্জনা মূত্ররূপে বের করে দেয়। তাছাড়া ত্বকের থেকে ঘামের আকারেও এই জাতীয় বর্জনকার্য চলে। আমাদের দেহচর্মে যে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রপথে শরীরের অতিরিক্ত জল এবং জলে দ্রবীভূত লবণ ইউরিয়াসহ বেরিয়ে এসে ঘর্মরূপে নির্গত হয়।

(৭) **পেশীতন্ত্র** (Muscular System): মানবদেহে অস্থির ওপরেই মাংসপেশীর একটা আবরণ দেওয়া রয়েছে। দেহের ওপরে প্রথমেই ত্বক, তার নীচে চর্বি এবং এর পরই কোমল একটি মাংসের আবরণ আছে। এই আবরণটি পেশীর দ্বারা গঠিত। পেশীর জন্যই দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় এবং সব রকমের গতিবিধি, চলাফেরা এবং অঙ্গসঞ্চালন সম্ভবপর হয়। পেশীগুলি শরীরের হাড়ের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে পেশীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছামত হাড়-গুলিকেও চালনা করা যায়। দেহের অর্ধেকের বেশীই হচ্ছে মাংসপেশী। দেহের পেশীগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীর—(ক) **ঐচ্ছিক পেশী** (voluntary) (খ) **অনৈচ্ছিক পেশী** (involuntary) এবং (গ) **হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী** (cardiac)।

যে পেশীকে আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে পারি, তাদেরই **ঐচ্ছিক পেশী** বলা হয়; যেমন—হাতের, পায়ের বা দেহের অন্যান্য স্থানের পেশী। আর যে পেশীকে আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে অপারগ হই, তাকে বলা হয়, **অনৈচ্ছিক পেশী**; যেমন—পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড বা দেহের অভ্যন্তরস্থ অন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির পেশী। অনৈচ্ছিক পেশীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—আমাদের চোখের তারারন্ধ্রের (pupil) বেষ্টনী কনীনিকার সূক্ষ্ম পেশীগুলি, কেননা, আলোর পরিমাণ কম বা বেশী হলে এই পেশীগুলি আপনা হতেই সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে থাকে। **হৃদযন্ত্রের পেশী** অনৈচ্ছিক হলেও, তার বিশেষ আকৃতি ও ধর্মের জন্য একে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ভ্রূণাবস্থা থেকে

মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হৃদযন্ত্রকে বিরামহীন ভাবে কাজ করে যেতে হয় বলে তার পেশীগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তাদের মধ্যে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যায় না।

দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদিতে পেশীর যথেষ্ট ব্যবহার হয়। পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে পেশীগুলির বিন্যাস সহজ হতে সহজতর হয়। একেবারে ছোট বয়সে অতি সূক্ষ্ম পেশীর চালনা মনোবিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যসম্মত নয়; প্রথমে বৃহত্তর পেশী দিয়ে আরম্ভ করে, পরে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম পেশীক্রিয়ার সঞ্চালন করাই নার্সারী-স্তরে আদর্শ কাজ।

(৮) **ক্ষরণতন্ত্র** (Secretory System): মানবদেহে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র আছে—এগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নীরবে কাজ করে যায়; এই যন্ত্রগুলির নামই হল **গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থি থেকে রস ক্ষরণ হয় বলে এরা ক্ষরণতন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে। এরা প্রধানতঃ দুই প্রকার—বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। যে-সব গ্রন্থি থেকে বহির্মুখী ক্ষরণ হয় সেগুলি সচ্ছিদ্র (ductile); তাই এগুলিকে বলে সচ্ছিদ্র গ্রন্থি (duct glands)। মলমূত্র, ঘর্ম, অশ্রু, লালা, স্তন্যদুগ্ধ প্রভৃতির ক্ষরণ এই গ্রন্থির মাধ্যমে হয়। অপরজাতীয় গ্রন্থিগুলি নিশ্চিদ্র; এদের **এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি** (Ductless glands or Endocrine) বলা হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থি থেকে যে রস ক্ষরিত হয়, তাকে বলা হয় হরমোন (hormoene)। মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, তার প্রকৃতি, ভাব-জীবন (emotional life) তার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিনিঃসৃত হরমোনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই গ্রন্থিগুলির যথোচিত ক্ষরণের উপর দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

এই গ্রন্থিগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে **পিটুইটারি** (Pituitary), আড্রিনাল (Adrenal), থাইরয়েড (Thyroid), অগ্নাশয় (Pancreas), পিনিয়্যাল (Pineal), থাইমাস (Thymus), জনন-সংক্রান্ত (Sex or Gonad) গ্রন্থির নাম উল্লেখ্য। এইগুলির মধ্যে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের কথা ভেবে, আমরা কেবলমাত্র প্রথম তিনটি গ্রন্থির আলোচনা সংক্ষেপে করছি।

পিটুইটারি গ্রন্থি—এই গ্রন্থিটি মাথার নীচে হাড়ের মধ্যে ছোট একটি গর্তে বসানো আছে; এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির মধ্যে এই পিটুইটারি গ্রন্থি সর্বপ্রধান বলে একে "গ্রন্থির রাজা" বা "অধিরাজ গ্রন্থি"ও বলা হয়। নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা ভিন্ন এই গ্রন্থিটি থাইরয়েড, আড্রিনাল এবং যৌনগ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে এই

বিশেষ গ্রন্থির অতিরিক্ত রসক্ষরণ হলে মানুষ **বিরাটাকার** এবং মন্দীভূত ক্ষরণের ফলে **বামনাকার** হয়।

আড্রিনাল গ্রন্থি আবার একটি নয়—এক জোড়া। এরা মূত্রাশয়ের ঠিক ওপরে অবস্থিত। জীবনের কোন সংকটজনক মুহূর্তে মানুষ যখন ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভজনিত আবেগ বা উত্তেজনার সম্মুখীন হয়, তখন দেহকে উপযুক্ত শক্তি যোগায় এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত আড্রিনালিন (adrenalin)। এই তরল পদার্থটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে, রক্তের শর্করা ভাগ (blood sugar) মুক্ত হয়ে আসে। তার ফলে পেশীর বৃদ্ধি পায়, এবং রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা বেড়ে যায় ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয় এবং রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সঞ্চালিত হয়। এই গ্রন্থি থেকে অতিক্ষরণের ফলে অনেক সময় শিশুর মধ্যেও অকালে যৌন লক্ষণ দেখা যায়।

থাইরয়েড গ্রন্থি—গলার ভেতর, শ্বাসনালীর নীচের দিকে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। সমস্ত দেহ ও মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ অনেকাংশেই এই গ্রন্থির ওপর নির্ভর করে। এর অভাব ঘটলে হৃৎপিণ্ড, রক্ত-সঞ্চালন ও নার্ভের ক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়ে। রোগী স্থূলবুদ্ধি, অলস ও মেদবহুল হয়। শিশুদের বেলায় এর অভাবে বৃদ্ধি ব্যাহত হতে থাকে, চামড়া কর্কশ হয়ে যায়, চুল খর্ব ও ভঙ্গুর হয় এবং দেহ বামনাকৃতি হয়। আবার এ গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্ষরণের ফলে গলগণ্ড (goitre) রোগ দেখা দেয়। অন্যদিকে যদি এ গ্রন্থির ক্ষরণ বেশী হয়, তবে লোকে অতিমাত্রায় চঞ্চল, উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত 'থাইরকসিন'-এর সাহায্যে অনেক সময় এর অভাব পূরণ করা হচ্ছে।

(৯) **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous System) : স্নায়ুর শাসনেই দেহযন্ত্র চালিত হয় ; এজন্য স্নায়ুতন্ত্র-দেহের সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের এবং জটিল কোষ দ্বারা গঠিত। সমগ্র কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও সমন্বিত করাই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord), সমস্ত দেহে বিস্তৃত অসংখ্য স্নায়ুশিরা এবং অতি সূক্ষ্ম নার্ভতন্তু মিলিয়েই স্নায়ুতন্ত্র তৈরী হয়েছে।

দেহের যাবতীয় বোধ, চিন্তা ইত্যাদি শক্তিগুলি স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র মস্তিষ্কের সাথে জড়িত ; সমস্ত পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনের মূলেও মস্তিষ্কেরই বিশেষ কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত স্নায়বিক শক্তিরই অবদান আছে। কাজেই এই নার্ভতন্ত্রের সাহায্যেই একদিক দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তরঙ্গ গিয়ে মস্তিষ্কে পৌছায়, আর অন্যদিকে

মস্তিষ্ক থেকে হুকুম নিয়ে তদনুসারে কর্মেন্দ্রিয়গুলি চালিত হয়। এই দুই ধরনের কাজের জন্য দুই প্রকারের স্নায়ু আছে—প্রথম পর্যায়ের নাম **সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু** (sensory nerve); দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম **আজ্ঞাবাহী স্নায়ু** (motor nerve)।

স্নায়ুতন্ত্রকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—(১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল, (২) উপান্তমণ্ডল, (৩) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডল।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল (Central Nervous System)-ই এই তিনটি উপবিভাগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দায়িত্বশীল অংশ। এই অংশটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—**মস্তিষ্ক** (brain) এবং **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord)। মস্তিষ্ককে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum) (২) **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum), (৩) **সুষুম্নাশীর্ষ** (Medula Oblongata) এবং (৪) **পন্‌স** (Pons)।

গুরুমস্তিষ্কঃ এটিই মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ এবং এর কর্মপ্রণালীও অত্যন্ত জটিল। স্মরণ, বিচার প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার উৎস এই গুরুমস্তিষ্ক। সমস্ত দেহের নার্ভতন্ত্র সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মগজে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তাই দেহের প্রত্যেকটি বিন্দুরই অনুভূতি হয় মস্তিষ্কে। এইখানেই সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী দুই শ্রেণীর স্নায়ু মিলিত হয়েছে।

লঘুমস্তিষ্কঃ এটি গুরুমস্তিষ্কের নীচে অবস্থিত। এখানকার কয়েকটি কেন্দ্র দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে, স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটা চলা নিয়ন্ত্রিত করে, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া প্রভৃতি কাজে পেশীর সমন্বয় রক্ষা করে।

সুষুম্নাশীর্ষঃ সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষে অবস্থিত বলে এর এই নাম হয়েছে। এর স্থানে স্থানে আছে স্নায়ুকোষের গুচ্ছ। এরাই হৃৎক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্বরূপ।

পন্‌সঃ সুষুম্নাকাণ্ডের ঠিক ওপরেই স্নায়ুসূত্রগুলি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে, বিপরীতমুখী গতি নিয়ে, মস্তিষ্কের সঙ্গে মিশেছে; এই সংযোগ-স্থলটিই হচ্ছে **পন্‌স**। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোজক সেতুস্বরূপ।

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)ঃ চলতি কথায় আমরা একে বলি মেরুদণ্ড। একত্রিশটি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত ফাঁপা যে হাড়ের মালাটি ঘাড় থেকে শুরু করে প্রায় পায়ু পর্যন্ত বিস্তারিত রয়েছে, সেইটিই মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডের

ফাঁকগুলির মধ্য দিয়ে বহু স্নায়ু মস্তিষ্কে পৌঁছেছে ; এই নার্ভগুলির সাহায্যেই মস্তিষ্ক সমস্ত দেহকে পরিচালনা করে। এই সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতর দিয়েই সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ুগুলির ক্রিয়ার আদান-প্রদান ঘটে। এই সুষুম্নাকাণ্ডেই সমবেদী (sympathetic), অ-সমবেদী (Para sympathetic) এবং প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার (Reflexes) নিয়ামক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। এই হিসাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজেই সুষুম্নাকাণ্ডের সহায়তার প্রয়োজন হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ (Sense Organs) : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করি। এরজন্যই ইন্দ্রিয়সমূহকে 'জ্ঞান আহরণের দ্বার' বলে উল্লেখ করা হয়। শিশুশিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা কালে, আমরা উল্লেখ করেছি যে, শিশুকে প্রথমেই জ্ঞান দান করার চেষ্টা না করে, তার ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনা ও উন্নয়ন করলে, ফল আরও অনেক ভাল হয়। শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পক্ষে এই সকল ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা একান্তই আবশ্যক।

চক্ষু আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় ; বর্ণসুষমামণ্ডিত এই যে দৃশ্য জগৎ—তার পরিচয় ঘটে প্রধানতঃ চক্ষুর মাধ্যমে। চোখে দেখেই একটি খেলনার রং, আকার, আয়তন, গতি প্রভৃতিকে শিশু প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করে। তেমনি কান দিয়ে শুনে শুনে, শিশু অনুকরণ করে প্রথমে ভাষা বলে এবং পরে তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে ; স্বরলহরীর মাধুর্যে মুগ্ধ হবার পর দূরত্ব পরিমাপ করার কাজে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে ; স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বকের সাহায্যে কোন্ দ্রব্য কর্কশ, কোন্‌টা বা মসৃণ, কোন্‌টি শীতল, কোন্‌টি উষ্ণ—এসব পার্থক্য আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। মণ্টেসরী তাই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় স্পর্শেন্দ্রিয়কে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

সাধারণতঃ শিশুদের চোখের রোগের মধ্যে চোখে কম দেখা, দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া, ট্যারা চোখ, চোখ-ওঠা, চোখে আঞ্জনি হওয়া—ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। কানের রোগের মধ্যে কান-পাকা বা কান থেকে পূঁজ পড়া, কানে ভাল শুনতে না পাওয়া, কান ব্যথা করা ইত্যাদি প্রধান। ত্বকের প্রধান রোগ খোসপাচড়া, চুলকানি, দাদ ইত্যাদি ; নাকের রোগের মধ্যে ক্রনিক catarrh, adenoids ইত্যাদি বেশী দেখা যায় ; অনেকের নাক দিয়ে প্রায় সব সময়ই সর্দি গড়ায় ; শিশুর জিভে অনেক সময় ঘা হয়,—জিভে সাদা স্তর থেকে যায়—এসব

লক্ষণ দেখে শিশুর পেটের গোলমাল ধরা যায়। বিশেষজ্ঞ দিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা, তার ফলাফল অভিভাবককে জানানো ও তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা—শিশু-বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ হওয়া উচিত।

বৃদ্ধি ও বিকাশের হারে মন্থরতার কারণ ও প্রতিকার ঃ

নানা কারণেই শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ মন্থর গতিতে চলতে পারে। শিশু যদি কোন রোগগ্রস্ত হয়—যদি সে ঠিকমত পুষ্টিকর খাদ্য না পায়—যদি সে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে না পায় অথবা যদি সে প্রক্ষোভজনিত অশান্তিতে ভোগে,—তবে তার বৃদ্ধির গতি মন্থর ও বিকৃত হবে।

শিশুর জীবনের এই মহামূল্যবান সময়কে স্বাস্থ্যগতভাবে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক—

(ক) এমন অবস্থার সৃষ্টি করা—যাতে শিশুর স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

(খ) অসুখ ও দুর্ঘটনার হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা।

(গ) নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা করা।

(ঘ) শিশুর শারীরিক কোনও ত্রুটি বা অস্বাস্থ্যের প্রবণতা দেখা দিলে, তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা।

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঃ

শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে, তার শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ হবেই ; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় ; মানুষ পূর্ণবয়স্ক হলে, অনেক সময়ই তার ওজন ও উচ্চতা স্থিতিশীল হয়ে পড়ে—কিন্তু শিশুর বেলায় এই নিয়ম একেবারেই খাটে না। দীর্ঘদিন ধরে শিশুর ওজন না বাড়লে বুঝতে হবে যে শিশুর শরীর সুস্থ নেই। কাজেই শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার শিশুর বৃদ্ধির ও বিকাশের হার সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে শিশু জন্মাবার প্রায় নয়-দশ মাস আগে থেকেই তার **জীবনধারা** শুরু হয়ে যায়। তখন শিশু থাকে মাতৃগর্ভে। অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোষটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিলাভ করে এবং প্রায় ২৮০ দিনে তার ওজন ৬।৭ পাউণ্ড হয়ে যায়। পিতামাতার—বিশেষতঃ মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকলে, গর্ভস্থ শিশুও সাধারণতঃ

স্বাস্থ্যবান হয়। গর্ভাবস্থার এজন্য মায়ের স্বাস্থ্যের ও পুষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ; কেননা, এই সময় মায়ের দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে, পরে ভবিষ্যতে শিশুর দাঁত ও হাড়ের সমূহ ক্ষতি হয়। স্বভাবের নিয়মানুসারে শিশু মাতৃগর্ভে সুনিশ্চিত পরিবেশে, উষ্ণ উত্তাপে, নিরাপদে ও পরম আরামে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে খাদ্য বা নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য কোনও পরিশ্রম করতে হয় না ; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে আসতে হয় এক সম্পূর্ণ নূতন জগতে—জটিলতর ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতির মধ্যে, তাই জন্মগ্রহণ কালটি শিশুর জীবনের একটি বিশেষ সংকটপূর্ণ সময়। এখন থেকে তাকে অনবরত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, তাকে শ্বাসগ্রহণ করতে হবে, চুষে চুষে খাবার খেতে হবে। এই প্রচণ্ড সংগ্রাম করে এবং নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করার ফলে শিশু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে—তাই প্রথম দুই-তিন দিন সে প্রায় কিছুই খায় না ; এই সময় তার ওজন কমে যায়,—এবং এই ওজন কমা (initial weightloss) অত্যন্ত স্বাভাবিক। তারপর থেকে, শরীর সুস্থ থাকলে, শিশুর বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

শিশুর জন্মের **প্রথম বৎসরে** বৃদ্ধি অতি দ্রুত হয়। জন্মের সময় তার যা ওজন ছিল, প্রথম ছয় মাসে তার দ্বিগুণ, এবং বারো মাসে তার তিনগুণ হয়। একে **প্রথম দ্রুত বাড়তির কাল** (First springing up period) বলা হয়। **দ্বিতীয় দ্রুত বাড়তির কাল** হচ্ছে—পাঁচ থেকে সাত বৎসরের সময়। **তৃতীয় দ্রুত বৃদ্ধির কাল** প্রায় এগারো বৎসরের সময়। এই দ্রুত বৃদ্ধির কালের মাঝে যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় Filling up period—কেননা, দ্রুত বৃদ্ধিকালে শিশুর যে অপরিমেয় শক্তি ক্ষয় হয়েছিল, এই সময়ে তা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করে এবং বাড়তি শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়।

আমাদের জেনে রাখতে হবে যে শিশুর শরীরের সব অংশ একই হারে (rate) বাড়ে না। দেহযন্ত্রের পক্ষে অত প্রয়োজনীয়—যেমন **হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র**—অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলে ; এদের সঙ্গে তুলনামূলক-ভাবে দেখতে গেলে শরীরের **হাড়, পেশী** ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেসব অংশ দ্রুতগতিতে বাড়ে, কোনরকমে একবার তাদের ক্ষতি হলে, সে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই

শিশুর হৃৎপিণ্ড, চোখ, কান, স্নায়ুতন্ত্রের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে হাড় বা পেশীর ক্ষতি হলে, তা শিশুর পক্ষে ততটা মারাত্মক হয় না।

আমরা এই উপ-অধ্যায়টির নাম দিয়েছি—**শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ**। এখন দেখা যাক, বৃদ্ধি ও বিকাশ বলতে আমরা কি বুঝি! দুটো কথা কি একই অর্থবহ, না এদের অর্থের মধ্যে পার্থক্য আছে? **বৃদ্ধি** বললে আমরা সচরাচর 'আকারে বাড়া' বুঝি—আর **বিকাশ** হল কর্মশক্তির পূর্ণতা বা পরিপক্কতা এবং জটিলতা। (Growth refers to increase in size and development refers to increase in functional maturity and complexity.) শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি অর্থাৎ তার ওজন এবং উচ্চতার চার্ট বা তালিকা এ অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল। **ছেলে এবং মেয়েদের** ক্ষেত্রে এই তালিকা পৃথক হবে। তাছাড়া শিশুদের মাথার এবং বুকের ছাতি কি হওয়া উচিত, তাও এখানে দেখানো হল। এ তালিকাটি ভারতীয় শিশুদের নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, গবেষণা করে সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য (All India Institute of Hygiene) বের করেছেন। চেতলার Urban Health Centre-এর ডঃ প্রভাস সেনের আনুকূল্যে এই তালিকাটি আমার হাতে এসেছে।

শিশুর শারীরিক বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুধাবন করে অতি উৎকৃষ্ট দুইটি বই লেখা হয়েছে। এদের একটির নাম Behaviour Developments of Infants—লেখিকা ইভলিন উউয়ি এবং অন্যটির নাম The First Five Years of Life—লেখক আরনল্ড গেসেল। পিতামাতা ও ছোটদের শিক্ষকশিক্ষিকার নিকট এই দুইটি গ্রন্থ অতি মূল্যবান।

শিশুর শারীরিক বিকাশের কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হল। এগুলিই একমাত্র standard বা মান নয়,—শিশুতে শিশুতে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। গড় বা average থেকে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে।

জন্মের পর—চোখ খুলতে পারে; হাত পা নাড়ে।

১ মাস—থুতনি তোলে।

২ মাস—বুক তোলে।

৩ মাস—ধরবার চেষ্টা করে।

৪ মাস—সাহায্য পেলে বসার চেষ্টা করে।

৫ মাস—বসে জিনিস ধরে।

৬ মাস—ঝোলানো জিনিস ধরতে পারে।

৭ মাস—একা বসতে পারে।

৮ মাস—সাহায্য পেলে দাঁড়ায়।

৯ মাস—কোন কিছু ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

১০ মাস—হামাগুড়ি দেয়।

১১ মাস—সাহায্য পেলে হাঁটে।

১২ মাস—নিজে নিজে দাঁড়ায়।

১৩ মাস—সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে।

১৪ মাস—বিনা সাহায্যে দাঁড়ায় ও হাঁটার চেষ্টা করে।

১৫ মাস—হেঁটে বেড়াতে পারে ; দুটো কাঠের ব্লক ওপর ওপর রাখতে পারে।

বাটিতে কিছু রাখলে তুলতে ও ফেলতে পারে। টেবিল থেকে আঙ্গুল দিয়ে দড়ি, ফিতে ইত্যাদি তুলতে পারে "Pen" বা খোঁয়াড়ে থাকাকালীন একটি একটি করে খেলনা তুলে বাইরে ফেলতে পারে।

১৮ মাস—দৌড়ায়, কোন কিছু টানতে বা ধাক্কা দিতে পারে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারে। পেছন দিকে অল্প হাঁটতে পারে (walking backward)।

২ বৎসর—খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি বা গড়াগড়ি করে খেলে। হঠাৎ বাঁক নিতে বা দৌড়ানোর গতি কমাতে পারে না। স্নায়ুতন্ত্রের অপরিণতির জন্য কিছু কিছু কাজ করতে অপারগ হয় ; **যেমন—৫/৬টি** cube বা ব্লক দিয়ে **ওপর ওপর** সাজিয়ে tower বা মন্দির বানাতে পারে, **পাশাপাশি ভাবে** রেখে 'দেয়াল' বানাতে পারে না। ক্রেয়ন বা রং পেন্সিল দিয়ে ওপর থেকে নীচে (vertical) দাগ কাটতে পারে,—কিন্তু সমতলভাবে (horizontal) দাগ কাটতে তার অসুবিধে হয়।

২½ বৎসর—বিকাশের এটি সংকটময় কাল। তাই এ সময় শিশুর ব্যবহার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কি করা উচিত, বুঝতে না পেরে সে ইতস্তত করে। যেখানে দুটো বিকল্প (alternative) থাকে, সেখানে একটির পরিবর্তে যে অন্যটিকে গ্রহণ করতে হয়, এ জ্ঞান তার থাকে না—এই সময়কে উল্লেখ করে Gesell তাই বলেছেন, "Life is charged with double alternatives." অর্থাৎ শিশুর শারীরিক ব্যবহারে এই অস্থিরতার প্রতিফলন ঘটে।

৩ বৎসর—ছয় মাসের আগেকার নেতিমূলক, জেদী মনোভাব কেটে গিয়ে

শিশু আবার নিজেকে ফিরে পায়। হাঁটায় সময় ভারসাম্য রক্ষা করতে এখন আর তাকে হাত ছুটো ছড়িয়ে রাখতে হয় না; সে এখন বড়দের মত হাত ছুলিয়ে হাঁটে। থামা এবং চলা—এ ছুটোই এখন তার আয়ত্তের মধ্যে। সে অনায়াসেই sharp turn নিতে পারে। Vertical এবং Horizontal রেখা দিয়ে কাজ করতে পারে, যেমন—সেতু তৈয়ার, cross (+) আঁকা ইত্যাদি। খেলার সময় নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করে। এই সময়কে Gesell বলেছেন—"A culmination and a prophecy in the cycle of child development" অর্থাৎ এই সময় শিশুর বিকাশের ধারায় একটি স্তরের সমাপ্তি এবং অন্য স্তরের সূচনা হয়।

৪ বৎসর—এই সময়ে শিশু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। ছুটাছুটি করা, এক পায়ে লাফানো, বেয়ে বেয়ে ওঠা, দড়ি দিয়ে স্কিপিং করা—এ সবেতেই তার অদম্য উৎসাহ। তিন বৎসর বয়সে শিশু যা আহরণ করেছে, এ সময়ে সে সেগুলিকে দৃঢ় (stabilize) করার চেষ্টা করে। এই সময় তার মানসিক বিকাশও অত্যন্ত দ্রুত হয়—বিশেষ করে তার বাক্‌শক্তির বিকাশ। এরই প্রতিফলন ঘটে ছবি আঁকার ব্যাপারে। এই বয়সে শিশু বেশ ছবি আঁকে—ছবি আঁকতে আঁকতে, কি আঁকল তা বলে, অথবা আঁকার পর বলে। শীগগিরই তার পাঁচ বৎসর হবে, গর্বের সঙ্গে এর জন্যে সে অপেক্ষা করে; কারণ সে যে বড় হচ্ছে, এটা সে বুঝতে পারে। তার চলনে, বলনে এর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

৫ বৎসর—পাঁচ বৎসরের শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কি করতে ভালবাস?" উত্তর পাওয়া যাবে, "খেলা করতে"। প্রকৃত পক্ষে এই বয়সের শিশুরা বেশ ভাল করে খেলতে পারে। এই সময় পেশীগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় বলে খেলার সময় বড়দের সাহায্যের দরকার হয় না। বল খেলার সময় বলকে ছুঁড়ে ফেলা ও লাথি মারা—ছুটো কাজ সে একই সময়ে করতে পারে। তার অপরিণত পেশীগুলি এখন অনেক বেশী পরিণতি লাভ করে। সে একটির পর একটি পা ব্যবহার করে অনায়াসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারে, এবং পর্যায়ক্রমে (alternatively) দড়ি নিয়ে লাফাতে পারে। এই সময় সে ভাল করেই ট্রাই-সাইকেল চালাতে পারে। **পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে** কোন কিছু বেয়ে অনায়াসেই উঠতে পারে। জুতোর ফিতে বাঁধা, বোতাম লাগানোর কাজ—এখন তার পক্ষে বেশ সহজ। কোন ছবির চারিদিকে সীমারেখা (outline) এঁকে

দিলে, সে ভেতরটা রং করতে পারে এবং রং যাতে দাগের বাইরে না যায়, তার চেষ্টা করে। চেয়ারে বসে থাকলেও, সে নড়াচড়া করবে, চেয়ারের এদিক-ওদিক সরে বসবে, অথবা উঠে দাঁড়াবে। এই বয়সে প্রাণচঞ্চলতার প্রাচুর্যের জন্য একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকা শিশুর পক্ষে অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক।

TABLE 1

Mean and Standard Deviation of Measurements

All India Male

Age group	No	Standing Ht Mean	St. D	Sitting Ht Mean	SD	Weight (Kg) Mean	SD
Upto							
3 months	265	56·2	5.90	36.2	4.03	4.5	1.42
4-6 "	424	62.7	4 11	41.8	5.95	6.7	1 14
7-9 "	390	64.9	8.10	42.3	2.21	6.9	1.15
10-12 "	315	69.5	4.50	43.4	2.62	7.4	1.27
1 Year	2906	73.9	5.28	45.4	2.92	8.4	1.73
2 Years	2824	81.6	5.32	48.7	3.13	10.1	1.80
3 "	3057	88.8	6.57	51.6	3.26	11.8	2.06
4 "	3413	96 0	6·72	54.5	3 35	13.5	2.97
5 "	3.84	102.1	8.03	67.0	3 27	14.8	2.28
6 "	3816	108 5	7 15	59 4	3.33	61.3	2.68

TABLE 2

All India Female

Age group	No	Standing Ht Mean	St. D	Sitting Ht Mean	SD	Weight (Kg) Mean	SD
Upto							
3 months	300	55.0	5 41	35.3	2.33	4.2	1.17
4-6 "	345	60.9	3.55	39.1	2.44	5.6	0 98
7-9 "	421	64.4	3 63	40.9	2.36	6.2	0.99
10 12 "	263	66 7	3.85	42·1	2.60	6 6	1.13
1 Year	2654	72.5	5.20	44 2	2 87	7.8	1.63
2 Years	2603	80.1	5.79	47 5	3.20	9.6	1.93
3 "	2956	87.2	6·34	50.3	3.25	11.2	1.96
4 "	2940	94.5	6.35	53.3	3.19	12 9	2.17
5 "	3221	101.4	7.35	56.0	3.45	14.5	2.31
6 "	3665	107.4	8.65	58.4	3.55	16.0	2.63

TABLE 1 (Contd.)

All India Male

Age	No	Biolistal Diameter(cm)		No	Head Circum-ference (cm)		No	Chest Cirum-ference (cm)	
		Mean	SD		Mean	SD		Mean	SD
Upto 3 months	266	10.1	3.50	265	38.6	4.78	265	36.0	4.39
4-6 "	424	10.9	2.54	424	41.3	2.88	424	39.4	2.57
7-9 "	390	11.2	1.70	389	42.6	2.07	390	41.1	2.61
10-12 "	313	11.5	1.95	315	43.7	2.09	315	42 2	2.68
1 Year	2913	12.1	1.28	2903	44.4	3.63	2874	43 3	4.73
2 Years	2833	13 5	1.26	2793	45.9	3.68	2676	45.8	4.95
3 "	3065	14 7	1.26	2168	47.3	2.07	2194	48.0	4.29
4 "	3413	15.7	1.33	2168	48.0	1.80	2212	49 4	5.13
5 "	3489	16.4	1.27	2241	48.5	1.70	2358	50.8	5.45
6 "	3827	17.2	1.37	2514	49.0	1.73	2636	52.5	5.09

TABLE 2 (Contd.)

All India Female

Age	No	Mean	SD	No	Mean	SD	No	Mean	SD
Upto 3 month	300	9.4	2 91	300	37.7	3.24	293	34.7	3.77
4 6 "	345	10.7	3.26	343	40.6	3.62	345	38.0	2.27
7-9 "	421	11.0	2.65	421	41.7	2·55	420	39.5	2.42
10-12"	263	11.2	2.69	260	42.4	2.47	262	40 5	2 50
1 Year	2565	11.7	1.40	2643	43.6	1.84	2654	42.3	3.95
2 Years	2604	13.2	1.34	2563	45.2	1.75	2501	45.2	3.18
3 "	2962	14.4	1.25	2141	46.2	1.77	2166	47.2	3.47
4 "	2944	15.4	1.30	1962	47.1	1.81	2002	48.7	3.17
5 "	3225	16.3	1.38	2159	47.8	1.71	2175	50.1	3.78
6 "	3673	17.0	1.92	2508	48.3	1.61	2550	51.3	4.83

শিশুর স্বাস্থ্যবিধি

একটি শিশু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী—একথা বলতে আমরা বুঝি যে শিশুর শরীর **সুস্থ ও সতেজ আছে,** তার **দেহে ও মনে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় আছে।** মূলতঃ 'সুস্থ' কথাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই সু=ভাল, এবং স্থ=থাকা—অর্থাৎ ভাল থাকা। অর্থাৎ সুস্থ কথাটির মধ্যে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত বর্তমান। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যে শিশুর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ এবং শ্রম ও বিশ্রামের ছন্দটি যার নিয়মিত, যার পরিপাকতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছে—রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে যার শরীরের দূষিত ক্লেদ নিষ্কাশিত হয়ে যেতে পারছে, সর্বোপরি যে শিশু নির্মল আনন্দের অধিকারী, সে শিশুই স্বাস্থ্যবান এবং ভাগ্যবান।

শিশুরাই জাতির সম্পদ এবং ভাবী জাতির গঠক। কাজেই এদের মধ্যে যাতে **স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সদভ্যাস ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী** গড়ে ওঠে, সেজন্য প্রথম থেকেই অবহিত হতে হবে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতির কথা বক্তৃতার দ্বারা বুঝিয়ে কোনও কাজ হয় না ; জনস্বাস্থ্য (Public hygiene) এবং সমাজ স্বাস্থ্য (Social hygiene)—এ স্তরের আলোচনার বাইরে। একমাত্র **ব্যক্তিগত** ও কিছু পরিমাণে **পরিবেশগত** স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নিয়মাবলী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুরা শিখতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি

বেঁচে থাকতে হলে মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, জল, বায়ু, সূর্যালোক ; আর প্রয়োজন শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা, অর্থাৎ মলমূত্রাদি ত্যাগ করা ; এ-ছাড়া নিয়মিত বিশ্রাম ও নিদ্রা, স্নান করা, দাঁত মাজা ও মুখ ধোওয়া, নখ কাটা, হাত ধোওয়া, চুল আঁচড়ানো, ব্যায়াম করা, দেহের সুঠাম ভঙ্গী অর্জন করা, এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

বলা হয় যে, 'Nursery school is a routine of living not of schooling'. কাজেই নার্সারী স্কুলে অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুরা কাজের মধ্য দিয়েই স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করে। প্রথমেই **খাদ্যের কথা** ধরা যাক।

শিশুকে সুপাচ্য ও সুষম খাদ্য দেওয়া উচিত; দুধ ও টাটকা ফল যে শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, তা শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে। খাওয়ার সময় শিশুরা যাতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশু কোন খাবার অতি দ্রুত গিলে গিলে খাবে না; খুব বেশী পরিমাণে বা অতি অল্প পরিমাণে খাওয়াও তার উচিত নয়—দুটোই স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। শুধু মুখরোচক খাদ্য খেতে শিশুকে অভ্যস্ত করা উচিত হবে না; তবে শিশুর খাদ্য যেন সুস্বাদু হয় এবং খাদ্যে যেন বৈচিত্র্য থাকে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

জল পান ঃ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রচুর জল পান করা দরকার। জলই দেহের আবর্জনাকে মূত্র বা ঘামের সঙ্গে বের করে দেয়, এবং শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। শিশুদের প্রত্যহ দুধ, ঘোল ইত্যাদি ছাড়াও অন্ততঃ আধ সের জল খাওয়া উচিত। পানীয় জল যাতে বিশুদ্ধ হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্ষাকালে জল ফুটিয়ে ছেঁকে নিয়ে খাওয়া ভাল।

বায়ু ও সূর্যালোক ঃ প্রভাতের সূর্যের রশ্মি স্বাস্থ্যের পক্ষে অমূল্য সম্পদ; এজন্য শিশুদের ভোরে শয্যাত্যাগের অভ্যাস করানো ভাল। বিশুদ্ধ নির্মল বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে, তা শিশুদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। আজকাল শিল্পনগরীতে কলকারখানার অভিশাপে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, নির্মল বায়ু ও সূর্যালোক একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। শিশুরা যাতে অবারিত খোলা মাঠ, নির্মল বায়ু ও বিশুদ্ধ সূর্যালোক উপভোগ করতে পারে নার্সারী স্কুলের সংগঠকদের এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

মলমূত্রাদি ত্যাগ ঃ এই কাজগুলি শিশুদের একেবারে গোড়াতেই অভ্যাস করাতে হবে। এটা প্রধানতঃ পিতামাতারই দায়িত্ব। খুব ভোরে উঠে, প্রথমেই মলত্যাগের অভ্যাস করালে, এটা স্থায়ী অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় এবং শিশু মোটামুটি একই সময়ে মলত্যাগ করে। মলত্যাগের জন্য নার্সারী বিদ্যালয়ে যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়; তখন সকল শিশুকেই বাথরুমে যেতে হয়। বার বার মূত্রত্যাগ করা স্নায়ু বিকারের লক্ষণ হতে পারে। খাবার পর যদি কোন শিশু প্রায়ই মলত্যাগ করে, তবে সে কুঅভ্যাস বদলানো দরকার। আর সে শিশুর খাদ্যেরও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

দাঁত মাজা ও মুখ ধোওয়া ঃ খাওয়ার **আগে** এবং **পরে** শিশুদের ভাল করে মুখ ধোওয়া অভ্যাস করানো উচিত। খাওয়ার পর খাদ্যের ছোট ছোট

কণা দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে এবং পরে তা পচে গিয়ে মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে এবং দাঁতে পোকা হয়। এর থেকে হজমের গোলমাল এবং পেটের নানা রোগের সূত্রপাত হয়ে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করে দেয়।

আমরা ছোট বয়সে ঘুম থেকে উঠে, বাথরুম থেকে এসে, তারপর দাঁত মেজে মুখ ধুয়েছি। শিশুদের প্রত্যেককে ও অভ্যাসটি করানো ভাল। কিন্তু আজকাল চিকিৎসকদের মতে **দাঁত মাজাটা রাত্রের শেষের কাজ** (last thing at night) হলে ভাল হয়। কেননা, এতে করে সারারাত্রি ধরে খাদ্য কণাগুলি দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে পচে যেতে পারে না এবং দাঁতের অনিষ্টের কারণ হয় না। তারপর সকালে উঠে আবার দাঁত মাজলে খুব ভালই হয়। প্রথম প্রথম শিশুকে পাউডার বা টুথপেস্ট দিয়ে আঙুলের সাহায্যে দাঁত মাজতে দিতে পারা যায়। ১½ - ৩ বৎসর বয়স থেকে নরম টুথ ব্রাশ ব্যবহার করতে দেওয়া চলে। বড়দের অনুকরণ করে সে আনন্দের সঙ্গেই এই প্রাত্যহিক কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। টুথ ব্রাশ ব্যবহার করলে, তা যাতে ভাল করে পরিষ্কার করা হয় এবং মাঝে মাঝে গরম জলে ধোওয়া হয়—বড়দের সেদিকে নজর রাখতে হবে। দাঁত মাজার পর জিভ ও মুখ শিশুকে ভাল করে পরিষ্কার করতে বলতে হবে।

নখ কাটা ঃ নখ বেশী বড় হলে, স্বাভাবিকভাবেই নখের ফাঁকে ফাঁকে ময়লা জমে ওঠে এবং হাত দিয়ে খাবার সময় নখের ঐ ময়লা পেটে গিয়ে নানা রোগের সূত্রপাত করে—কারো বমি হয়, কারো বা পেট কামড়ায়, এমনি নানা উপদ্রব! বাড়িতে মায়েরা সময় সময় শিশুদের নখ কেটে দেবেন ; অন্যথায় নার্সারীর নার্স এ কাজটি করে দেবেন। নখ কাটার জন্য শিশুদের কাঁচি বা ব্লেড দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চার বা পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা nail-cutter বা নখ কাটা যন্ত্রে নিজেরাই নখ কাটতে পারে।

চুল আঁচড়ানো ঃ চুল আঁচড়ানো স্বাস্থ্যবিধির অঙ্গ—এটা শুধু বাবুগিরি নয়। চুল ভাল করে না আঁচড়ালে মাথায় ময়লা জমে খুশকি হয়, সময় সময় উকুনও হয়। নার্সারীতে প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা চিরুনি ও তার খাপ থাকে ; শিশুরা প্রত্যহ তাদের নিজেদের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে মাথা পরিষ্কার করে।

বিশ্রাম ও নিদ্রা ঃ শিশুরা চিরচঞ্চল, তাই তারা যে অনুপাতে অঙ্গ সঞ্চালন ও খেলাধূলা করে, তার ক্ষতি পূরণের জন্য তাদের প্রচুর বিশ্রাম ও ঘুমেরও

প্রয়োজন। অনেক বাড়িতে ২।৩ বৎসরের ছোট শিশুকে রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত জেগে থাকতে দেখা যায় ; এ অভ্যাস শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর। বাল্যকাল থেকে শ্রম ও বিশ্রামের একটি নিয়মিত ছন্দ গঠন করা প্রয়োজন—এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশুরা এসব কাজ ঠিক সময়ে সহজেই করে। কর্মক্লান্ত শিশুকে বিশ্রাম দেবার ও ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা প্রায় সকল নার্সারীতেই বিদ্যমান ; দুপুরে খাওয়ার পর নার্সারীর প্রতিটি শিশুর বিশ্রাম বাধ্যতামূলক। একটি তিন বৎসরের শিশুর পক্ষে প্রতিদিন অন্ততঃ বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। শরীর বুঝে পাঁচ বৎসর বয়সের পর এ-ঘুমের মাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকবে।

স্নান করা ঃ গায়ে যে ময়লা জন্মে, তাতে লোমকূপের পথ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। স্নানের ফলে এই লোমকূপের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়, এবং পরে ঘামের ভেতর দিয়ে দেহের ক্লেদ দূর হয়ে যায়। স্নানে দেহের দুর্গন্ধ দূর হয়, এবং দেহ স্নিগ্ধ ও শীতল হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রত্যহই স্নান করা উচিত ; স্নানের আগে শরীরে তেল মেখে, তোয়ালে বা গামছা দিয়ে অঙ্গ মার্জনা করলে রক্তচলাচল ভাল হয়। দেহ দুর্বল থাকলে অথবা শীতকালে শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করানো উচিত। স্নানের সময় যাতে অপরিষ্কার জল শিশুরা না খেয়ে ফেলে এবং কানে যাতে জল না ঢোকে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

হাত ধোওয়া ঃ এটি নার্সারী স্কুলের কার্যাবলীর একটি বিশেষ অঙ্গ। খাবার আগে প্রতিটি শিশুকে আবশ্যিকভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়। তারা আস্তে আস্তে বুঝতে শেখে যে খাবার আগে হাত না ধুলে, হাতের ময়লাগুলি খাবারে লেগে যায়, এবং সে খাবার খেলে অসুখ করে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, স্কুলে এ ধরনের শিক্ষা পেয়ে শিশু নিজে বাড়িতে সব বয়স্কদের খাবার আগে হাত ধুয়ে খেতে বসতে অনুপ্রাণিত করছে।

একজনের চিরুনি অন্য শিশু ব্যবহার করবে না। মাঝে মাঝে সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ঘষা উচিত। খুব ছোট বয়স থেকে অভ্যাস করালে চুল আঁচড়ানোর ব্যাপারটি শিশুরা অনায়াসেই আয়ত্ত করতে পারে।

ব্যায়াম ও দেহের সুঠাম ভঙ্গী ঃ বেঁচে থাকতে গেলে প্রত্যেকেরই অঙ্গ-চালনা করার প্রয়োজন হয়। কতকগুলি নিয়ম মেনে চললে এই অঙ্গচালনাকেই 'ব্যায়াম' আখ্যা দেওয়া যায়। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে লোকের কর্মশক্তি বেড়ে যায়, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং আয়ুরও বৃদ্ধি হয়। ছোট শিশুদের পক্ষে

এইসব নিয়মকানুন মেনে নিয়ে ব্যায়াম করার দরকার হয় না ; তাদের আনন্দময় স্বতঃস্ফুর্ত অঙ্গসঞ্চালনই দেহের সুষম বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে। ভাল নার্সারীতে যে অবারিত খোলা মাঠের ব্যবস্থা থাকে, সেখানে আনন্দে সঙ্গীসাথীর সঙ্গে দৌড়া-দৌড়ি করে, খেলা করে শিশুরা চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। নার্সারীতে যে slide, দোলনা, jungle jim প্রভৃতি খেলার সামগ্রী আছে, তার দ্বারা শিশুদের সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালন হয়।

আমরা অনেক সময় কু-অভ্যাস দ্বারা আমাদের বসা, চলা বা শোবার ভঙ্গীতে দেহকে বিকৃত করে ফেলি। মণ্টেসরী দেহে সুঠাম ভঙ্গী গঠনের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে—শিশুদের একেবারে ছোটবেলা থেকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের চলন, বলন, হাঁটা, দাঁড়ানো, শোয়া—সব কিছুই *Graceful* অর্থাৎ সুঠাম হয়। কুঁজো হয়ে বসলে বা দাঁড়ালে শিরদাঁড়ার ওপর অযথা চাপ পড়ে, এবং পেটের ভেতরে রক্ত চলাচল সহজ হয় না ; ঝুলে পড়া বা অতি নরম শয্যায় শোয়া, কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়া—সবই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শীতকালে মাথ বা মুখ পর্যন্ত লেপ বা কম্বল দিয়ে ঢেকে শোয়া, বা ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে শোয়াও অনুচিত। ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দিলে শিশুরা অনায়াসেই এসব কুঅভ্যাস দূর করে, সুঠাম দেহভঙ্গীর অধিকারী হতে পারে।

শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ পোশাক ও পরিচ্ছদের মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য—এতে শরীরের উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হয় এবং সভ্য মানুষের পক্ষে পোশাক তার সামাজিক জীবনের প্রতিফলন। দেশ, জলবায়ু, অভ্যাস ও বয়সের তারতম্য অনুসারে পোশাকের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের পোশাক মজবুত, সাদাসিধে, ঢিলে ও নরম হওয়া উচিত। তাদের পোশাক যেন অযথা আঁটসাঁট (tight fitting) না হয়, তা দেখতে হবে—কেননা, তা না হলে তারা স্বচ্ছন্দে খেলাধুলা করতে পারবে না। শিশুদের জামাকাপড়ে কখনও সেফটিপিন বা অন্য কোন রকমের পিন লাগানো উচিত নয়, তাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। শিশুদের জামাকাপড় এমন হওয়া দরকার যাতে তা তারা নিজেরাই খুলতে ও পরতে পারে। শিশুদের জুতোও চওড়ামুখ, ঢিলে ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। জুতো ছোট হয়ে গেলে, সে জুতো কখনই শিশুদের পরতে দেওয়া উচিত নয়,—কেননা, তাতে তাদের পায়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, এবং খেলাধুলাতেও নানা অসুবিধের সৃষ্টি হয়।

পরিবেশ সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি

যদি খুব ছোট বয়স থেকে শিশু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী অভ্যাস করতে পারে, তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার দিকে তার দৃষ্টি পড়বে। মহাত্মা গান্ধী তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 'সাফাই' শিক্ষার কথা বলেছেন। শিশুবিদ্যালয়ে শিশুরা নিজেরাই ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে, ফুল সাজায়। তারা জানে যে এটা **তাদেরই স্কুল**—তাই এটাকে নোংরা করা চলবে না। এজন্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, প্রস্রাব করা, ফলের খোসা বা কাগজ ফেলা—এসব শিশুরা একেবারেই করে না। ছোটবেলা থেকে স্কুলের মারফতে এই যে একটি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, তারই ফলে শিশু ক্রমে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে। কাজেই 'Desirable attitudes and habits' গড়ে তোলাই প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এখানে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠলে, **ছোট ছোট শিশুরাই** তাদের পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ও উন্নয়নের কার্যে সহায়ক হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যে Record রাখা হয়, তার একটি নমুনা এই সঙ্গে দেওয়া হল।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বিদ্যালয় শ্রেণী বিভাগ—

শিশুর নাম ছেলে/মেয়ে জন্মের তারিখ—

পিতা অভিভাবকের
নাম ও ঠিকানা—

স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ	(i)	(ii)	(iii)
সাধারণ অবস্থা			
১। নিয়মিত উপস্থিত হয় কিনা			
২। উচ্চতা			
৩। ওজন			
৪। দেহভঙ্গী			

৫। বুক—(ক) সাধারণ ভাবে—
(খ) বুক ফুলিয়ে—
৬। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
৭। পোশাক-পরিচ্ছদ
৮। পায়ের আবরণী
৯। শিক্ষিকার মত অনুসারে :
(ক) প্রতিভাবান
(খ) মাঝারি
(গ) পিছিয়ে পড়া
(ঘ) স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন
১০। অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিকতা
১১। তারিখসহ বিগত ইতিহাস :
হাম—
হুপিং কফ—
ডিপথিরিয়া—
বসন্ত—
টাইফয়েড—
কলেরা—
রিউমেটিক জ্বর—
প্লুরেসি—
ম্যালেরিয়া—
ফিট—
কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা—
অন্য কিছু—
১২। পারিবারিক ইতিহাস
১৩। টীকা ইত্যাদি নেবার ইতিহাস :
(ক) বসন্তের টীকা
প্রাথমিক তারিখ
পুনর্বার দেবার তারিখ
(খ) কলেরা
তারিখ—
(গ) ডিপথিরিয়া
তারিখ—
(ঘ) বি. সি. জি.
তারিখ—
(ঙ) টি. এ. বি
তারিখ—
১৪। পুষ্টি :
ভাল—
মাঝারি—
মন্দ—
চর্বি—
১৫। পরিপাকতন্ত্র :
ক { মুখ—
জিভ
খ { দাঁত—
মাড়ি—
গ—কোষ্ঠকাঠিন্য
ঘ—পেটের অসুখ
ঙ—আমাশয়
চ—কৃমি
ছ—লিভার—মাপ—
জ—প্লীহা—
ঝ—অন্য কোন অস্বাভাবিকতা—
১৬। **রক্তসংবহন তন্ত্র** (Blood Circulatory System)—
হৃৎপিণ্ড—
নাড়ী
রক্তাল্পতা—

১৭। শ্বাসতন্ত্র :
(ক) গলা—
টনসিল বড় বা বিষাক্ত—
ফেরেনজাইটিস—
(খ) ফুসফুস
প্লুরেসি—
ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস—
হুপিং কফ—
যক্ষ্মা — সন্দেহজনক / প্রকৃত
অন্য কিছু—

১৮। ইন্দ্রিয়াদি :
নাক—এডিনয়েড—
অন্যান্য ত্রুটি—
কান—
কম শোনে কিনা—
কানে ব্যথা—
কানে পুঁজ হওয়া—
অন্যান্য ত্রুটি—

১৯। ক্ষরণতন্ত্র :
থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড—
লিম্ফ গ্ল্যাণ্ড—
মাম্পস—

২০। স্নায়ুতন্ত্র :
মানসিক অবস্থা—
ফিট—
পক্ষাঘাত—
পেশীর ক্ষয়—
বিছানা ভেজানো—
অন্যান্য ত্রুটি—

বাকশক্তি :
তোতলায় কিনা—
অন্যান্য ত্রুটি—

চক্ষু-সংক্রান্ত :
দৃষ্টি—
রাতকানা—
Xerosis—
চোখের পাতার অসুখ—
টেরা—
চশমা পরে কিনা—
অন্যান্য ত্রুটি—

২১। ত্বক :
দাদ—
খোস-পাঁচড়া—
একজিমা (Eczema)—
কুষ্ঠ—
ছত্রক—
অন্যান্য—

২২। অস্থি :
বাত—
রিকেট—
অন্যান্য ত্রুটি—

২৩। দেহচালনা করতে সমর্থ কিনা :
স্বাভাবিক—
মধ্যম—
অপারগ—

২৪। গবেষণাগারে পরীক্ষা :
মল—
মূত্র—
রক্ত—
গলার থুথু—
বুকের X'ray—
অন্যান্য—
মন্তব্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি

মানবশিশুর দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের মূলে আছে খাদ্য। দৈনন্দিন খেলাধুলায়, নানা কাজকর্মে ও ছুটাছুটির ফলে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দেহযন্ত্রের অসংখ্য কোষের বিনাশ ও শারীরিক শক্তিক্ষয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণীমাত্রই তাই খাদ্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে দেহের ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

আমরা জানি যে, কাজ করবার জন্য মানুষের শক্তির প্রয়োজন হয়। ইঞ্জিন চালাবার জন্য, আমরা লক্ষ্য করি, কয়লা, পেট্রল, ডিজেল বা ঐ জাতীয় ইন্ধনের প্রয়োজন হয়। এদের দহনের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই শক্তিই ইঞ্জিনকে চলতে শক্তি জোগায়। অনুরূপভাবে দেহযন্ত্রের জন্য তাপ-উৎপাদক ইন্ধনের দরকার হয়; এই ইন্ধনের নামই হল **খাদ্য**। দেহযন্ত্রের ইন্ধন—খাদ্যকে **দাহ্যপদার্থ** হতে হবে, তবেই সে শরীরে তাপসৃষ্টি করে শক্তি জোগাবে। মনে রাখতে হবে যে শুধু দাহ্যপদার্থ হলেই তা খাদ্য হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মোমবাতি, খড়, কাগজ ইত্যাদি দাহ্যপদার্থ নিশ্চয়ই, কিন্তু মানুষের পরিপাক-যন্ত্রে এসব জীর্ণ হতে পারে না, অর্থাৎ এদের পাচ্যগুণ (digestibility) নেই; সুতরাং এরা মানুষের খাদ্য বলে পরিগণিত হতে পারে না।

খাদ্য যদি সুষম না হয়, তবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খেতে থাকলে, শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয় ঠিকই; কিন্তু শরীরের এই দহনক্রিয়া ঠিকমত ভাবে সম্পাদন করতে হলে নানাজাতীয় ভিটামিন খাদ্যেরও প্রয়োজন। কাজেই দেহের **ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন, দেহে তাপশক্তির উৎপাদন, দেহের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মকে চালু রেখে দেহকে কর্মক্ষম ও সর্বোপরি সুস্থ রাখা**—এ সবই হল খাদ্যের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

খাদ্যবস্তুকে প্রধানতঃ পাঁচটি উপাদানে ভাগ করা যায়; যথা—(১) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় পদার্থ (Carbohydrates), (২) প্রোটিন (Protein), (৩) লবণজাতীয় পদার্থ (Minerals), (৪) চর্বি ও স্নেহজাতীয় পদার্থ (Fat) এবং (৫) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamin).

(১) **শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় পদার্থঃ** চাল, আটা, খই, মুড়ি, আলু, কচু প্রভৃতি কন্দজাতীয় খাদ্য এবং মধু, গুড়, চিনি, মিছরি—এ সবই এই জাতীয় খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। এদের মধ্যে চাল, আটা, আলু ইত্যাদি **শ্বেতসার** জাতীয় এবং চিনি, মধু ইত্যাদি **শর্করা**-জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। কার্বো-হাইড্রেট খাদ্য দেহের ভিতর গিয়ে সাধারণ দ্রাক্ষা-শর্করায় বা glucose-এ রূপান্তরিত হয়। তারপর তা দেহকোষের মধ্যে শোষিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্যই এই কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য—অর্থাৎ চাল, গম বা আটা। এগুলি দামেও অপেক্ষাকৃত সুলভ। তাই পেট ভরাবার প্রধান উপাদান হিসাবে ভারতের মত গরীব দেশকে এই ধরনের খাদ্যের ওপরই প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। দৈহিক পরিশ্রম যারা বেশী করে তাদের এই ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন আছে; শর্করাজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ চিনি, মধু ইত্যাদি শিশুর দ্রুত বাড়ন্ত দেহের জন্য উপযোগী।

(২) **প্রোটিনঃ** দেহের অভ্যন্তরে তাপ সৃষ্টি করতে এবং দেশকোষ ও শারীরিক শক্তির ক্ষয়-ক্ষতি পুরণে প্রোটিনের অবদান অসীম। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধে প্রোটিনের মাত্রা সর্বাধিক থাকে। শিশুদের আদর্শ খাদ্য—প্রতিদিন এক পাইণ্ট থেকে এক কোয়ার্ট দুধ অথবা ঐ পরিমাণ দুধ থেকেই উৎপন্ন ছানা, সন্দেশ, দই, ঘোল ইত্যাদি এবং সেই সঙ্গে কিছু মাছ, মাংস বা ডিম থাকা দরকার। শিশুদের পক্ষে জান্তব প্রোটিন অধিক সহজে প্রাচ্য; তবে এদের খাদ্যের উদ্ভিজ্জাত প্রোটিন—ডাল, মটর শুঁটি, শিমজাতীয় তরকারি—কিছু কিছু রাখা উচিত। আজকাল চিকিৎসকেরা সয়াবীনকে উদ্ভিজ্জাত প্রোটিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত প্রত্যেকেরই উচিত পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন খাওয়া; কেননা, এই সময়ই দেহ গঠনের কাল। WHO (World Health Organisation)-এর মতে—একটি দুই বৎসরের শিশুর শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজন অনুযায়ী ১'৪৯ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া দরকার। (A child of two needs about 1.49 protein per kg. of body weight.

(৩) **লবণজাতীয় পদার্থঃ** শরীর সুস্থ রাখার জন্য এবং শরীরের গঠনের জন্য খাদ্যে লবণজাতীয় পদার্থের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। এই জাতীয় খাদ্য শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়ার সংগঠনে সহায়তা করে। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যায় যে, **লৌহের** অভাবে রক্ত তার অক্সিজেন সরবরাহের কাজ চালাতে পারে না, **ক্যালসিয়ামের** অভাবে দাঁত ও দেহের হাড় শক্ত হতে পারে না, হৃৎপিণ্ডের কাজে বিঘ্ন ঘটে এবং কোথাও কেটে গেলে রক্ত জমতে দেরি হয়। **আয়োডিন** গ্ল্যাণ্ডের সুস্থ ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন। **ফসফরাস** অস্থি গঠনে ও নার্ভের সুস্থতা রক্ষার সহায়তা করে।

টাটকা ফল, সবজি, ডিম, দুধ, মেটে ইত্যাদিতে নানা প্রকারের ধাতব লবণ বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান থাকে। ছোটদের প্রচুর পরিমাণে দুধ খাওয়াতে পারলে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হতে পারে। মাংসের মেটেয়, ডিমের হলদে অংশে এবং তাজা সবুজ শাকপাতায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ বর্তমান থাকে। আয়োডিনের অত্যধিক কমতি হলে গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন মলমূত্র ও ঘামের সঙ্গে যে লবণ দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়, তার ক্ষতি-পূরণ বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে করা একান্ত প্রয়োজন। গরম দেশে প্রয়োজন হলে গ্রীষ্মকালে, ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে, শিশুর শরীরের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য বিশিষ্ট ঔষধের ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে।

(৪) **চর্বি ও স্নেহজাতীয় পদার্থ :** এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে তিল, নারিকেল, সরিষা, বাদাম প্রভৃতি তৈলবীজ থেকে উৎপন্ন স্নেহ পদার্থ ঘৃত, মাখন, মাছের তেল, প্রাণীদের চর্বি—এ সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। স্নেহ পদার্থযুক্ত খাদ্যের প্রধান কাজ দেহে **তাপশক্তি উৎপাদন**। এই প্রকার খাদ্যের তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা **কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় দ্বিগুণ**। চর্বি সাধারণতঃ চামড়ার নীচে, দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল অবস্থায় বর্তমান থাকে ; এই চর্বির জন্যই শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট ও নিটোল দেখায়। চর্বি থাকার জন্য দেহের ওপর একটি অপরিবাহী (non-conducting) স্তর সৃষ্টি হয়ে, শরীরকে শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করে। এইজন্যই শীতপ্রধান দেশের লোকদের তিমি, সীল প্রভৃতি জলজ প্রাণীদের চর্বির বেশী প্রয়োজন হয়। তবে ভারতবর্ষের বা পশ্চিমবঙ্গের মত গরম দেশে, বিশেষতঃ যারা যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাদের পক্ষে অতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহ পদার্থ গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শিশুদের এ জাতীয় খাদ্য বেশী খাওয়া উচিত নয়—কেননা, এই খাদ্য পরিপাক করতে বেশী সময় লাগে, এবং যকৃৎ একে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তবে শিশুর সুষম খাদ্যে অল্প পরিমাণে স্নেহজাতীয় খাদ্য নিশ্চয়ই

থাকা উচিত। যে স্নেহ পদার্থ যত কম উষ্ণতায় গলে যায়, তা তত তাড়াতাড়ি জীর্ণ হয় ; তাই শিশুদের পক্ষে **মাখন**, তেল বা ঘি থেকে উৎপন্ন খাদ্য সহজপাচ্য স্নেহ পদার্থ।

(৫) **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ঃ** খাদ্যদ্রব্যের অন্যতম অত্যাবশ্যক উপাদানের নামই **ভিটামিন**। "Vita"—কথাটির অর্থ 'জীবন'। কারণ, এই ভিটামিনের অভাবে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও লবণ জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা সত্ত্বেও জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। এই ভিটামিনের প্রয়োজনও হয় অতি অল্প মাত্রায়, কিন্তু এক অনন্য উপায়ে এরা অন্যান্য খাদ্য-উপাদানকে দেহের পক্ষে গ্রহণোপযোগী করে তোলে। সূক্ষ্ম ও জটিল কলকব্জাকে ভাল করে চালাতে হলে যেমন মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা তেল দিতে হয়, তেমনি দেহযন্ত্রকে সুস্থ ভাবে চালাতে হলে বিভিন্ন ভিটামিনের প্রয়োজন। তাই দেহযন্ত্রকে ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করে, ভিটামিনগুলিকে তুলনামূলকভাবে 'পিচ্ছিলকারী তৈল' বা lubricating oil বলা যেতে পারে। নিম্নে **বিভিন্ন ভিটামিন** ও তাদের **বিশেষ গুণাবলীর উৎস** এবং **অভাবজনিত রোগ** সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ভিটামিন-এ ঃ দেহের পরিপাক, শ্বাস ও প্রস্রাব যন্ত্র এবং চোখের বিভিন্ন অংশের আভ্যন্তরীণ লাইনিং সুস্থ রাখতে হলে 'ভিটামিন-এ' অত্যাবশ্যক। সাধারণতঃ প্রাণীদের লিভারের তেলে ভিটামিন বেশী থাকে। কচি পাতায় ও ঘাসে ক্যারোটিন (carotene) নামে যে পদার্থটি থাকে, সেটাই তৃণভোজী প্রাণীর উদরে গিয়ে 'ভিটামিন-এ' হয়। তাই যে গরু, ছাগল বা মহিষ মাঠে চরে বেড়ায়, তাদের দুধে এজাতীয় ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ডিমের কুসুম, গাজর, পালং শাক এবং প্রাণীদের লিভারের তেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই জাতীয় ভিটামিন পাওয়া যায়। শিশুদের পক্ষে এই ভিটামিন বিশেষ দরকারী। এর অভাবে দেহের লাবণ্য ও পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং নানাবিধ চোখের রোগ হয়। প্রখর আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে গেলে দেখতে খুব বেশী অসুবিধে বোধ করলে বুঝতে হবে যে শরীরে এই ভিটামিনের অভাব রয়েছে। আমাদের দেশে যে এত বেশীসংখ্যক অন্ধ লোক দেখা যায়, তার অন্যতম কারণ হল খাদ্যে 'ভিটামিন-এ'র অভাব।

ভিটামিন-বি ঃ এই ভিটামিনের আবার নানা উপবিভাগ আছে। বিস্তারিত

বিবরণের মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা চলে যে স্নায়ু, হৃদ্‌যন্ত্র, পরিপাকযন্ত্র ইত্যাদি মানবদেহের বিভিন্ন অংশের ওপর এই ভিটামিনের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। চালের ওপর যে বাদামী পর্দাটি দেখা যায়, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে 'ভিটামিন-বি' বর্তমান থাকে ; কলে-ছাঁটা চালে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় ; ভাত রান্না হবার পর তার ফেন বার করে ফেলে দিলেও ভাতের ফেনের সঙ্গে এই ভিটামিন ফেলে দেওয়া হয়। তাছাড়া আস্ত গম, যব, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, মেটে, ঈস্ট (yeast), চিনাবাদাম, পোস্ত, কাঁঠাল বীচি, কচি শাক-সবজি—এ সব কিছুই অল্পবিস্তর এই ভিটামিনের উৎস। খুব সাদা ধবধবে কলে-ছাঁটা চালে বা অতিরিক্ত সাদা চিনিতে এই ভিটামিন বজায় থাকে না। এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে **বেরিবেরি, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, পক্ষাঘাত, ঠোঁটে বা মুখে ঘা, চর্মরোগ** ইত্যাদি হয় ; বিশেষ করে পেলেগ্রা (pellagra) নামক একপ্রকার চর্মরোগ উল্লেখযোগ্য।

ভিটামিন-সি ঃ নানা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধে 'ভিটামিন-সি' বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ টক স্বাদযুক্ত সমস্ত ফলে—যেমন লেবু, কমলালেবু, আমলকী, আনারস, আঙ্গুর, টম্যাটো, আম প্রভৃতিতে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে বজায় থাকে। তাছাড়া পালং শাক, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ ইত্যাদিতেও কিছু কিছু পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। তবে এই ভিটামিন উত্তাপে শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায় ; শাক-সবজিও বাসি হয়ে গেলে তাতে এই ভিটামিন থাকে না। তাই রোজই কিছু পরিমাণ তাজা শাক-সবজি, স্যালাড ও তাজা ফল শিশুদের খেতে দিতে হয়। ভিটামিন-সি-এর অভাবে স্কার্ভি (scurvy) নামে মারাত্মক রোগ দেখা দেয় ; দুর্বলতা, ফ্যাকাশে মুখ, দাঁতের মাড়িতে ক্ষত ও রক্ত পড়া—এই জাতীয় রোগের লক্ষণ। তাছাড়া এর অভাবে শিশুর স্ফূর্তি কমে যায়, খোস পাঁচড়া হয়, এবং ঘা হলে তা আর সহজে সারতে চায় না। যে সব শিশুরা প্রধানতঃ দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যের ওপর বেশী নির্ভর করে, তাদের খাদ্যে কমলালেবু, মুসাম্বী বা টম্যাটোর রস, অথবা ভিটামিন-সি ট্যাবলেট প্রত্যহ দেওয়া আবশ্যক।

ভিটামিন-ডি ঃ শিশুদের শরীরের বৃদ্ধির জন্য—বিশেষ করে হাড় ও দাঁতের সুস্থ বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে 'ভিটামিন-ডি' প্রয়োজন হয়। শরীরে গৃহীত খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পৃথক করে রক্তস্রোতে প্রবাহিত করা এবং পেশী

ও অস্থির পুষ্টিতে সহায়তা করা এই ভিটামিনের অন্যতম কাজ। শিশুর দ্রুত বাড়ন্ত শরীরের পক্ষে এইজন্যই ভিটামিন-ডি অত্যাবশ্যক। সাধারণতঃ সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ স্নেহপদার্থে **স্টেরল** (sterol) নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। এই স্টেরলই সূর্যকিরণের প্রভাবে ভিটামিন-ডি-তে পরিণত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষ অনেক সময়ই খালি গায়ে থাকে, তাতে সহজেই শরীর সূর্যরশ্মি গ্রহণ করতে পারে ; এজন্য সেসব জায়গায় এই ভিটামিনের অভাব কম দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ঠাকুমা, দিদিমারা শিশুকে তেল মাখিয়ে রোদে ফেলে রাখতেন ; এটা যে একটা স্বাস্থ্যসম্মত প্রথা, তাতে সন্দেহ নেই। শীতপ্রধান দেশে মানুষের দেহ অধিকাংশ সময়েই জামা-কাপড়ে আবৃত থাকে, ঘরের দরজা-জানালাও অনেক সময় বন্ধ থাকে—সুতরাং সেখানকার লোকেরা সূর্যকিরণ গায়ে লাগাবার বিশেষ সুযোগ পায় না। 'কডলিভার অয়েল', 'হেলিবুট অয়েল', 'শার্ক অয়েল' ইত্যাদি নাম দেখে বোঝা যায় যে এসব তেল হাঙ্গর, কড প্রভৃতি মাছের যকৃৎ থেকে গৃহীত। ভিটামিন-ডি-এর উৎস এইসব মাছের যকৃৎ থেকে পাওয়া তেল। বাড়ন্ত শিশু ছাড়াও সন্তানবতী ও প্রসূতি নারীদের এই ভিটামিনের একান্ত প্রয়োজন। ভিটামিন-ডি এর অভাবে 'অস্থির অপুষ্টি' (Rickets) এবং দাঁতের পোকা' (Caries) প্রভৃতি রোগ হয়, এবং পেশী ও সন্ধি বন্ধনীগুলির যথাযথ পুষ্টি হয় না।

ভিটামিন-কে ঃ মাখন ও টাটকা শাক-সবজির মধ্যে সাধারণতঃ এই জাতীয় ভিটামিন বর্তমান থাকে। এর অভাবে রক্ত জমাট (coagulation) বাঁধে না ; শরীরে অস্ত্রোপচারের ফলে, অথবা অন্য কোনও কারণে প্রচুর রক্তপাত হলে রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য আজকাল অস্ত্রোপচারের এবং দাঁত তোলার আগে ভিটামিন কে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

রাফেজ (Roughage) ঃ এই সকল মূল্যবান উপাদান ছাড়াও, খাদ্যে কিছু কিছু **অপ্রয়োজনীয় পদার্থ** থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ডিম, মাংস, দুধ বা স্যুপ জাতীয় জিনিস ক্রমাগত খেতে থাকলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দেখা দিতে পারে ; তাই খাদ্যে কিছু শাকপাতা, আঁশসহ আম, বেল, খোসাসহ আলু প্রভৃতি থাকলে ভাল হয়। এসব 'রাফেজ' জীর্ণ হয় না বলে এদের খসখসে গাত্র অন্ত্রের ভিতরের নরম আস্তরণের সঙ্গে ঘর্ষণে উত্তেজনার সৃষ্টি করে একটা আলোড়ন ঘটায় ; এরই ফলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

জল : জল খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ ; প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে বিচার করলে বাতাসের পরেই জলের স্থান ; তাই জলের আর এক নাম 'জীবন'। জলের কোনও তাপ উৎপাদক শক্তি বা ক্যালোরী মূল্য নেই, এতে কোন ভিটামিনও নেই। তবু দেহকে সক্রিয় রাখতে জল একান্তই আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্য জলের সাহায্যেই তরলীকৃত হয়ে পরিপাক এবং শরীরে গৃহীত হয়। এই জলের সাহায্যেই অর্থাৎ ঘাম, প্রস্রাব ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে যায়। জলের একটি প্রধান ধর্ম **তাপের সমতা রক্ষা** অর্থাৎ সহজে গরম এবং সহজে ঠাণ্ডা না হওয়া। এজন্য প্রচণ্ড গ্রীষ্মে প্রচুর পরিমাণে জল পান করলে সর্দি-গরমিতে (heat-stroke) আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। জল দেহকে স্নিগ্ধ ও সক্রিয় রাখে। এই কারণে ছোট শিশুকে দুধজাতীয় পানীয় ছাড়াও মাঝে মাঝে জল পান করানো উচিত। গ্রীষ্মকালে শিশুদের প্রচুর জল খেতে দেওয়া ভাল। নার্সারী বিদ্যালয়ে পানীয় জল যেন বিশুদ্ধ হয়, এবং জল রাখার পাত্রাদি যেন ঢাকা থাকে এবং পরিষ্কার থাকে—সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ক্যালোরি বা তাপশক্তির পরিমাপ (Calories) **:** দেহযন্ত্রের পক্ষে কোন ইন্ধনের তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা কতখানি, তার পরিমাপের এককক‌ে **ক্যালোরি** বলা হয়। সব খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য সমান নয়। মাংস, ডিম, মাছ, পনীর, দুধ, খেজুর, শুকনো বা তাজা ফল, সয়াবীন, মটরশুঁটি—এদের ক্যালোরি-মূল্য বেশী ; এদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে লেটুস, বাঁধাকপি ফুলকপি—এদের ক্যালোরি-মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। জল বা ধাতব লবণের ক্যালোরি-মূল্য শূন্য।

নীচে আমরা চার রকমের সুষম খাদ্যতালিকার নমুনা দিলাম। প্রথম দুটি ২—৩ বৎসরের এবং পরের দুটি ৪—৬ বৎসরের শিশুদের জন্য। আমাদের মত গরিব দেশের কথা ভেবে, অল্প আয়ের পিতামাতারাও যাতে শিশুদের সুষম খাদ্য দিতে পারেন, সেজন্য নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্যও বিভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। চেতলা (কলিকাতা) হেলথ্ সেণ্টারের খাদ্য তালিকা-বিশারদ শ্রীমতী নিভা সেনগুপ্তার সৌজন্যে এগুলো পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি খাদ্য তালিকায় দৈনিক খাদ্যের বর্তমান মূল্য, পরিমাণ ও ক্যালোরি-মূল্য দেখানো হয়েছে। দেশ, কাল ও রুচি অনুযায়ী এই দৈনিক রেশন (Ration) থেকে সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাত্রির খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন—**সকালে** রুটি (আটার রুটি বা

পাউরুটি), ডিম, দুধ, মুড়ি, চিঁড়া, কলা, ছোলার ছাতু ইত্যাদি থেকে তৈরী খাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **দুপুরে** ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি ; **বিকেলে** দুধ, মুড়ি, ফল, রুটি ইত্যাদি (রুচি অনুযায়ী) এবং **রাত্রে** ভাত অথবা রুটি, ডাল, তরকারি, মাছ বা মাংস কিম্বা দুধ, রুটি প্রভৃতি। প্রতিটি ক্ষেত্রে **পারিবারিক** ও **ব্যক্তিগত রুচি** এবং **শারীরিক অবস্থার** ওপর নির্ভর করে শিশুর খাদ্যতালিকা ঠিক করা দরকার।

TABLE I

Recommended daily allowances of calories and some essential nutrients

	Net calories	Proteins,g	Calcium, g.	Iron, g
0 to 6 Mths	120/kg.			
7 to 12 „	1000/kg.			
1 to 3 Yrs	1200	3.5/kg.		
4 to 5 „	1500			
5 to 6 „	1500	3.00/kg.	1.0 to 1.5	10 to 30
6 to 7 „	1800			

Vit. A. I. U.	Thiamine (Vit. B) mg.	Ascorbic acid V (Vit.C) mg
3000 to 4000	0 5 to 1.0	30 to 50 and over

Note : The estimates of the protein requirements of children and adolescents are given in terms of grams per kilogram, because adequate data about average weight in the various age groups are not available.

TABLE II

Composition of a balanced diet for a normal adult male

(Adequate for the maintenance of good health)

Class of food	Quantity	
	Ozs.	Gms.
Cereals	14	400
Pulses nuts and oilseeds	... 3	85
Green leafy vegetables	... 4	114
Root vegetables	... 3	85
Other vegetables	... 3	85
Fruits	... 3	85
Milk and milk products	... 10	284
Sugar and jaggery	... 2	57
Vegetable oil, ghee, etc.	... 2	57
Fish and meat	... 3	85
Eggs	... 1 (1 egg)	40

Note 1 : The approx. nutritive value of the diet is : Calories 3000 ; protein 90g. ; carbohydrates 450 g. ; fat 90 g. ; calcium 1.4 g. ; phosphorus 2.0 g. ; iron 47 mg ; carotene and vitamin A 8, 400 I. U. vitamin A ; thiamine 2.1 mg. ; riboflavin 1.8 mg ; Nicotonic acid 22 mg ; vitamin C 240 mg.

Note 2 : Persons who do not normally consume flesh foods can obtain a balanced diet increasing the quantity of milk, pulses or nuts.

Ref : *The Nutrition Value of Indian Foods and the Planning of Satisfactory Diets.*

Published by Indian Council of Medical Research, 1969.

২—৩ বৎসরের শিশুর সুষম খাদ্য

খাদ্য	পরিমাণ	প্রোটিন	ক্যালোরি	মূল্য ১.১২.৭১
চাল	৭৫ গ্রাম	৪·৮	২৫৯	০·১০ পয়সা
আটা	৫০ গ্রাম	৬·০	১৮০	০·০৪ ”
ডাল	২০ গ্রাম	৫·০	৬৮	০·০৪ ”
আলু	৫০ গ্রাম	০·৮	৪৮	০·০৫ ”
শাক ও তরকারি	৭৫ গ্রাম	০·৯	৩১	০·০৭ ”
মাছ	২৫ গ্রাম	৫·০	২২	০·২০ ”
গরুর দুধ	½ লিটার	১৬·০	৩৩৫	০·৭৫ ”
মুরগীর ডিম	১টি	৫·৯	৭৮	০·২৮ ”
চিনি	২৫ গ্রাম		১০০	০·০৬ ”
কলা	১টি	০·৪	৫১	০·০৫ ”
বিস্কুট	১টি	৪·৭	২৩	০·০৫ ”
সরষের তেল	১০ গ্রাম		৯০	০·০৬ ”
		৪৫·৫	১২৮৫	১·৭৫ ”

২—৩ বৎসরের শিশুর **স্বল্প মূল্যের** সুষম খাদ্য

খাদ্য	পরিমাণ	প্রোটিন	ক্যালোরি	মূল্য ১.১২.৭১
চাল	৭৫ গ্রাম	৪·৮	২৫৯	০·১০ পয়সা
আটা	৫০ গ্রাম	৬·০	১৮০	০·০৫ ”
ডাল	২০ গ্রাম	৫·০	৬৮	০·০৪ ”
আলু	৫০ গ্রাম	০·৮	৪৮	০·০৫ ”
সবুজ শাকপাতা	২৫ গ্রাম	০·৫	৬	০·০১ ”
অন্যান্য তরকারি	৫০ গ্রাম	২·০	২২	০·০৬ ”
মাছ (সস্তা)	২৫ গ্রাম	৪·৭	৩৬	০·১২ ”
ছোলার ছাতু	২০ গ্রাম	৪·৪	৭৪	০·০৭ ”
খোসা,ছাড়ানো ভাজা বাদাম	১০ গ্রাম	৩·১	৫৬	০·০৪ ”
গুড়	২৫ গ্রাম		৯৫	০·০৫ ”
গরুর দুধ	¼ লিটার	৮·০	১৬৮	০·৩৭ ”
সরষের তেল	১০ গ্রাম		৯০	০·০৬ ”
কলা	১টি	০·৪	৫১	০·০৫ ”
মাখন তোলা গুঁড়া দুধ	১৫ গ্রাম	৫·৭	৫৪	০·১৮ ”
		৪৫·৪	১২০৭	১·২৫ ”

৪—৬ বৎসরের শিশুর সুষম খাদ্য

খাদ্য	পরিমাণ	প্রোটিন	ক্যালোরি	মূল্য ১.১২.৭১
চাল	১৫০ গ্রাম	৯·৬	৫১৮	০·২০ পয়সা
আটা	৭৫ "	৮·৯	২৬০	০·০৭ "
ডাল	২৫ "	৬·০	৮৬	০·০৫ "
আলু	৫০ "	০·৮	৪৮	০·০৫ "
সবুজ শাকপাতা	৫০ "	১·০	১৩	০·০২ "
অন্যান্য তরকারি	৭৫ "	২·০	২২	০·০৬ "
মাছ অথবা মাংস (মাছের দাম দেখানো হয়েছে)	৩০ "	৫·৭	৪৩	০·২০ "
মুরগীর ডিম	১টি	৫·৯	৭৮	০·২৮ "
দুধ	½ লিটার	১৬·০	৩৩৫	০·৭৫ "
সরষের তেল	৫ গ্রাম		১৩৫	০·০৯ "
চিনি	২৫ গ্রাম		১০০	০·০৬ "
কলা	১টি	০·৪	৫১	০·০৫ "
		৫৬৩	১৬৮৯	১·৮৮

৪—৬ বৎসরের শিশুর স্বল্প মূল্যের সুষম খাদ্য

খাদ্য	পরিমাণ	প্রোটিন	ক্যালোরি	মূল্য
চাল	১৫০ গ্রাম	৯·৬	৫১৮	০ ২০ পয়সা
আটা	১০০ "	১১·৮	৩৪৬	০·১০ "
ডাল	৩০ "	৭·৫	১০২	০·০৬ "
আলু	১০০ "	১·৬	৯৭	০·১০ "
সবুজ শাকপাতা	৫০ "	১·০	১৩	০·০২ "
অন্যান্য তরকারি	৭৫ "	২·০	২২	০·০৬ "
সস্তা মাছ	৩০ "	৫·৭	৪৩	০·১৬ "
ছোলার ছাতু	৩০ "	৬·৬	১১১	০·০৮ "
খোসা ছাড়ানো ভাজা বাদাম	২০ "	৬·২	১১২	০·০৮ "
গুড়	৩০ "		১১২	০·০৬ "
সরষের তেল	১০ "		৯০	০·০৬ "
কলা	১টি "	০·৪	৫১	০·০৫ "
মাখন তোলা গুঁড়া দুধ	১০ "	৩·৮	৩০	০·১২ "
		৫৬·২	১৬৩২	১·১৫ "

NUTRITION CLINIC
Urban Health Centre, Chetla.

F. N.............
L. L.............
S. N.............
N. C.............

Name............................ Address........................

Age............ Sex...........Date of First visit....... ....

Complaints (1)...............
(2)...............
(3)............... Date of onset...............
( )...............

Present History (a) Bowels.............
(b) Appetite...........H/O. Worms.........
(c) Cough.............
(d) Fever.............
(e) Loss of St.........

Past history........ Immunisation........ Cont. with TB.........

Family History Name of Father/Guardian.....................
Occupation............., Income...............
No. of family members.......................

Social History No. of room occupied......Facility of latrine...

Physical Findings Height.............. Weight................

G. I. System Abdominal Wall.........Shape of Abdomen :
Pot Bellied
Scaffold

Lymph Glandnlar System Liver........... Spleen..............
Neck Glands.......................

Mouth

Tongue Colour........... Angular
Coating...........**Lip** Stomatitis................
Glossities........... Chelosis..................

Teeth No. of Teeth...........**Gum** Spongy/Healthy

Tonsils................

Skeletal System : Ant. Frontanalle..............................

Bony. Prominence..............................

Shape Chest..............................

Skin. Hair. Muscles Elasticity.............. Nobule..............

Subcut Fat............ Ulcer..................

Oedema.................Eczema..............

Colour of Hair.........Muscle Tone......

Respiratory System Rate of Respiration..........................

Cynosis ....

Chest Sounds..

C. V. System Pulse Rate ....

Heart Sound

Nervous System Neck Rigidity ....Sup.Reflex............

Deep Reflex ....Aukle Jerks...........

Anaemia...............Night blindness......

Vascularity Bitot's

of Cornea............... Spot ....

Folliculosis..

Any other sign of Nutritional Deficiency..........................

Laboratory Examination Hb

Blood Count

Urine

Stool

Any other examination

Dietetic History :

শিশুর খাদ্য রন্ধন ও পরিবেশন

তাজা ও পাকা ফল, গাজর, লেটুস প্রভৃতি শাক-সবজি বাদে আর অন্য প্রায় সব খাদ্যই রান্না করে খেতে হয়। শিশুর খাদ্য রন্ধন কালে আমাদের কয়েকটি বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। রান্নাঘরটি যেন খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে—সেখানে যেন ইঁদুর, আরশোলা প্রভৃতি জীবের উপদ্রব না হয়, সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অন্য আর একটি উৎপাত মাছির আধিক্য। কোন খাবারে যেন মাছি না বসতে পারে—এজন্য রান্না-ঘরের দরজা ও জানালায় সূক্ষ্ম তারের জাল লাগাতে পারলে ভাল হয়। শুধু পুষ্টিকর খাদ্য হলেই যে শিশুরা খুশী হয়ে খাবে, একথা ভাবা ভুল ; খাদ্যকে সুস্বাদু ও সম্ভব হলে সুদৃশ্য করতে পারলে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে সে খাদ্য গ্রহণ করে। তবে সুস্বাদু করার অর্থ অতিরিক্ত তেল মসলা দেওয়া নয়—পরিমাণ মত নুন, চিনি দিয়ে খাদ্যের স্বাদ যথাযথ বজায় রাখাকেই এখানে সুস্বাদু খাদ্য বলে ধরা হচ্ছে।

শিশুদের খাদ্য রান্না করার সময় অল্প আঁচে, অল্প জল দিয়ে সিদ্ধ করে রান্না করা উচিত। শাক-সবজি রান্নার সময় সর্বদা **ঢেকে** রান্না করতে হয়, নয়তো এর খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে। তরকারি খুব ছোট ছোট করে না কেটে বরং একটু বড় বড় টুকরো করা ভাল, এবং যতটা সম্ভব তরকারি খোসাসুদ্ধ সিদ্ধ করে নেওয়াই উচিত। শাক-সবজি কাটার আগেই ধুয়ে নিতে হবে। পেটের গোলমাল না থাকলে শিশুদের ফ্যানসুদ্ধ ভাত খাওয়ানো স্বাস্থ্যকর। বেশী ভাজা বা মসলাযুক্ত খাবার খেতে থাকলে শিশুদের লিভারের দোষ দেখা দেয় ; তাই তাদের খাদ্যে এ দুটো যতটা সম্ভব পরিহার করে চলা উচিত। অল্প মাখন দিয়ে মাছ, মাংস একটু সাঁতলে দিলে, শিশুর হজম শক্তির কোনও ক্ষতি হয় না, বরং স্বাদে-গন্ধে সে সব তরকারি উৎকৃষ্টতর হয়, তাই শিশু আগ্রহ করে খেতে চায়।

দুধ শিশুর অন্যতম প্রধান খাদ্য ও পানীয়। এই দুধ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দুধ কখনও না ফুটিয়ে খাওয়ানো চলবে না। গরমদেশে দুধ নষ্ট হয়ে যায় বলে বার বার ফুটিয়ে রাখা হয়—এতে দুধ অযথা ঘন হয়ে যায়, এবং শিশুর কোমল যকৃতের পক্ষে পরিপাক করা কষ্টকর হয়।

সম্ভব হলে দু'বেলাই টাট্‌কা দুধ গোয়ালার কাছ থেকে নিতে হবে। আর যাদের ঠাণ্ডা বা জাল দেওয়া আলমারি আছে, তারা দুধ একবার ফুটিয়ে ঐ আলমারিতে তুলে রাখবেন ও প্রয়োজনমত বের করে গরম করে নেবেন। দুগ্ধজাত খাদ্যের মধ্যে শিশুদের পক্ষে ছানা ও ছানার সন্দেশ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ; অল্প আয়াসে এসব ঘরেই তৈরী করা চলে। ক্ষীর, পায়স ইত্যাদি গুরুপাক বলে বেশী খাওয়া উচিত নয়। তবে double cooker-এ পায়স রান্না করলে, বা সুজির পায়স মাঝে মাঝে শিশুদের দেওয়া চলে। Corn Flour দিয়ে দুধ জমিয়ে খেতে দিলে শিশুরা খুশী হয়। বিভিন্ন রং ও গন্ধ-সম্বলিত এই 'কর্ন ফ্লাওয়ারে'র কল্যাণে জলো, বিশ্রীস্বাদযুক্ত দুধ শিশুদের কাছে যেন জাদুমন্ত্রে লাল, হলুদ প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর রং-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাই শিশু খুশী হয়েই এইসব খেতে চায়।

শিশু ছোট বলেই তাকে যদি রোজ **একই খাদ্য দেওয়া** হয়, তবে সেই **একঘেয়েমির** দরুন তার খাদ্যে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। এজন্য তাদের খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বলে প্রতিদিনই যদি শিশুকে কাঁচকলা আর শিঙি মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়, তবে স্বভাবতঃই কয়েকদিন খাবার পর শিশু আর তা খেতে চাইবে না ; বড়দের একটু **সহানুভূতি ও মনোযোগ** থাকলে খাদ্যের মূল নীতি বজায় রেখে—খাদ্যে বৈচিত্র্য **আনা একেবারেই অসম্ভব নয়**।

শিশুর জন্য যে খাদ্যোপকরণ আমরা সংগ্রহ করব, তাতে যেন ভেজাল না থাকে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভেজাল মিশ্রিত মাখন, তেল, ঘি, বাসি তরিতরকারি, পচা মাছ বা বাসি মাংস ইত্যাদি সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। ইলিশ মাছ, অতিরিক্ত পাকা রুই-কাতলা মাছ, বেশী চর্বিযুক্ত মাংস—এসবই শিশুদের অনুপযোগী।

বাড়িতে বয়স্কদের এবং পিতামাতার দোষে শিশুর স্বাভাবিক রুচি বিকৃত না হলে, শিশু অতিরিক্ত ঝাল মসলা দেওয়া বা তেল দেওয়া তরকারি না খেয়ে, তার জন্য নির্দিষ্ট সুষম খাদ্যই খেতে চাইবে এবং স্বাভাবিকভাবে খাবে।

খাদ্য পরিবেশন—

শিশুর খাদ্য শুধু সুস্বাদু ও রুচিকর হলেই চলবে না ; খাদ্য এমনভাবে

পরিবেশন করতে হবে, যাতে শিশুর খাদ্যে আগ্রহের উদয় হয়। অনেক মাকে দেখেছি, সময় ও পরিশ্রম বাঁচাবার অজুহাতে একটা বড় থালায় অনেকটা ডাল আর ভাত একসঙ্গে মেখে সেটাকে ভাগ ভাগ করে ছ'তিনটি শিশুকে একসঙ্গে সেই থালা থেকে খেতে বলেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। শিশুদের জগৎই আলাদা; তাই তাদের জন্য সুদৃশ্য থালা বাটি গ্লাস বা রঙ্গীন ছবি আঁকা প্লেট, পেয়ালা থাকলে, এবং সেই সব খাদ্য ও পানীয় সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করলে সহজেই খাদ্যে রুচি আসে। তাছাড়া খাবার সময় হাসি-খুশীর আবহাওয়া বজায় থাকলে, খাদ্য সহজে পরিপাক হয়।

শিশু যখন খুব বেশী ভয় পায়, অথবা খুব বেশী রেগে থাকে, তখন তাকে খাবার জন্য জোর করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদি কোন কারণে শিশু খেতে না চায়, তবে তাকে জোর করে না খাইয়ে, কেন সে খেতে চাইছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। কোন শারীরিক কারণ বা মানসিক উত্তেজনা এর জন্য দায়ী কিনা, তা খুঁজে বের করে প্রথমে তার প্রতিকার করা প্রয়োজন। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, শিশু ভাল করে না খেলে বড়রা—বিশেষতঃ মা—শিশুর সামনেই তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে ফেলেন; মায়ের এই উদ্বেগ শিশুতেও প্রতিফলিত হয় এবং শিশু একেবারেই খেতে চায় না; কোন কোন পরিবারে খাবার সময় মায়ে ও ছেলেতে মিলে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি গণ্ডগোল ও অশান্তির সৃষ্টি করে, এবং এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে খাওয়ানোর ফলে হয় শিশু বমি করে ফেলে, নয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অপর পক্ষে মাও ধৈর্য হারিয়ে সময় সময় শিশুকে প্রহার করে বসেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ছ'এক বেলা না খেলে, বা কিছু কম খেলে, শিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না।

শিশুকে নিয়মিত সময়ে খাওয়ানোর অভ্যাস করা ভাল; তবে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম মারাত্মক অপরাধ নয়। কোন কোন পরিবারে দেখা যায়, আদুরে শিশুকে বাড়ির বড়রা যে যখন যা খাচ্ছেন, তার ভাগ দিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যবস্থা শিশুর কোমল যকৃতের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং এই অভ্যাস সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও **একটি বিশেষ খাদ্যে শিশুর অরুচি হয়েছে**; কেউ বা কয়েকদিন ছুধ খেতে চায় না—কেউ বা স্থপ খেতে অনিচ্ছা

প্রকাশ করে—কেউ পালং খেতে চায় না—আবার কেউ বা গাজর দেখলে মুখ বিকৃত করে। এসব ক্ষেত্রে শিশুদের **জোর করে** বা **ঘুষ দিয়ে** অর্থাৎ অন্য কোনও লোভনীয় জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে খাওয়ানো একান্তই অনুচিত। অল্প কিছুদিন কোনও বিশেষ খাদ্য না খেলে শিশুদের স্বাস্থ্যের এমন কিছু ক্ষতি হয় না; বুদ্ধিমতী মায়েরা অল্প চিন্তা করে, তার **বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা** করতে পারেন। নার্সারী স্কুলে এসে, অন্য শিশুদের ঐ জাতীয় খাদ্য খেতে দেখলে, সহজেই **শিশুরা তাদের অনুকরণ করে** এবং এইসব **খাবার খেতে আপত্তি করে না।**

খাদ্য পরিবেশন করার সময় শিশুকে একেবারে প্রথমেই অনেকখানি খাবার দেওয়া উচিত নয়। শুরুতে অল্প পরিমাণে খাবার দিয়ে দেখতে হবে শিশু তার সবটা খেয়ে নেয় কিনা; সবটা খেয়ে ফেললে তারপর তাকে দ্বিতীয় বার খাবার পরিবেশন করতে হবে। এভাবে প্রথম থেকে শিক্ষা পেলে খাবার নষ্ট করার প্রবণতা শিশুর মধ্যে জন্মাবে না, এবং প্রথমেই খুব বেশী পরিমাণে খাবার **না দেখে,** খাবারের ওপর **বিতৃষ্ণা না জন্মালে,** শিশু স্বাভাবিক ভাবে খাবে।

পরিশেষে বলা যায়, খাবার সময় প্রীতিপদ ও আনন্দদায়ক আবহাওয়া থাকলে—গল্পগুজব করে, কথাবার্তা বলে খেতে পারলে—শিশু সাগ্রহে খাবার সময়টির জন্য অপেক্ষা করবে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি

প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাধারণ মামুলী বিদ্যালয়ের পর্যায়ে যে অভিহিত করা চলে না—সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তক-সর্বস্ব, 3R's জর্জরিত শিক্ষার স্থান এখানে নেই। কাজেই সাধারণ লোক বা ছোটদের বাবা-মার মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এসব বিদ্যালয়ে তো পড়াশোনার বালাই নেই, তবে এখানে শিক্ষাপদ্ধতিই বা কি করে বজায় থাকে ?

নার্সারী বিদ্যালয় কি ও কেন ?—এই অধ্যায়টিতে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে এই বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধ (formal) পঠন-পাঠন **না হলেও শিক্ষা হয়**। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করা। এই বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন।

শিক্ষার ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা শিক্ষাজগতে যুগান্তকারী মনীষীদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি ; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিক্ষানীতি, শিক্ষা মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এই পথ-প্রদর্শক মনীষীবৃন্দের মতবাদ নিয়েই তো শিক্ষানীতি (Principles of Education), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology), শিক্ষাপ্রণালী (Methods of Teaching) প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে শিক্ষার পথিকৃৎদের অবদান প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের **শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে** কতদূর গ্রহণীয়, আমরা শুধু সেইটুকুই লিপিবদ্ধ করব।

রুশো (১৭১২—১৭৭৮) ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত, কিন্তু তিনি অন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব এনেছিলেন এবং সেটি হল শিক্ষা-জগৎ। তখনকার দিনে শিক্ষকেরা ছোট শিশুদের পুস্তকের ভারে, ব্যাকরণের কণ্টকে, শারীরিক শাস্তির লাঞ্ছনায় জর্জরিত করাকেই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। রুশো শিশুদের এ-শৃঙ্খল মোচন করে, তাদের মধ্যযুগীয় বিদ্যালয়-কারা হতে মুক্তি দিয়ে ভবিষ্যৎ শিশু সমাজকে চিরঋণী করে গিয়েছেন। শিশুর **স্বভাব, রুচি, শক্তি ও আগ্রহই** যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম—বর্তমান কালের শিক্ষাপদ্ধতির এই মূলমন্ত্র সর্বপ্রথম রুশোর লেখা 'এমিল' গ্রন্থে পরিষ্কার

ভাবে দেখা দেয়। শিক্ষা-চিন্তায় রুশো ছিলেন প্রকৃতিবাদী। রুশো মনে করতেন যে, শিশুর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, তাকে তার স্ব-ভাব অনুযায়ী বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণে তাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করবে তার **স্ব-ভাব** এবং বহিঃপ্রকৃতি বা পরিবেশ। উন্মুক্ত উদার আকাশ, তরুলতার নব নব হিল্লোল, বিহগকুলের কলগুঞ্জন, নদনদীর কলতানগীতি—এ সবই তো প্রকৃতির দান। কৃত্রিমতাশূন্য এই অকলুষ পরিবেশে শিশুর মনটি শিক্ষাগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি দরজা খোলা রাখতে পারলে, সেই দরজা দিয়েই প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক সে হতে পারে, তার জন্য বই-পুস্তকের প্রয়োজন হয় না। কাজের মধ্য দিয়ে শেখা—**Learning through doing**—এটিও রুশোর শিক্ষানীতিতে একটি মূল্যবান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত। আর সবচেয়ে বড় কথা—রুশো গতানুগতিক প্রাণহীন নিরানন্দ শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তে দিয়ে গিয়েছেন উৎসাহপূর্ণ, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় শিক্ষার স্বরূপ!

রুশো নিজে শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু লিখে যাননি, বা নিজে হাতে করে কিছু দেখিয়ে দেননি। কিন্তু তিনি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারাই পরবর্তী সকল শিক্ষাব্রতীর চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করে গিয়েছেন। পেস্তালৎসী, হারবার্ট, হারবার্ট স্পেন্সার, ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরী, ডিউই, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষায় পথিকৃৎগণ তাঁদের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির জন্য রুশোর নিকট কোন না কোন অংশে ঋণী—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

পেস্তালৎসী (১৭৪৬—১৮২৭) রুশোর ধ্বংসাত্মক, ভাবাবেগমূলক, নেতিবাচক শিক্ষানীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজে **ইতিবাচক, গঠনাত্মক, মূর্ত-আদর্শ-বাদের** ওপর প্রতিষ্ঠিত, মানবজীবনের সার্বিক বিকাশের সহায়ক এক মনোজ্ঞ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করে, হাতেকলমে কাজ করে, তার সার্থকতাও দেখিয়ে গিয়েছেন। পেস্তালৎসীর মতে—শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি রয়েছে, তার সুষম বিকাশই হচ্ছে শিক্ষা। তাই শিক্ষাজগতে তিনি একটি অতি মূল্যবান কথা বলে গেছেন; সেটি হল—"**ANSCHAUUNG**"। কথাটির অর্থ হল: **প্রত্যক্ষ জ্ঞান—হাত-ফেরতা জ্ঞান নয়।** তাই তিনি স্ট্যাঞ্জ, বার্গডর্ক ও ইভারডুনে যে সকল শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সব স্থানেই শিশুর প্রত্যক্ষ দর্শন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই শিক্ষাদানের

কথা বলে গিয়েছেন। বইপত্র বা শিক্ষার অন্যান্য উপকরণকে পেস্তালৎসী সেই রকম মূল্যবান মনে করেননি। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও** বলা হয়। তিনি আরও বলেছেন, যে কোনও শিক্ষকের নিজের ইচ্ছামত শিশুর সামনে কোন অপেক্ষাকৃত কঠিন জ্ঞানের বিষয় অবতারণা করা সঙ্গত নয়। জ্ঞান-বস্তুর নির্বাচন করতে হবে শিশুর বোঝবার ক্ষমতার কথা স্মরণ রেখে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষণীয় বস্তু সামনে উপস্থিত হলে শিশুচিত্ত গ্রহণেচ্ছায় আনন্দে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখি, তিনি **সহজ থেকে** ক্রমশঃ **জটিলে—মূর্ত থেকে ক্রমশঃ বিমূর্তে** এবং **দর্শন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে** ক্রমে **মৌলিক বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে** বলেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত সিলেবারিস (syllabaries), টেবিল অব ইউনিটস (table of units), টেবিল অব ফ্রাকসনস (table of fractions), এলফাবেট অব ফরম (Alphabet of form) ইত্যাদি তাঁর প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিরই নির্দেশক। শাসন-শৃঙ্খলার কথায় পেস্তালৎসী বলেছেন যে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হবে সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দ্বারা।

হারবার্ট স্পেন্সার (১৮২০—১৯০৩) মূলতঃ পেস্তালৎসীর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে মেনে নিয়ে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির** কথা বলে গিয়েছেন। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল—সে তার চতুষ্পার্শের জীবন্ত পরিবেশ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই কৌতূহলী, তাই তো সে তার চঞ্চল ছোট্ট দুখানি হাত দিয়ে সব জিনিস ভাঙতে চায়—আবার গড়তেও চায়। বইয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, বড়দের বক্তৃতা থেকে যা জানা যায়, সে-জ্ঞান হল হাত-ফেরতা (second hand) জ্ঞান ; তবু আমরা ছোটদের শাস্তির ভয় দেখাই—যা তাদের স্বাভাবিক আগ্রহকে আকর্ষণ করে না, যা তাদের কাছে অর্থহীন ও বিরক্তিকর, তাই তাদের মুখস্থ করতে বাধ্য করি।

হারবার্ট বলেন, শিশুর চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধে যে সদাজাগ্রত কৌতূহল, তাকে ভিত্তি করেই শিক্ষা শুরু করতে হবে। শিশুর পর্যবেক্ষণ ও পঠনের উৎসাহকে বর্ধিত করা—আর যাতে এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হয়, সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টিরাখা পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুর মনের ধর্ম হচ্ছে **বিশেষ হতে সামান্যে** এবং **বস্তুবাচক** হতে নির্বস্তুবাচকে অগ্রসর হওয়া, (i.e. from

concrete to abstract, from the particular to the universal)। কোন বিজ্ঞান শেখানোর সময় প্রথমেই তাই সংজ্ঞা (definition) এবং মূল সূত্রগুলি (first principles) **শেখানো ভুল**। বাস্তব প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হলে, তারপরই সংজ্ঞা বা মূল সূত্রের আবিষ্কার করা যেতে পারে। না বুঝে কেবলমাত্র মুখস্থ করে কোন বিষয় আয়ত্ত করা একান্ত অপচয়মূলক এবং নিষ্ফল প্রচেষ্টামাত্র। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তাই না বুঝে মুখস্থ করার পরিবর্তে যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধের সূত্রে পরস্পর যুক্ত করার প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমপরিণতির সূত্র কাজ করে; জীবন্ত প্রাণীদেহের মত শিক্ষাও একটি প্রাণবন্ত ব্যাপার। তাই হারবার্ট বলেন, 'Progress from the simple to the complex, from undifferentiated homogeneity to differentiated heterogeneity, from unrelated multiplicity to organic unity.' অর্থাৎ জৈবিক পরিণতির সূত্র হচ্ছে—সরল থেকে জটিলে, অবিভক্ততা থেকে বহুলতায়, আপাতঃ বিচ্ছিন্নতা থেকে পরস্পর সংযুক্ত সামগ্রিক ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়া।

হারবার্টের মতে—শিক্ষা পদ্ধতির সফলতার মাপকাঠি হচ্ছে যে তা ছাত্রদের সানন্দ উৎসাহ জাগ্রত করে কিনা! যদি দেখা যায় যে শিশু পড়াশোনায় বা কাজে অমনোযোগী, তবে বুঝতে হবে—শিক্ষণীয় বিষয় বা কাজটি শিশুর পক্ষে অনুপযুক্ত এবং শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ।

শিশু নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় সত্যকে আবিষ্কার করবে, জগৎকে জানবে জীবনকে চিনে নেবে—এই পদ্ধতিটির অন্য নাম Heuristic Method।

ফ্রেডরিক হারবার্ট (১৭৭৬—১৮৪১) ছিলেন শিক্ষাজগতের অন্যতম খ্যাতনামা পথিকৃৎ। কি করে শিক্ষা দিতে হয়, কি তার স্তর, কি তার পদ্ধতি—এই সকল কথাই তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। তাঁর মতে—মানুষের পুরাণো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যখন নূতন অভিজ্ঞতার মিলন হয়, তখন নূতন-পুরানো দুটি অভিজ্ঞতাই সক্রিয় হয়ে জ্ঞান-রাজ্যে নানা পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। এই রূপান্তরিত অভিজ্ঞতাই শিক্ষার কাজকে এগিয়ে দেয়। অভিজ্ঞতার অন্বয়ীকরণের (Apperception) ফলে শিক্ষার পথ সুগম হয়। যা নূতন, তার তাৎপর্য নির্ণীত হয় পুরানো অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। হারবার্টের মতে—শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে পুরানো অভিজ্ঞতার অন্বয়ীকরণ

এবং রূপান্তরিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। কাজেই হারবার্টের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কাজ হল—শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, ধারণা ও বুদ্ধিকে একটি সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতায় কেন্দ্রীভূত করা ; এরই নাম অন্বয়ীকরণ (Apperception)।

হারবার্ট আরও বলেছেন যে নূতন অভিজ্ঞতাকে পুরানো অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বিত করে সুসংঘবদ্ধভাবে 'চিন্তাবলয়' (circle of thought)-এর সৃষ্টি করতে হবে। শিশুর আগ্রহ একদেশদর্শী হলে চলবে না,—তাকে 'বহুমুখী আগ্রহের' অধিকারী হতে হবে। আর তাছাড়া 'চিন্তাবলয়'টি সম্পূর্ণ করে তুলতে হলে মনের আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত করাতে হবে। এটাই হবে শিক্ষার নীতিজ্ঞান। উপযুক্ত শিক্ষায় পরিচালিত হলে, শিক্ষার্থী এক সংযত ও নিয়ন্ত্রিত মানসিকতার অধিকারী হবে—সে সুস্থ ও সবল চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে।

এই হল শিক্ষার প্রকৃতি। এই শিক্ষায় পৌঁছাবার জন্য হারবার্ট যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা **পঞ্চ সোপান পদ্ধতি** নামে বিখ্যাত। শিক্ষায় (১) প্রস্তুতি, (২) উপস্থাপন, (৩) সংযুক্তিকরণ, (৪) সাধারণ সূত্র নির্ণয় এবং (৫) অভিযোজন—এই পাঁচটি বিভিন্ন স্তর আছে। প্রস্তুতি স্তরের শিক্ষায় শিশুর পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে নূতন জ্ঞানের অন্বয়ীকরণ হবে। উপস্থাপন স্তরে নূতন বিষয়টি উপস্থাপিত হবে, এবং এটি যে একটি সাধারণ সূত্রের অঙ্গ তা ছাত্ররা বুঝবে। তৃতীয় অর্থাৎ সংযুক্তিকরণ স্তরে নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অধীত বিষয়কে অন্য নূতন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে তা শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ়ভাবে দাগ কেটে রাখবে। চতুর্থ স্তরে বিছিন্ন চিন্তাধারাকে সংহত করে, একটি বিশুদ্ধ চিন্তায় পরিণত করতে পারলে সাধারণ সূত্রের সৃষ্টি হয়। এখানে সংহতি আনার প্রচেষ্টা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। অভিযোজন স্তরে প্রদীপ্ত যুক্তিবোধ দ্বারা শিক্ষার্থী সমন্বিত জ্ঞানের অধিকারী হবে এবং জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হবে। হারবার্টের এই 'পঞ্চ সোপান পদ্ধতি'কে সংক্ষিপ্ত করে এখন প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও অভিযোজন এই 'ত্রি-সোপান' রূপে ব্যবহার করা হয়। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে গল্প বলার সময় ভাষা শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবহারে এই পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ।

জন ডিউই (১৮৫৯—১৯৫২)-এর শিক্ষানীতির মূলে জীবন ধারার ক্রম বিকাশের প্রভাব আছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষ সর্বদাই তার পরিবেশ

দ্বারা প্রভাবিত; পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে মানুষের মনে নূতন নূতন চিন্তাধারার উদয় হয়, এবং তারই ফলে প্রয়োজন-ভিত্তিক নব নব ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। মানুষের তিনটি মৌল প্রয়োজন হচ্ছে—খাদ্য, বাসস্থান ও পরিধেয়, এই তিনের ওপর ভিত্তি করেই মানুষের জীবন-ব্যাপী ক্রিয়া-কলাপ। ডিউই-এর মতে—এই মৌল প্রয়োজনের সাথে যুক্ত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে শিক্ষাকার্যের মিল থাকতেই হবে। ডিউই-এর 'ল্যাবরেটরি স্কুল'-এ তাই কাঠের কাজ, সেলাই, রান্না ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর প্রচলিত শিক্ষা হচ্ছে **কর্মভিত্তিক শিক্ষা** (activity based)। ডিউই-এর মতে সমস্যা সমাধান বা সত্য আহরণের প্রধান মাধ্যম হল পরীক্ষণ (experiment) এবং চিন্তা ও ধারণার বাস্তবে প্রয়োগ। এইজন্যই তাঁর মতবাদকে **প্রয়োগবাদ** (Pragmatism) বা **পরীক্ষণ-মূলকবাদ** (Experimentalism)-ও বলা হয়। ডিউই বলেন—যখন কোন জ্ঞান বা সত্য জানবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখনই শিশুর মনে **সমস্যা** জাগে; আর এই সমস্যা আসে **সক্রিয়তা** (activity) থেকে। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে শিশু তখন তার সমাধানের জন্য নানা সম্ভাব্য উপায়ের চিন্তা করে। সমস্যা সমাধানের এই স্তরকে তিনি **তথ্যসংগ্রহ বা** Data বলে বর্ণনা করেছেন। পরে তার মধ্য থেকে একটি ধারণা বা তথ্যকে শিশু বেছে নেয়,—এর নাম হল **প্রকল্পন** (Hypothesis)। আর তারপর—সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, তার কার্যকারিতার যে বিচার করে, তার নাম **পরীক্ষণ** (testing)। সুতরাং ডিউই-এর মতে—সত্য বা জ্ঞান আহরণের পাঁচটি সোপান হচ্ছে—(১) **সক্রিয়তা,** (২) **সমস্যা,** (৩) **তথ্য,** (৪) **প্রকল্পন,** ও (৫) **পরীক্ষণ**। অর্থাৎ সত্য আহরণের প্রচেষ্টার শুরু সক্রিয়তায়—শেষও সক্রিয়তায়। শিশুর সমস্ত শিক্ষা, জ্ঞান, ধারণা, তথ্যসংগ্রহ—সবই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। এই পদ্ধতির নাম **কর্মভিত্তিক পদ্ধতি** (active method)। পৃথিবীর সর্বত্রই শিক্ষাবিদের নিকট এটি অতি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

তাঁর Laboratory স্কুলে লিখন, পঠন ইত্যাদি শিশু শিখত জীবনের কার্যকে অবলম্বন করে। নানারূপ সৃজনধর্মী সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই ছিল বিদ্যালয়ের পাঠক্রম। শিশুর সমস্ত শিক্ষাই হতো আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজধর্মী পরিবেশে—শিশুর আগ্রহকে ভিত্তি করে। ডিউই-এর এই কর্মভিত্তিক শিক্ষার অপর নাম হল **সমস্যা পদ্ধতি** (Problem Method)।

ডিউই-এর পদ্ধতির গঠনমূলক জটিলতার জন্য সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা দুরূহ হওয়ায়, তাঁরই পদ্ধতির মৌলিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে, তাঁরই অনুগামী শিষ্য **কিলপ্যাট্রিক** প্রসিদ্ধ **প্রজেক্ট পদ্ধতি** (Project Method)-এর উদ্ভাবন করেন। এই প্রজেক্ট পদ্বতি সম্বন্ধে কিলপ্যাট্রিক বলেছেন—'A project is a whole-hearted purposeful activity executed in a social environment' অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে সমস্ত অন্তর দিয়ে সম্পাদিত উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াই হল—**প্রজেক্ট**। Stevenson অবশ্য বলেছেন—'একটা সমস্যা-সংকুল কাজ তার স্বাভাবিক পরিবেশে করাই হচ্ছে প্রজেক্ট।' ধরা যাক, শিশুরা পুতুল খেলতে ভালবাসে—তাই "পুতুলের জন্মদিন" বা "পুতুলের বিয়ে" এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে তারা লেখা-পড়া, সামাজিক আচার-ব্যবহার, গণনা, হাতের কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অনুবদ্ধ প্রণালীতে সহজেই শিখতে পারে। এতে শিক্ষা সজীব হয়ে ওঠে—প্রাণহীন কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে খাপছাড়া হয়ে ওঠে না। তবে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, তা যেন সেই বয়সের শিশুদের উপযোগী হয়, এবং খুব বেশীদিন ধরে এই প্রকল্পকে না টানা হয়, সেদিকে নজর দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। ছোট শিশুদের জীবনের উপযোগী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা অনেক বেশী অর্থপূর্ণ ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

গান্ধীজী অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে কাজের মধ্য দিয়ে শেখাই প্রকৃত শিক্ষা। এমন কাজকে শিক্ষার ভিত্তি করতে হবে যা সমাজের মৌল প্রয়োজন মেটাবে, এবং ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে যুক্ত করবে। আর শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে এমন একটি শিল্প, যা ভারতের মত গরীব দেশের সকল মানুষের কাজে লাগে। এই যে শিল্পকর্ম—যা হবে শিক্ষার ভিত্তি বা বুনিয়াদ, তা যেন শোষণমূলক না হয়—এই শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে সহজেই যাতে অন্যান্য বিষয় অনুবদ্ধ প্রণালীতে শেখানো যায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। গান্ধীজীর প্রবর্তিত এই পদ্বতির নাম **বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি**। এতে বুদ্ধিমান, সহানুভূতিশীল ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরী হবে। অবশ্য প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুরা যে শিল্পকর্ম করবে, তা বিক্রি করে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না—তবু ঐ কাজের মধ্য দিয়ে শিশু-মনে শিল্পের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে। আর এই শিল্পকে কেন্দ্র করেই তারা অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে।

শিক্ষাগুরু **রবীন্দ্রনাথ** শুধু বয়স্কদের শিক্ষার কথাই ভাবেননি; তিনি ছিলেন শিশুদরদী; তাই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে **আনন্দ ও স্বাধীনতার** প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজে কবি হয়েও **পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে** বিশ্বাস করতেন—ছোটদের শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রাঙ্গণে অবারিতভাবে ছুটোছুটি করতে দিতেন—খোয়াই থেকে নুড়ি পাথর সংগ্রহ করে আনতে বলতেন; এক কথায়, তাদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নিরসনের উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করতেন। খেলা হয়তো তাঁর কাছে শিক্ষার প্রধান উপাদান ছিল না—ছিল **আনন্দ ও সৃজনস্পৃহা**। তাই তো দেখি নাচে, গানে, অভিনয়ে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে শান্তিনিকেতনের শিশুরা যেন এক অসীম আনন্দলোকের সন্ধান পায়। তিনি বলেছেন—'সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায়, এজন্য তাদের চিত্ত-বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি। তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। কোন নিয়মে তারা পিষ্ট না হয়, এই ছিল আমার অভিপ্রায়।'

শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি মাতৃভাষাকেই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক শিক্ষক। তাই তো শান্তিনিকেতনের শিশুরা মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের নীচে, শ্যামল-সবুজ বনবীথিতে ঘেরা 'আম্রকুঞ্জে' বা 'গৌর প্রাঙ্গণে' খেলা, কাজ ও পড়া—সবই করতে পারে।

কল্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook) পুস্তককে নয়—**খেলাকেই** শিক্ষার প্রধান উপকরণ বলে বর্ণনা করে, শিক্ষাজগতে এক নূতন অধ্যায় খুলে দিয়েছেন। তাঁর মতে—শিশুর জীবনের মূল শক্তির উৎস হচ্ছে—শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা এবং আনন্দময় অনিয়ন্ত্রিত খেলা।

এতদিন খেলাকে দেখা হতো কাজের বিপরীত হিসাবে। খেলার দিকে ঝোঁক হলে পড়াশোনা কিছুই হয় না—এই ছিল সাধারণ মত। ক্রমে এই মতবাদের পরিবর্তন শুরু হল। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের খাতিরে নিরেট পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে খেলাধুলার একটু হালকা হাওয়ার প্রয়োজন স্বীকৃত হল। এখন একথা শিক্ষাবিদরা মেনে নিয়েছেন যে **খেলা হচ্ছে শিক্ষারই একটা পদ্ধতি**। ফ্রয়েবেলই প্রথম খেলার শিক্ষাগত মূল্যায়ন করে বলেন যে শিশুর কোন খেলাই ব্যর্থ নয়—সবই কাজের অঙ্গ।

কল্ডওয়েল কুক তাঁর 'পার্স'-এর বিদ্যালয়ে এই 'খেলা খেলা'র মধ্য দিয়েই

শিশুদের শিক্ষাকার্যে অতীব সুফল লাভ করেন। তাঁর প্রচলিত এই পদ্ধতিকে *'Play Way'* পদ্ধতি বলা হয়। কল্ডওয়েলের মতে—**খেলাটাই পদ্ধতি—** অন্য পদ্ধতির **ক্লান্তিহারী উপায় মাত্র নয়।** যেখানে শিশু খেলাচ্ছলে শেখে, সেখানে আনন্দ বজায় থাকে—শিক্ষাটা বোঝা-সর্বস্ব হয়ে ওঠে না। তাঁর মতে—খেলা গুরুতর কাজ থেকে মুক্তি নয়, এ হচ্ছে সত্যিকার শিক্ষার একমাত্র প্রাণবন্ত উপায়। 'Not a relaxation or a diversion from real study, but only an active way of learning.'

এ ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে ডালটন পদ্ধতি, গ্যারী প্ল্যান, মেইসন, প্ল্যান, ইউনেটকা পদ্ধতি প্রভৃতি আরও নানা পদ্ধতি বর্তমান ; কিন্তু প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐসব পদ্ধতি অচল।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষায় দুইজন পথিকৃতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের একজন হলেন ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল এবং অন্যজন মারিয়া মণ্টেসরী। তাই এই দুইজনের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হল।

ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল (Fredrich Froebel ; 1782-1852)

জার্মানীর ব্ল্যানকেনবার্গে ফ্রয়েবেল ১৮৩৭ সালে যে ছোট্ট শিশু বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেছিলেন, দুই বৎসর পরে ১৮৩৯ সালে তার নাম দেন কিণ্ডারগার্টেন (kindergarten) অর্থাৎ **শিশু পুষ্প উদ্যান**। অনেক চিন্তা করেই ফ্রয়েবেল এই কিণ্ডারগার্টেন নামটি বেছে নেন ; কেননা এই নামটির ভেতরেই তাঁর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র বীজ থেকে যখন চারাগাছ হয়, তখন বাগানের মালী জল দিয়ে, আলোর ব্যবস্থা করে, আগাছা বেছে দিয়ে, স্নেহে-সহানুভূতিতে সেই চারাগাছগুলিকে বিকশিত হতে সহায়তা করে—তাইতো তারা ক্রমে পত্রের শ্যামলিমায়, পুষ্পের বর্ণসমারোহে ও গন্ধের মাধুর্যে সকলের মন ভোলায়। শিশুরাও এই চারাগাছের মত ; দরদী ও কুশলী মানুষ-মালীর তত্ত্বাবধানে, স্নেহে ও যত্নে তারা এক-একটি ফুলের মত গুণে, বর্ণে, শোভায় বিকশিত হয়ে উঠবে। তিন থেকে সাত বৎসরের শিশুদের জন্য যে কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন, সেখানে স্বাধীনতার আবহাওয়ায়, গৃহের মত নিবিড় প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে, আনন্দের সঙ্গে শিশুর বিকাশ সম্ভব হয় ; এই সব বিদ্যালয় পরিচালনার ভার ছিল স্নেহময়ী ও মাতৃকল্পা শিক্ষিকাদের হাতে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব

(ক) **আধ্যাত্মিক একতা ঃ** ফ্রয়েবেল যে দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তা অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত একতা বা Divine Unity-কে উপলব্ধি করে। এই যে আধ্যাত্মিক একতা, একে উপলব্ধি করা, আর মানুষের অন্তরস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করা—একই কথা। এই যে প্রকৃত আত্মোপলব্ধি—এটাই হল শিক্ষা। শিশুর আভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশের যে তাড়না আছে, তা যে পরিমাণে বাহিক অভিব্যক্তির সঙ্গে যোগসাধন করতে পারে, সেই অনুপাতেই তার শিক্ষার ক্রমবিকাশ ঘটে—আর এই উপায়েই সে সর্বময় একতাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। ফ্রয়েবেল একেই বলেছেন—'Making inner outer and outer inner'—অর্থাৎ অন্তরকে বাহির করা এবং বাহিরকে অন্তর করা।' খেলা হল এমন একটি মাধ্যম, যার ভেতর দিয়ে শিশুর আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা বাইরে রূপান্তরিত হয়। কাজেই শিশুর শিক্ষায় খেলাই হবে প্রধান। শিশুর আত্মোপলব্ধি একদিনেই ঘটে ওঠে না; ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির এই অগ্রগতি দেখা দেখা দেয়। ফ্রয়েবেলের মতে—এই প্রক্রিয়ার নাম **উন্মেষণ তত্ত্ব** (Theory of unfoldment)। একটি বীজের মধ্যে যেমন বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তেমনি একটি ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা লুকায়িত থাকে, শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বা উন্মেষই শিক্ষা।

(খ) **আত্ম-সক্রিয়তা ঃ** শিশুর এই স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়—বয়স্কদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে নয়, বরং শিশুর অন্তরগত বা সহজাত **স্বয়ংক্রিয়তায়**। শিশুকে সক্রিয় করার জন্য কোনও বাহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই,—কারণ শিশু নিজেই স্বাভাবিকভাবে **সক্রিয়**। ফ্রয়েবেল শিশুর আত্মসক্রিয়তার অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন **খেলাকে**। এইদিক দিয়ে বিচার করলে **খেলা** শিশুর ব্যক্তি-সত্তা বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, এবং খেলার শিক্ষামূলক গুরুত্বও অসীম। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'It (play) gives joy, freedom, contentment, inner and outer rest, peace with the world. It holds the source of all that is good.' তাছাড়া ফ্রয়েবেলের এই আত্মসক্রিয়তা তত্ত্বের সঙ্গে **সৃজনাত্মক কাজও** অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ; কেননা এই গঠনাত্মক কাজের মাধ্যমে

শিশুর মনে যে ধ্যান-প্রতিমা ও ধারণা অস্পষ্ট ভাবে লুক্কায়িত থাকে, তার সার্থক রূপায়ণ ঘটে বাস্তবজগতে।

(গ) **সমাজ-ধর্মী সহযোগিতা ঃ** যদিও পেস্তালৎসী বিদ্যালয়ে বাড়ির আবহাওয়া এনে তার সামাজিক দিকটার প্রতি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম বিদ্যালয়কে সমাজধর্মী করেন। আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শিশুদের মধ্যেও একতা আনার পরিকল্পনা করেন—তাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শিশু ব্যক্তিগতভাবে একা সন্দেহ নেই, কিন্তু সে বৃহৎ সমাজেরই অংশ বিশেষ। তাই তাঁর স্থাপিত কিলহাউ স্কুলে দেখা গিয়েছে যে, সেখানে শিশুরা যৌথকর্ম ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ ও প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে Hughes বলেছিলেন—'His kindergarten or school was a little world, where responsibility was shared by all, individual rights respected by all, brotherly sympathy developed by all and voluntary co-operation practised by all.' কিণ্ডারগার্টেনের এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতাই বড় কথা।

কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু-উদ্যান

ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষানীতিকে রূপদান করেন এক নূতন ধরনের বিদ্যালয়ে—এরই নাম **কিণ্ডারগার্টেন**। এখানে পুস্তকভার-জর্জরিত শিক্ষার ভারে শিশুরা নিষ্পেষিত হয় না—বরং এখানে স্বাধীনতা, খেলা ও অবাধ আনন্দের প্রাচুর্য। এই কিণ্ডারগার্টেনে সৃজনাত্মক কাজ, বিকাশ বা উন্মেষণ, সক্রিয়তা ও খেলা, সামাজিকতা—এ সবেরই বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে। এখানে শিশুরা গল্প শোনে, তারপর সেই গল্পটি তারা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করে,—গল্পটি অভিনয় করে,—নাচে, গানে ও অঙ্গভঙ্গীতে তাকে জীবন্ত করতে চেষ্টা করে; আর হাতের কাজের মাধ্যমে অভিনয়ের প্রয়োজনীয় অঙ্গসজ্জা বা অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করে।

ফ্রয়েবেল কিণ্ডারগার্টেনের উপযোগী সাতটি মায়ের গান (Mo:her song) এবং পঞ্চাশটি খেলার গান (play song) রচনা করেন। এই গানগুলির সঙ্গে অস্পষ্ট হলেও, ছবি দেওয়া হয়েছে; আর গাইবার সময় অঙ্গভঙ্গী করে অর্থাৎ

নেচে নেচে গাইতে হয়। এই গান ও খেলাগুলি শিশুর বিকাশের ক্রম-পরিণতির স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সব কাজে শিশুরা প্রচুর আনন্দ পেত।

ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেনের জন্য শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী কয়েকটি **উপহার** (gifts) এবং **হাতের কাজ** (occupation)-এর কথা বলেছেন। প্রথম উপহার হচ্ছে একটি বাক্সে বিভিন্ন রং-এর **ছয়টি** উলের বল। বল হচ্ছে ঐক্য ও সুসামঞ্জস্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই এই উপহারটি ঈশ্বরের প্রতীক। বল হল—'b-all', তাছাড়া এই বল খেলার মাধ্যমে শিশুর মনে আকার, বর্ণ, গতি, দিক, উপাদান, পেশীসঞ্চালন-বোধ ইত্যাদি জেগে ওঠে।

দ্বিতীয় উপহার হচ্ছে বল, কিউব (cube) ও সিলিণ্ডার (cylinder)। এই তিনটিই শক্ত কাঠের তৈরী। এখানে শিশু বলের সঙ্গে তুলনা করে নূতন দুটি জিনিসের পার্থক্য ও মিল বুঝতে পারে। বল গড়ায়, কিউব স্থিতিশীল; বলের একটি মাত্র তল, কিউবের ছয়টি তল; কিন্তু বল ও কিউবের সমন্বয়ে সিলিণ্ডার। দর্শনের Thesis, Antethesis and Synthesis-এর প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট।

তৃতীয় উপহার হল, একটি বড় কাঠের কিউবকে **আটটি** সমান ছোট কিউবে খণ্ডিত করা। এর দ্বারা অংশ ও সমগ্রের এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝতে পারা যায়। এসব কিউবের টুকরো দিয়ে সিঁড়ি, বাড়ি ও নানা খেলনাও তৈরী করা যায়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপহার হল—ঘনক বা কিউবকে নানাভাবে ভাগ করে ঘন বস্তুর বিভিন্ন রূপ, উপবিভাগ ও পরস্পরের সম্বন্ধে শিশুর মনে জ্ঞানের সৃষ্টিতে সহায়তা করা। ফ্রয়েবেল পরে আরও তিনটি নূতন উপহার আবিষ্কার করেন; এই উপহার তিনটি শিশুর মনে তল, রেখা ও বিন্দুর ধারণা জন্মাতে সহায়তা করে। এই উপহার দ্বারা শিশুর মনে যে ধারণার উদ্রেক হয় তার বাস্তব রূপায়ণ হয় হাতের কাজ বা Occupation-এর সাহায্যে। কাগজ, বালি, মাটি, কাদা, কাঠ, কাগজের মণ্ড ইত্যাদি নানা উপাদানকে বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত করে শিশু নানা বিচিত্র জিনিস সৃষ্টি করতে পারে। কার্ড ফুটো করা, কাগজ ভাঁজ করা, কাঠ খোদাই করা, মাটির কাজ, মাদুর বোনা, ছবি আঁকা, সেলাই করা—এসব নানা ধরনের কাজে শিশুর সক্রিয়তা ও সৃজন-স্পৃহা তৃপ্তিলাভ করে।

পেস্তালৎসীর মত ফ্রয়েবেলও প্রকৃতিবীক্ষণকে শিক্ষার অঙ্গরূপে গণ্য করেছেন; তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক। পেস্তালৎসী এটা চেয়েছিলেন শিশুর

অভিজ্ঞতা বাড়বে বলে—তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিমার্জনা হবে বলে। ফ্রয়েবেল চেয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, এতে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি ছাড়াও শিশুর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হবে এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে শিশু আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে।

কিণ্ডারগার্টেনে গল্প বলা অত্যাবশ্যক বলে পরিগণিত হয়। শুধুমাত্র বুদ্ধির চর্চায় শিশু-মনের চাহিদা মেটে না—তার কল্পনা ও অনুভূতির বিকাশের জন্য উপকথা, রূপকথা প্রভৃতির মূল্য অশেষ। গল্প শিশুদের মন, তাদের ভাষা, গান, খেলা—সব কিছুকেই প্রভাবিত করে। মণ্টেসরী শিশুমনের এই বিশেষ ধারাটিকে একেবারেই অবহেলা করেছেন। ফ্রয়েবেল যদিও শিশুর স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়েছেন, তথাপি তাঁর শিক্ষানীতিতে শিক্ষিকার স্থান রয়েছে,—তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নন। শিশুদের সঙ্গে থেকে, প্রয়োজনমত তিনি তাদের কাজ ও খেলার ব্যাপারে নির্দেশ দেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। খেলা, রঙ্গীন ছবি ও বিভিন্ন বাস্তব উপকরণের সাহায্যে শিশুরা খুশী হয়ে, আনন্দের সঙ্গে লিখতে, পড়তে ও গুণতে শিখে ফেলে।

শিক্ষাজগতে ফ্রয়েবেলের প্রচুর অবদান থাকলেও, তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। তিনি খেলা ও হাতের কাজের ওপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন; এতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যাহত হয়েছে। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র বংশগতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন—পারিপার্শিক কোন মূল্য দেননি। তাছাড়া তাঁর রহস্যময় আধ্যাত্মিকতা ও প্রতীকের ব্যবহার তাঁর শিক্ষানীতিকে দুর্বল ও জটিল করে তুলেছিল বলে, তা অনেক সময় জনপ্রিয় হতে পারেনি। তাঁর মতে **এক** সংখ্যাটি হল ঈশ্বর বা ঐক্যের প্রতীক—**দুই** হচ্ছে জগৎ ও মনের প্রতীক। বলা বাহুল্য, এ সব রহস্যময় আধ্যাত্মিকতা শিশুরা বুঝতে পারে না। মণ্টেসরী ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির অনেক পরিবর্তন করে কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবু বলব যে, এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষায় আনন্দ ও স্বাধীনতাকে মুখ্য স্থান দিয়ে, শিশুর সক্রিয়তা ও সৃজনাকাঙ্ক্ষাকে পদ্ধতি-রূপে ব্যবহার করে ফ্রয়েবেল শিক্ষাজগতের অন্যতম প্রধান পথিকৃত হিসাবে চিরকালই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মারিয়া মণ্টেসরী (Maria Montessori : 1870-1952)

মণ্টেসরী পেশায় ছিলেন ডাক্তার। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. হবার

পর তিনি বিখ্যাত ইটালীয় চিকিৎসক ডঃ সেঁগুই (Seguin) ও ইটরাড (Itrad)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের অনুসৃত ক্ষীণবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী হন এবং নিজে উক্ত শিশুদের পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ক্ষীণমেধা শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষপদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ত্রুটিসম্পন্ন শিশুদের উন্নতি যদি সম্ভব হয়, তবে এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ত্রুটিহীন, স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে। তাঁর আবিষ্কৃত বিশেষ পদ্ধতির নাম **মণ্টেসরী পদ্ধতি**। তাঁর বিখ্যাত বই—The Montessori Method-এ তাঁর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি তিন থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের শিক্ষার জন্য তাঁর বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বলেছেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। ছোটরা 'পিনে বদ্ধ প্রজাপতির ন্যায় সারি সারি' শ্রেণীতে অনড় হয়ে বসে থাকে—এটা তাঁর মতে শিশুদের স্ব-ভাবের একান্তই বিরোধী। ১৯০৭ সালে রোমে দরিদ্র শ্রমিকদের এক দুঃস্থ পল্লীতে তিনি তাঁর **বালমন্দির** (Casa de Bambini) স্থাপন করেন এবং শিশুদের লালন-পালন, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা—সব কিছুরই দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এই "বালমন্দির" ছোটদের আটকে রাখার কারাগার স্বরূপ ছিল না—এ ছিল শিশুদের **আনন্দ নিকেতন**। এ যেন **শিশুদেরই রাজত্ব**—তাদেরই জন্য নির্মিত প্রশস্ত ঘর, তাদেরই মাপের ছোট ছোট চেয়ার-টেবিল (যা তারা নিজেরাই প্রয়োজনবোধে অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে), ছবি আঁকার জন্য নীচু ও লম্বা বড় বড় বোর্ড, আত্মভোলা হয়ে কাজ করবার জন্য মনোহর ও উজ্জ্বল রং-এর কতই না খেলনা ও উপকরণ! সত্য সত্যই, এ যেন শিশুদের এক স্বপ্নরাজ্য—যেখানে স্বাধীনতা, খেলা ও আনন্দ অপর্যাপ্ত! এখানে শিশুরা স্নান করত, আহার করত, প্রয়োজনমত 'বাথরুম' ব্যবহার করত, ঘুমাত। তাদের গল্প করার বা আড্ডা দেবার জন্য **ক্লাব ঘর** ছিল—আর ছিল প্রচুর খোলামেলা খেলার জায়গা ও বাগান। এই রকম পরিবেশে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সঙ্গে যে বিকশিত হয়ে উঠবে,—তা বলাই বাহুল্য।

মণ্টেসরী শিশু-মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যেক শিশুই যে অন্য শিশু থেকে

শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে পৃথক—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন; এমন কি ক্রম-বিকাশের স্তর অনুযায়ী একই শিশু বিভিন্ন বয়সে পৃথক আচরণ করে, তা তিনি জানতেন। তাই তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ** একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

শিক্ষার অর্থ হচ্ছে নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। কাজেই শিক্ষিকার কর্তব্য হবে শিশুর পরিবেশটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা, যাতে শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা কার্যে অগ্রসর হতে পারে—যাতে তার বিকাশে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয়। মণ্টেসরী এই নীতিবাদ থেকেই তাঁর "অবাধ স্বাধীনতা"র মতবাদ জন্মলাভ করেছে। অবশ্য অবাধ স্বাধীনতা যে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়—এ বিষয়ে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

স্বাধীনভাবে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে চলবে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিমার্জন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য পৃথক পৃথক পরিমার্জনা ও শিক্ষার পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু শিক্ষা-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন—এদের ইংরাজী নাম Didactic Apparatus। এই উপকরণগুলি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে, এর ভেতর দিয়েই শিশুরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, অর্থাৎ, স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, আকার, আয়তন ইত্যাদির ধারণা নির্ভুলভাবে পাবে। এই উপাদানগুলির অধিকাংশ এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে শিশুরা ভুল করলে নিজেরাই তা ধরতে পারে—এ ব্যবস্থাকে স্বয়ংশিক্ষা বা auto-education বলা হয়।

শিশুর স্বাধীনতাকে সম্মান দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় মণ্টেসরী আরও একটি অতি মূল্যবান নীতি সংযোজন করেছেন; তাঁর মতে—শিক্ষা তো গিলিয়ে দেওয়া নয়—শিশুকে বিকশিত হতে সহায়তা করা; কিন্তু এই সাহায্যও যখন-তখন করা চলবে না। শিশু যখন সত্যিকার প্রয়োজন বোধ করবে—যখন তার 'মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত' উপস্থিত হবে, কেবলমাত্র সেইসময় শিক্ষিকা সেই বিশেষ মুহূর্তটির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে শিশুকে সহায়তা করবেন। কাজেই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, মণ্টেসরী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট ও পূর্বকল্পিত সময়সূচী রাখা চলে না।

মনে রাখতে হবে—মণ্টেসরী তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন ক্ষীণমেধা ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের দিয়ে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এইসব শিশুরা তাদের **প্রাত্যহিক কাজের** জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাই তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুরা নিজেদের কাজ যেন নিজেরাই করতে পারে, তার উপযুক্ত

ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর "শিশু-নিকেতনের" শিশুরা নিজেরাই হাতমুখ ধোবে, চুল আঁচড়াবে, জামা পরবে, জুতোর ফিতে বা বোতাম লাগাবে, থালা-গ্লাস জায়গা মত রাখবে, আসন পাতবে—ঘর ঝাঁট দেবে—এমনি ধরনের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজ নিজেরা স্বাধীনভাবে নিঃশব্দে আনন্দের সঙ্গে করবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বন ছাড়াও, পেশী ও অঙ্গসঞ্চালনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সমন্বয় খুব অনায়াসেই হবে।

পূর্বেই আমরা মণ্টেসরীর শিশুর "স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" সম্বন্ধে মতবাদের উল্লেখ করেছি। "বালমন্দির" শিশুর স্বাধীন রাজ্য—সেখানে সে অবাধে খেলাধূলা করবে, ইচ্ছা হলে গান করবে বা নাচবে, ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করবে। এখানে ক্লাস, ঘণ্টা—এসবের বালাই নেই ; পড়া বা লেখার জন্য জোর-জবরদস্তি নেই। শিশু-নিকেতনের পরিচালিকা যেন তাঁর কোন বিশেষ মতবাদ দ্বারা শিশুদের প্রভাবিত না করেন—সে সম্বন্ধে মণ্টেসরী বিশেষ সাবধানতার বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন। কোনও শিশুর গায়ে হাত দিয়ে আদর করারও তিনি বিরোধী।

মৌনাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া এই শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এ শুধু বাক্যের বিরতি নয়—এর ব্যাপক অর্থ হল সমগ্র ইন্দ্রিয় ও পেশীর শ্লথভাবে থাকা ও ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম। এ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হলে শিশুরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে শেখে, এবং ভদ্র ও সংযত আচরণ করতে পারে।

মণ্টেসরী অবাধ কল্পনা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন—তাই উপকথা, রূপকথা বা পরীর গল্প ইত্যাদি শিশুদের বলার বিপক্ষে ছিলেন।

মণ্টেসরীর শিক্ষা-উপাদানগুলি সংখ্যায় প্রচুর—তাদের সব বিবরণ এখানে দেওয়া যাবে না। আস্বাদন ও ঘ্রাণ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিকাশের জন্য প্রায় ছাব্বিশটি শিক্ষাপ্রদ উপকরণ আছে। ধাপে ধাপে ইন্দ্রিয়গুলির শিক্ষা, অনুশীলন, পরিমার্জন ও পুনরনুশীলন করা হয়। বিভিন্ন শব্দ-উৎপাদক যন্ত্র, বিভিন্ন রং-এর উলের কার্ড, আকারে একই রকম কিন্তু পৃথক ওজনের ও আয়তনের কাঠের টুকরো, সূক্ষ্ম সাধারণ নরম কর্কশ এইরূপ নানা ধরনের কাপড়ের টুকরো—এই সবই হল তাঁর শিক্ষা উপাদান। তাছাড়া বোতাম লাগানোর ফ্রেম, ফিতে বাঁধার ফ্রেম—এসবের মধ্য দিয়ে শিশুরা জীবনের প্রয়োজনীয় কাজও শিখতে পারে।

একটা প্রশ্ন এরপর মনে হওয়া স্বাভাবিক—মণ্টেসরী পদ্ধতিতে অবাধ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু শৃঙ্খলা আছে কি ? মণ্টেসরী নিজে কাজ করে দেখিয়ে গিয়েছেন যে,

গতানুগতিক শাসনধর্মী ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় কখনই সত্যিকারের শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। প্রকৃত শৃঙ্খলা আসে স্বাধীন কাজের মধ্য দিয়ে—স্বাধীনতার মধ্যেই শৃঙ্খলা পুষ্টিলাভ করে। মণ্টেসরী বিদ্যালয়ে শাস্তি বা পুরস্কারেরও কোনও স্থান নেই। কেননা, তাঁর মতে শাস্তি শিশুর নৈতিক অবনতি ঘটায় এবং পুরস্কার শিশুর মনে লোভের ও অহংকারের সৃষ্টি করে।

মূলতঃ ফ্রয়েবেলের স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও মণ্টেসরী পদ্ধতি ফ্রয়েবেলের পদ্ধতির চেয়েও অধিক জনপ্রিয় হয়েছে। এর প্রধান কারণ ফ্রয়েবেলের খেলাগুলির অন্তরালে যে ইঙ্গিত ও রূপক বিদ্যমান ছিল, তা অনেকের পক্ষেই বোঝা দুরূহ ছিল। কিন্তু মণ্টেসরীর শিক্ষা-উপকরণগুলিতে ঐরূপ কোনও প্রতীক না থাকায়, তা সহজগ্রাহ্য হয়েছে। তা ছাড়া মণ্টেসরী নিজে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভূভাগ পর্যটন করে, তাঁর পদ্ধতির কার্যকারিতা হাতে-কলমে দেখিয়ে গিয়েছেন। তবুও সমালোচনা করে বলতে পারা যায় যে, তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় কল্পনার কোনও স্থান নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা জীবন-নির্ভর নয়—বড় বেশী পরিমাণে কৃত্রিম উপকরণ-নির্ভর। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে সাহিত্য চর্চার স্থান কম—শিক্ষার সামাজিক মূল্য সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন নন। তিনি স্বল্পবুদ্ধি ও স্বাভাবিকবুদ্ধি শিশুদের পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখেননি। যে শিশুরা জটিল সমাজব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছে, তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল মণ্টেসরীর শিক্ষা-উপাদানগুলি মেটাতে পারে না। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা—এই পদ্ধতির রূপায়ণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে এ-ধরনের বিদ্যালয়ের ব্যাপক প্রসারের কল্পনা একরকম অসম্ভবই!

তবু আনন্দময় পরিবেশে, একা একা নিবিড় যত্ন সহকারে কোন কাজ বা খেলায় মগ্ন শিশুদের দেখে কে না মুগ্ধ হয়? তাড়না নেই, শাসন নেই, তবুও শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে, আলস্যে সময় কাটানো নেই—শোভন, রুচিকর পরিবেশে ছোট ছোট শিশুরা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুটি নিয়ে, নিজে নিজেই নিজের শিক্ষায় ব্যস্ত—নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে উদ্‌গ্রীব! এটাই তো ছোটদের শিক্ষা-ব্যবস্থার বড় ও প্রধান কথা।

মণ্টেসরী পদ্ধতিতে অতি অল্প বয়সে লেখা, পড়া ও গণনা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। মণ্টেসরীর মতে—এই তিনটি বিষয়েরই **প্রস্তুতি স্তর** আছে। এই প্রস্তুতি স্তরে শিশুর অভিজ্ঞতাই ভাল ভাবে হলে, তবেই লেখা, পড়া বা অঙ্কের

আসল কাজটি সুসম্পন্ন হবে। তিনি পড়া শেখাবার আগে লেখা শেখাবার পক্ষপাতী ; কেননা লেখা অপেক্ষা পড়তে গেলে শিশুকে অনেকগুলি জটিল স্তর আয়ত্ত করতে হয়। লেখার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি ছবি আঁকা, জ্যামিতিক আকৃতিতে রং করার কথা বলেছেন ; পড়ার প্রস্তুতি হিসাবে flash card-এর ব্যবহার ও কার্ডবোর্ডে শিরিষ কাগজ আঁটা কাটা অক্ষর ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অঙ্কের জন্য অনুরূপভাবে শিরিষ কাগজ যুক্ত সংখ্যা কেটে, তাতে হাত বুলাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত "Long Stairs"—এমন একটি খেলনা, যাতে বিভিন্ন রং-এর এককের সাহায্যে শিশুরা সহজেই যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের নিয়মাবলী বুঝতে পারে।

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ এত অল্প বয়সে লেখা, পড়া ও গণনা শিক্ষা দেবার একান্তই বিরোধী।

শিশুর খেলা

খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণক্রিয়া ; তাই খেলাই হচ্ছে শিশুর প্রকৃতি। তার শারীরিক ও মানসিক জীবন বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শিক্ষায় খেলার স্থান কি, তা আলোচনা করার পূর্বে, খেলা সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ ও অভিমতগুলির বৈশিষ্ট্য কি, তা দেখা প্রয়োজন। **শিলার** (Schiller) ও **হার্বার্ট স্পেন্সার** (Herbert Spencer)-এর মতে—খেলা হচ্ছে শিশুর দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়তি শক্তির (surplus energy) প্রকাশ। বাড়তি শক্তি প্রকাশের এই নির্দোষ পথটি খোলা থাকে বলেই শিশু সুস্থ ও শান্ত থাকে। **কার্ল গ্রুস** (Karl Groos) বলেছেন যে, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুতর কর্তব্যের জন্য তৈরী হয়। বিড়ালছানা বল দিয়ে খেলা করে—পরে ভবিষ্যতে ইঁদুর ধরতে পারবে বলে ; ছোট মেয়ে মা সেজে পুতুলকে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়—সে ভবিষ্যতে মা হবে বলে তার প্রস্তুতি হিসাবে ; ছোট ছেলে যে ড্রাইভার সাজছে তাও তার ভবিষ্যৎ কাজের নিপুণতা অর্জনের জন্যই। **স্ট্যানলী হল** (Stanly Hall) আবার কার্ল গ্রুসের মতবাদকে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত বলে কঠোর সমালোচনা করে, একটি বিপরীত মত প্রকাশ করে বলেছেন—খেলার প্রেরণার উৎস অতীতে নিহিত আছে (recapitulatory theory)। মানবসমাজ অনেক স্তর উত্তরণ করে সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। সমাজের আদিযুগের আদিম মানবের কতকগুলি হিংস্র ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি শৈশবে খেলার মধ্য দিয়েই আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত করে, অর্থাৎ খেলার মধ্যে পূর্বপুরুষদের আচরণের পুনরাবৃত্তিই দেখা দেয়।

রস (Ross) খেলা সম্বন্ধে অন্য একটি মতবাদ পোষণ করেন। একে বিশোধক নীতি (cathartic theory) বলা হয়। মানুষের মনের অবদমিত ইচ্ছা বা অনুভূতি, যা সাধারণতঃ সভ্য ও সামাজিক জীবনযাত্রায় পূরণ করা যায় না—খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এসব অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি হতে পারে। তার ফলে শিশুর মনের ওপর চাপ কমে যায় ও শিশু মানসিক ভাবে সুস্থ বোধ করে। আবার "মনে কর মনে কর" খেলায় (make-believe phantasy) শিশুর দিবা-স্বপ্নের

তৃপ্তি ঘটে। শিশুর জীবনে যে ভাবগত দ্বন্দ্ব ও অযথা দমন চলে, তা সে গল্প, খেলা বা নাটকের নায়ক-নায়িকার জীবন, কাজ বা অনুভূতির মাধ্যমে চরিতার্থ করার সুযোগ পায় ;—তাদের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, তাদের সুখে-দুঃখে হেসে-কেঁদে সে নিজের মনের তৃপ্তিসাধন করে। ফ্রয়েড (Freud)-ও এই মতবাদে বিশ্বাসী ; তাঁর মতে—শিশুর আদিম কাম (libido) প্রবৃত্তি খেলাধুলার মধ্য দিয়েই চরিতার্থ হয়। খেলা হচ্ছে শিশুর অন্তরের অবরুদ্ধ ইচ্ছা বা আবেগের মুক্তির উপায়। আবার এই খেলার মধ্য দিয়েই আদিম কামাকাঙ্ক্ষার উদ্গতি (sublimation) ঘটে।

ম্যাকডুগ্যাল (Mcdougal) মনে করেন, যে প্রত্যেক জীবনের কর্মপ্রবণতার মধ্যে আমরা কয়েকটি মৌলিক প্রক্ষোভ বা অনুভূতির পরিচয় পাই ; এক-একটি অনুভূতি আবার এক-একটি বিশিষ্ট ও পৃথক সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। যেমন যুদ্ধ করার প্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রোধ অথবা পালিয়ে যাবার মূলে রয়েছে বিপদের ভয়। এই নীতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নীতি (rivalry theory) বলা হয় ; কিন্তু শিশুদের খেলার মধ্যে আমরা এরূপ তাৎপর্যগত বা সুনির্দিষ্ট ব্যবহার শৃঙ্খলার প্রমাণ পাই না।

ছোট শিশু চিরচঞ্চল ; সে এক জায়গায় বেশীক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কাজেই **সক্রিয়তা** হচ্ছে শিশুর জীবন-ধর্ম—তার জীবনের প্রেরণা। খেলা হল শিশুর সক্রিয়তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। ডিউই (Dewey) তাঁর কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতিতে (activity principle) খেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কল্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook)-ও শিশুশিক্ষার জন্য Playway method বা খেলা দ্বারাই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে গিয়েছেন। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরাই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, তাদের সকলেই খেলার অসীম মূল্যের স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। ফ্রয়েবেল (Froebel) শিশুর আনন্দ ও আগ্রহকে তাঁর শিক্ষানীতির ভিত্তি করেছেন, তাই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে খেলার স্থান খুব উঁচুতে। ফ্রয়েবেলের "কিণ্ডারগার্টেন" পদ্ধতিতে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাই হবে খেলার মাধ্যমে। তাই তাঁর 'কিণ্ডারগার্টেনে' শিশুরা Gifts Cccupation নিয়ে খেলছে, নাচ, গান, অভিনয় করে আনন্দ পাচ্ছে—আর এই ভাবে খেলার মধ্য দিয়েই তাদের বিকাশ হচ্ছে, তারা নানা বিষয়ও শিখছে। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় ; পরে শিশুর বোধের

সীমায় এসে, তা তার ভেতরের বস্তুকে পরিণত হয়। ফ্রয়েবেলই প্রথম খেলার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে, তাকে শিক্ষার কাজে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন।

মণ্টেসরী শিশুর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অতিশয় মূল্যবান মনে করেন। তাই মণ্টেসরী বিদ্যালয়ে শিশুরা নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজে ও খেলায় মেতে ওঠে ; তিনি যে "Didactic apparatus" বা শিক্ষামূলক সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিলেন, সেইগুলি দিয়ে **খেলা করে** শিশুরা অতি সহজেই লিখতে, পড়তে ও গুণতে শিখে ফেলে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে খেলার মূল্যায়ন

খেলা সম্বন্ধে মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে শিশুর ক্রমবিকাশে খেলা অত্যাবশ্যক। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বয়স্কদের উচ্চারিত সকল কথার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার নয়। জীবন-পথে শিশু যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, তাকে তার নিজের পরিবেশের সঙ্গে, সেই নবজাত অভিজ্ঞতায় পরিস্থিতির একটা সামঞ্জস্য বিধান বার বারই করে নিতে হয়। বিচিত্র পরিবেশের নানা পরিস্থিতিতে সে নব নব তথ্যের সন্ধান পায়—হয়তো তার প্রকাশের ভাষা তার অজানা থাকতেও পারে, তাই শিশু খেলার মধ্য দিয়েই ঐসব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে। সেই বিশেষ পরিবেশে তার নিজস্ব সত্তা কি, সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে শেখে। এইভাবেই বাস্তবের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র রক্ষার জন্য সে সচেষ্ট হয়। সতত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুকে তার পূর্বশিক্ষার ধ্যান-ধারণা অনবরতই পরিবর্তন করতে হয়। খেলার সাহায্যে শিশু ঐসব পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্যের সূত্রটি খুঁজে বের করতে পারে। এইখানেই শিশুর জীবনে খেলার গুরুত্ব।

এইজন্যই বলা হয়েছে, ছোট শিশুর জীবনে খেলা শুধু অবসর বিনোদনই নয়—জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 'Play is more than mere pastime or means of recreation. It is the serious business of life'. জীবনধারণের জন্য খাদ্য ও পানীয় যেরূপ প্রয়োজনীয়, সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য খেলাও তদ্রূপ অত্যাবশ্যক। খেলা যদি সত্য সত্যই খেলা হয়, অর্থাৎ খেলা যদি

স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়—অপর কর্তৃক আদিষ্ট না হয়ে শিশু যদি নিজে নিজেই নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খেলে, এবং শিক্ষাকে যদি খেলার নির্মোকে আচ্ছাদিত না করা হয়, তবেই ঐ জাতীয় খেলায় প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা হয়। খেলার মাধ্যমে শিশুর ক্রম-বর্ধমান **দেহ** প্রচুর শক্তি লাভ করে—তার পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর নানা উন্নতি হয়ে, অল্পেতেই সহযোজিত (co-ordinated) হতে পারে। এই খেলাতেই ছোটদের **মানসিক বিকাশও** সংঘটিত হতে থাকে ; খেলা করতে করতেই শিশু চিন্তা করতে, তুলনা করতে, পার্থক্য নির্ণয় করতে, বিচার করতে, সিদ্ধান্ত করতে শেখে অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য তার মনটিকে সে সর্বতোভাবে কাজে লাগায়। আবার এই খেলাতেই শিশু তার **আনুভূতিক জীবনের** ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। তার মনের পুঞ্জীভূত বিরক্তি, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি নিরাময়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকায়, খেলা করেই শিশু প্রকৃতিস্থ হয়ে, শান্ত মনে ও স্থির চিত্তে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে। খেলার সাহায্যেই ছোটরা **সামাজিক ও নৈতিক** গুণাবলী অর্জন করে। আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম, ধৈর্য, সহযোগিতা,—এসব গুণ সহজেই শিশু আয়ত্ত করে নিতে পারে। কাজেই, একমাত্র এই খেলার ভেতর দিয়েই প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুর শরীর, মন, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব—এ সবই গড়ে ওঠে, আর তার শারীরিক, মানসিক, আনুভূতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

সকল শিশু-শিক্ষাবিদ্ই খেলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে শিশুর জীবনের বিকাশের ধারায় একে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন। সুজান আইজ্যাকস তাঁর 'দি চিলড্রেন উই টিচ' (*The Children We Teach*) বই-এ বলেছেন—'Play is the child's means of living and understanding life.' শিশু খেলার মধ্যেই বেঁচে থাকে ; খেলা দিয়েই সে জগৎ ও জীবনকে বুঝতে শেখে।

শিশুর কাছে খেলা নিছক খেলাই নয়—খেলা কাজও। যখন বার বার ব্যবহারের ফলে শিশু খেলার উপাদানগুলি সম্বন্ধে ভাল করে জ্ঞানলাভ করে, তখন সে এইসব উপাদানকে আরও বেশী বুদ্ধির পরিচায়ক কাজে লাগায়। খেলা করার আগেই সে চিন্তা করে নেয়—সে কি করতে যাচ্ছে, তা স্থির করে ফেলে। শিশু যখন এই স্তরে পৌছায়, তখন খেলার উপাদানগুলি আর ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে তাকে উদ্দীপিত করে না, শিশুর নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিই তাকে খেলতে উদ্দীপিত করে। এই স্তরে পৌছাবার পর, শিশুর খেলার সময় তার অতীত অভিজ্ঞতা,

স্মরণশক্তি, মনোযোগ, একাগ্রতা, কল্পনাশক্তি আর বিমূর্ত ধারণাকে বুঝবার ও কাজে লাগাবার শক্তিরও প্রয়োজন হয়। **এইভাবেই খেলা কাজ হয়ে ওঠে।** এইজন্যই বার্নাড শ' (Bernard Shaw) বলে গিয়েছিলেন—'Work is play and play is life,—three in one and one in three'. অর্থাৎ 'কাজই হচ্ছে খেলা, আর খেলাই হল জীবন ; এই তিনই এক এবং সেই একেই এই তিন।'

শিশু যখন তার পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে খেলার মধ্য দিয়ে কোন কাজ করতে চায়, তখন তার কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয় ; বরং তাকে তার আরব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বয়স্করা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় বাধা পেলে যেমন বিরক্ত হয়, তেমনি ছোট শিশুরা এই ধরনের খেলা করার সময় বাধা পেলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই ধরনের খেলার মধ্য দিয়েই তার মনোযোগ, একাগ্রতা প্রচেষ্টা তীব্রতর হয়ে ওঠে--তাতে শিশু সত্যিকার কাজ করার উপযোগী হয়। শিশুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে আত্মহারা হয়ে এই কাজ করাকে সি. বুলার (C. Buhler) 'School maturity' বা 'স্কুলে যোগদানের পরিণত অবস্থা' বলে বর্ণনা করেছেন। শিশুর কাজে বা খেলায় যদি অনবরত হস্তক্ষেপ করা হয়, সে যদি বেশী সময় খেলার জন্য দিতে না পারে, তবে সেই শিশুর মধ্যে মনোযোগ বা একাগ্রতার সু-অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না—আর তার বয়স বাড়লেও, সে শিশুই থেকে যায়। এই ধরনের শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে, তখন সে বিদ্যালয়ের একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শিশু জল, বালি, পুতুল, কাঠের টুকরো, রং-তুলি, চাকি বেলুন ইত্যাদি নিয়ে খেলতে ভালবাসে, তা আমরা জানি। মনোযোগ দিয়ে শিশুর খেলাকে লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায় যে, শিশু প্রতিটি খেলার উপকরণকে **দ্বৈত আগ্রহ** পূরণের কাজে লাগায়। **প্রথমতঃ** শিশু একই উপকরণের দ্বারা কত ধরনের জিনিস করতে পারে, তা আবিষ্কার করতে চায় ; **দ্বিতীয়তঃ** ঐ উপকরণের ব্যবহারে শিশু নিজের দক্ষতা বা নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে চায়। শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত খেলার উপকরণ সংক্রান্ত এই দুইটি দিকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন না করে, ততক্ষণ সে এইসবের মাধ্যমে নিজের ধ্যান-ধারণাকে অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। ধরা যাক,

একটি শিশুকে কাগজ রং তুলি ইত্যাদি দিয়ে খেলতে দেওয়া হল। প্রথমে দেখা যাবে, শিশু কাগজের ওপরে তুলি দিয়ে ছোপ ছোপ দাগ দিয়েই খুশী হচ্ছে। এই কাজ করে সে তুলি ব্যবহার করতে পেশীর যে সংযমের প্রয়োজন হয়, তা শেখে, আর রং-এর বর্ণত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কাগজের ওপর রং লাগালে কি হয়, সেই জ্ঞানও সে ঐ সঙ্গে লাভ করে। এতক্ষণ পর্যন্ত সে উপাদানগুলির সম্ভাবনা (possibility) নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করল। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে সে নিজের নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে খেলতে চায় ; তাই তো দেখি, সে রেখা টানে, কখনও গোলাকার বৃত্ত করে, হঠাৎ যদি দুটো বৃত্ত খুবই কাছাকাছি আঁকা হয়ে যায়, শিশু আনন্দে বলে ওঠে, 'দেখ দেখ—আমার পাখি !' অথবা, 'আমি কেমন খরগোশ এঁকেছি।' তারপর হয়তো তার একটা সূর্য আঁকার বাসনা হয়—সে বলে, 'আমি একটা সূর্য আঁকছি'--বলেই সে তুলিটা লাল রং-এ ডুবিয়ে নেয়, আর কাগজে একটা লাল সূর্য এঁকে ফেলে।

মাটি, বালি ইত্যাদি দিয়ে খেলার সময়ও শিশুর এই দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ধরে শিশুরা মাটি নিয়ে চটকাতে থাকে--বিশেষ কিছুই গড়তে পারে না ; কাদামাটির ধর্ম কি, এই করতে করতেই শিশু জানতে পারে। পরে গোল গোল করে সে হয়তো 'রসগোল্লা' বানায়,—লম্বা করে 'সাপ' বানায়। পরে তার আরও উন্নতি হয়। 'আমি পুতুল বানাব' বলে সে পুতুল বানায়—'পাখি বানাব' বলে পাখির রূপ দেয়। এইভাবে নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে শিশু আনন্দে আত্মহারা হয়।

খেলার প্রবৃত্তি শিশুর জন্মগত। এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর সমস্ত প্রাণশক্তি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ পথ পায়, তা আগেও বলা হয়েছে। খেলার ধর্ম হচ্ছে যে খেলা স্বতঃস্ফূর্ত—জোর-জবরদস্তি এখানে নেই। খেলা যেখানে অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত, সেখানে তা আর **খেলা** থাকে না—ড্রিল হয়ে দাঁড়ায়। বড়দের Games বা Sports-ও নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই শিশুর খেলা যে অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, সে-অর্থে এই Games বা Sports-কে ঠিক খেলার আখ্যায় অভিহিত করা যায় না। ছোটদের পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত খেলাই (free play) সর্বাধিক প্রয়োজন। তবে নার্সারী বিদ্যালয়ে ছড়া, কবিতা, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের যাতে শারীরিক বিকাশ হয়, এমন খেলা তারা খেলতে পারে। যেমন—

'এক যে ছিল ঘটোৎকচ, মেজেয় ঠুকত পা,
আর এক যে ছিল পরী, হাওয়ায় ভাসিয়ে দিত গা।
মাটির তলায় ইঁদুর ছানা থাকত পরম সুখে,
ইয়া বড় বল ছিল এক,—লাফিয়ে চলত সুখে ॥'

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা বিরাট দৈত্যের মত বড় হয়ে যাবে, পরীর মত হালকা পায়ে, পাখা নেড়ে, ঘুরে বেড়াবে ; ইঁদুর ছানার মত ছোট্ট হয়ে মাথা নীচু করে মাটিতে বসবে—আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলের মত লাফাতে লাফাতে চলবে।

আবার—**কাকের দল** কি করে পাখা নেড়ে উড়ে যায়, তার অনুকরণ করে হাত নেড়ে নেড়ে ছুটতে পারে। **খরগোশের** মত মাথার দুপাশে দুটো হাত রেখে, বসে বসে লাফিয়ে চলতে পারে।

'বাঘ-কুমীর খেলা', 'খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসি', 'রুমাল চোর'—এ সব অতি সাধারণ নিয়মের খেলা নার্সারী স্কুলে শেষের স্তরে দেওয়া যেতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন খেলা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য অনিয়ন্ত্রিত বা স্বাধীন খেলার বিশেষ মূল্য আছে। তাই প্রতিটি আদর্শ নার্সারীতে ছোটরা প্রথম এসেই—ছাতা, টিফিন বাক্স ইত্যাদি নিজের চিহ্নিত জায়গায় রেখে—অনিয়ন্ত্রিত খেলায় মেতে ওঠে। নিজের খেয়াল ও খুশী মত, বিভিন্ন উপকরণের সাহায্য নিয়ে অথবা না নিয়েই, শিশুর নিজের সহজ, স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির প্রেরণায় যে খেলা শিশু খেলে, বা যে কাজ সে করে, তাকেই **স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত বা অনিয়ন্ত্রিত খেলা** বলা হয়। এই ধরনের খেলায় বড়দের নির্দেশ বা খেলার জন্য কোনও পৃথক বা বিশিষ্ট নিয়মকানুন শিশুকে মেনে চলতে হয় না ; তাই একে বলা হয়—**Free Play বা স্বাধীন খেলা**।

জীব-জগতে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে অভিহিত করা হয় ; কারণ মানুষের বিবেক আছে। তাই সে ভাল-মন্দের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে, অহিতকে বাদ দিয়ে হিতকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও আমরা বহুল পরিমাণে আবেগ বা অনুভূতি দ্বারা চালিত হই। ছোট শিশুর মধ্যে এই আবেগ বা অনুভূতি, এই প্রক্ষোভের ধারা অনেক বেশী জোরালো।

তাই তো শিশুরা সহজে তাদের প্রক্ষোভকে সংযত করতে পারে না ; ফলে প্রবল উচ্ছ্বাসের সময় তাদের বিচার-বুদ্ধিও অবলোপ পায়। শিশু-জীবনে এই প্রক্ষোভের অদম্য প্রভাবে অনেক সময়ই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, যার ফলে শিশু তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে। শিশুর অভিজ্ঞতা সীমিত, তাই এই প্রক্ষোভের ধারা যে ক্ষণস্থায়ী তা শিশু বুঝতে পারে না ; আবেগ-অনুভূতির প্রাবল্যে সে যে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে সে মিশিয়ে ফেলে—আর সেই অবস্থাই তার কাছে 'চিরন্তন সত্য' বলে মনে হয়। পরিণত বয়সে মানুষ জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে, তার প্রক্ষোভগুলিকে সংযত বা উন্নততর পথে (sublimate) চালিত করার পথ খুঁজে পায়। কিন্তু ছোট শিশু একান্তই অনভিজ্ঞ ; তাই ক্ষণিক ভাবাবেগের প্রাবল্যে সে অতি সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে। মনোবৈজ্ঞানিকগণ বলেন, শিশুর এই প্রক্ষোভকে ধরে বেঁধে জোর করে অবদমিত করলে, পরিণামে অতি কুফল দেখা দেয়। এজন্যই এই প্রক্ষোভগুলির মুক্তি পাওয়া দরকার—অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমেই এটি সহজে সম্পাদিত হতে পারে।

আমাদের নার্সারী বিদ্যালয়ের দুটি শিশুর কাহিনী এখানে উল্লেখ করেছি। সাড়ে তিন বৎসরের শমীকে প্রথম যখন স্কুলে ভর্তি করা হয়, তারপর থেকেই তার কান্না চলতে থাকে। সকলে তাকে কত বুঝিয়ে, ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শমীর কান্না আর থামে না। এর মা বাবার সঙ্গেও নানা কথা হল ; শিক্ষিত বাবা মা, শিক্ষিত পরিবার সাধারণ ভাবে কোন অভাব-অভিযোগ দেখা যায় না। ওর মা একদিন বললেন, "ছেলেটা ভীষণ বায়না করে—অফিসের ভাত দিতে হয়—ওর বাবার তাড়া থাকে—ছেলেটা যদি একটুও বোঝে। কিছুই প্রায় খায় না!" আর কিছুদিন গেল। শমীর সঙ্গে আস্তে আস্তে ভাব জমালাম। বাড়িতে কে কে আছে? কি দিয়ে খেলা কর? কি করতে তোমার ভাল লাগে?—এরূপ নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে তার মনের আরও কাছাকাছি এলাম। একদিন শমীর কাছে দাঁড়িয়ে আছি, শমী আর দুটি মেয়ে বালি নিয়ে খেলছে। লক্ষ্য করলাম, শমী খানিকক্ষণ বালি নিয়ে নাড়াচাড়া করল—বালি হাত দিয়ে তুলে ঝুর ঝুর করে ওপর থেকে ফেলল—তারপর কাছেই একটা কাঠের পুতুল পড়েছিল, সেটাকে কোলে নিয়ে সেই পুতুলের চোখে, কানে, নাকে, হাতে, বুকে সব জায়গাতে বালি ঠুসে ঠুসে দিতে লাগল, আর বলতে থাকল,

"খা খা, তাড়াতাড়ি করে শেষ কর।" বুঝলাম, শমীর ব্যথা কোথায়! ওর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ওর আকুল করা কান্নার উৎস কোথায়? বাবার অফিস যাবার ব্যস্ততা, মায়ের জোর-জবরদস্তি ও তাড়া করা—এসব ব্যাপারে শমীর মনের ওপর যে চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই অভিব্যক্তি হতো কান্নার মাধ্যমে। অবাধ ও স্বাধীন খেলার মাধ্যমে—পুতুলের সর্বাঙ্গে বালি ঠেসে দিয়ে, খাওয়া নিয়ে যে তার ওপর অত্যাচার করা হয়, এটাই শমী প্রকাশ করে দিল; খেলায় ভেতর দিয়ে এই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের অবসান ঘটায়, শমী ধীরে ধীরে মনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল। অবশ্য এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে শমীর মায়ের সঙ্গে আমাদের অনেক কথা বলতে হয়েছে—শমীর খাবার সময় বদলাতে হয়েছে—শমীর প্রতি মাকে আরও মনোযোগ দিতে হয়েছে ইত্যাদি।

আর একটি ঘটনা। তিন বৎসরের মেয়ে মণিকে নিয়ে নার্সারীর বাচ্চাদের অনুযোগের আর অন্ত ছিল না। 'মণি সব সময়ই পুতুলকে বকছে'; 'মণি খেলার খয়গোশটাকে মারছে'—এমনি ধরনের নানা কথা মণির সম্বন্ধে প্রায়ই কানে আসত। তখন আমরাও মণির উপর বিশেষ নজর রাখতে লাগলাম। দেখলাম, সত্য সত্যই মণি পুতুলদের খুব বকুনি দেয়, খেলার খরগোশকে মারে, কাঠের ঘোড়াকে বেত লাগায়—খেলনাগুলোতে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়—শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ছোট ছোট চারাগাছগুলিকে আঘাত করে। আমরা মণির এই রকম ব্যবহারের কারণ কি হতে পারে, তা চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর একদিন মণিদের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। ওদের বাড়ি গিয়ে, ওদের পরিবারের কথা জেনে, মণির এই ব্যবহারের কারণ পরিষ্কার বোঝা গেল। বাড়িতে মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমা, জ্যেঠা, জ্যেঠিমা, কাকা, কাকিমা—অনেকে একই সঙ্গে আছেন; বাড়িতে মণিই একমাত্র ছেলেমানুষ। সর্বক্ষণ বয়স্কদের মাঝখানে থাকাতে মণি বুঝতে পারে, সে বড়দের চেয়ে কত ছোট, কত অসহায়, আর তার শক্তি কত কম! সে যে বড়দের মত সুনিপুণ ভাবে কাজ করতে পারছে না, এ ত্রুটি সম্বন্ধে সে সচেতন। তাই তো না-পারার বেদনা, বড়দের জোর-জবরদস্তি—এসব মণির ছোট্ট মনটিতে অশান্তির ঝড় তুলে তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না; তাই তো সে খেলার খরগোশ বা কাঠের ঘোড়াকে মেরে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে চায়—পুতুল, চারাগাছ বা খেলনাগুলোকে নানা নির্যাতন দ্বারা মণি যে তাদের চেয়ে বড়, সে যে তাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী—এটাই প্রকাশ করতে চাচ্ছে। খেলার মধ্য দিয়ে ছোট্ট

মণি তার সুতীব্র অথচ নিরুদ্ধ প্রক্ষোভগুলিকে প্রকাশ করতে পেরেছে, এবং ক্রমশঃ অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে সে সেগুলিকে সংযত ও সংহত করে বাস্তবজীবন ও জগতের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে মেনে নিতে সক্ষম হয়।

ছোট্ট বাড়িতে, অল্প পরিসরে আবদ্ধ থেকে, অনবরত বড়দের নিষেধের বাণী শুনতে শুনতে শিশু-মন হাঁপিয়ে ওঠে। তাই সে মা-বাবাকে নানা রকমে উত্যক্ত করে, তাদের অবাধ্য হয়, জিনিসপত্র ভাঙে, বিছানা ভেজায়, চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিশু যদি অসুখী হয়, অর্থাৎ তার মনে রাগ বা দুঃখ, ভয় বা ক্ষোভ যদি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, তবে শিশু স্বচ্ছন্দ মনে কোন কাজই করতে পারে না। কাজেই নার্সারীতে এসেই যদি শিশু অনিয়ন্ত্রিত খেলার মাধ্যমে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ ইত্যাদি নিরাময়ের পথ খুঁজে পায়, তবে সহজেই সে প্রকৃতিস্থ হতে পারে। তারপর সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশ—দুটোই সহজে এগিয়ে চলতে পারে। এজন্যই আদর্শ নার্সারী বিদ্যালয়ে প্রথমেই শিশুদের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনিয়ন্ত্রিত খেলা খেলবার সুযোগ দেওয়া হয়।

খেলার উপকরণ

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুর জীবনের বিকাশই হয় খেলার মধ্য দিয়ে। কাজেই খেলনা নির্বাচন করার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—

(১) খেলনা যেন শিশুর বয়স ও সামর্থ্যের উপযোগী হয়।

(২) খেলনাটির যেন বিশেষ শিক্ষাগত মূল্য থাকে।

(৩) খেলনাটি যেন বেশ শক্ত ও মজবুত হয়।

(৪) খেলনার রং যেন পাকা হয়।

(৫) খেলনা যেন খুব বেশী দামী না হয়।

(৬) খেলনা যেন মাঝে মাঝে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়।

(৭) খেলনাতে শিশুকে আঘাত করার মত টিনের পাত, খুব সরু কোণ বা পেরেক ইত্যাদি যেন বেরিয়ে না থাকে।

(৮) খেলনাতে যেন শিশুচিত্তহারী বর্ণ-প্রাচুর্য থাকে।

(৯) খেলনা নানা প্রকারের যেন হয়; কাঠের, প্লাসটিকের, মোমের,

রবারের, কাপড়ের তৈরী নানা ধরনের খেলনা দিয়ে খেললে, শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বিকাশ দ্রুত হতে থাকে।

(১০) যে খেলনা দিয়ে খেলে শিশুর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনি খেলনা শিশুদের দেওয়া উচিত। Mechanical Toy অর্থাৎ যে খেলনা চাবি দিলে চলে, তার শিক্ষাগত মূল্য কম। দম কেটে গেলেই তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

(১১) যে খেলনার সাহায্যে শিশুর কল্পনা-শক্তি বৃদ্ধি পায়, সে ধরনের খেলনা শিশুকে দিতে হবে ; যেমন—রান্নাবান্না করার সরঞ্জাম, বাড়ি বাড়ি খেলার উপকরণ বা অভিনয়ের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম।

(১২) তাছাড়া শিশুর খেলার উপকরণের মধ্যে এমন সাজ-সরঞ্জাম থাকবে, যা দিয়ে তার সর্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়। খেলার মাধ্যমে এইভাবে শরীর-চর্চা করলে শিশুর পেশীসমূহের দৃঢ় সমন্বয় হয়—দেহ সুস্থ ও সবল হয়—আর এর ফলে শিশুর সাহস ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

(১৩) শিশু নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, তার নানা প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য, তার ঝঞ্ঝায়িত প্রক্ষোভের উপশমের জন্য জল, বালি, কাদামাটি অত্যাবশ্যক। সময় বিশেষে প্লাসটিকও দেওয়া চলে।

শিশুর জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ বিকাশ হয় খেলাধূলার মধ্য দিয়েই—তাই শিশুর জন্য খেলনা নির্বাচনের দায়িত্ব অপরিসীম। সব সময়ে দামী খেলনা না কিনে, শিক্ষিকারা নিজেরা উৎসাহী হয়ে, চিন্তা করে শিশুর বিকাশের সহায়ক নানা খেলনা সংগ্রহ করে দিতে পারেন। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের খেলা প্রধানতঃ তিন প্রকারের (১) **সক্রিয় অঙ্গসঞ্চালনমূলক খেলা**, (২) **সন্ধান করা ও পরীক্ষামূলক খেলা** এবং (৩) **কল্পনা-উদ্দীপক বা অভিনয়মূলক খেলা**।

এই সব রকমের খেলার প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলির প্রয়োজন।

বল, ট্রাই-সাইকেল, পেডেল করে চালানো যায় এমন গাড়ি, ঢেঁকি (sea-saw) slide, দোলনা, মই, ঠেলে নেওয়া যায় এমন পিঁপে, টানা যায় এমন বাক্স, ভারসাম্যের জন্য ছয় ইঞ্চি চওড়া তক্তা (মাটি থেকে ৬/৭ ইঞ্চি উঁচুতে থাকবে), কাঠের ঘোড়া, jungle gym বা climbing frame—যার ডাণ্ডাগুলো গোল হবে এবং ভেতরে শিশুদের যাতায়াত করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকবে। লাফানোর জন্য সিঁড়ি, পুতুলের ঠেলা গাড়ি (যা ছোট্ট শিশু অনায়াসে ঠেলে নিয়ে

যেতে পারে—এমন মাপের), বেয়ে ওঠার জন্য একহাত অন্তর অন্তর গিঁট বাঁধা দড়ি, মোটর গাড়ির ব্যবহৃত পুরানো চাকা—এ সবই সক্রিয় অঙ্গসঞ্চালনের সহায়ক।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার জন্য প্রথমেই চাই বালি, জল ও মাটি। বালি রাখার জায়গাটা যেন বেশ বড় আর বেশ কিছুটা গভীর হয়—'sand pit'-এর ধারগুলো যদি উঁচু থাকে, তবে বালি বাইরে ছিটিয়ে পড়তে পারে না। বালিতে খেলবার জন্য ছোট খুরপি, বালতি, ছোট ছোট নানা আকারের কৌটো বা বাটি বা গ্লাস, ছাকনি প্রভৃতি দরকার; ছোটরা এসবে বালি ভর্তি করে, অথবা বালি ও জল মিশিয়ে ছাঁচ তৈরী করতে পারে। বালিতে খেলার উপাদানগুলিতে যেন কোন খোঁচ না থাকে, মরচে না ধরে, অথবা এগুলো যেন ভঙ্গুর না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

Sand pit করার জায়গার অকুলান হলে, শিশুদের উচ্চতার অনুপাতে পায়ার ওপর চারকোণা বড় ও গভীর ট্রে-তে বালি রাখা চলে। বালি খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা ওজন, পরিমাপ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।

জল হচ্ছে শিশুদের অন্যতম প্রিয় দ্রব্য। এমন কোন্ শিশু আছে যে জল নিয়ে খেলতে ভালবাসে না? বালি রাখার জন্য যে ধরনের ট্রে-র কথা বলা হয়েছে, তেমনি ধরনের ট্রে-তে জল রাখা যায়। জলে খেলার জন্য ভাসমান, ডুবন্ত, হালকা, ভারি নানা আকারের পাত্র, শিশি, ছাঁকনি, রবারের নল ইত্যাদি রাখা দরকার। এ খেলার সময় প্লাসটিকের "এপ্রন" ছোটদের দিতে হবে—তাতে জামাকাপড় ভেজবার সম্ভাবনা কম থাকবে। জলের খেলায় শিশুর বুদ্ধির বিকাশ তো হয়ই, উপরন্তু এ-খেলায় অনেক শিশুর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভও প্রশমিত হয়।

কাদামাটিও শিশুদের অতিশয় চিত্তাকর্ষক খেলার উপাদান। মাটিকে চটকে, দলে-পিষে শিশু তার ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে; আবার ঐ মাটি দিয়ে অন্য কিছু তৈরী করে সে তার সৃজনাকাঙ্ক্ষা মেটায়।

নানা আকারের রঙীন কাঠের চৌকো টুকরো (blocks) পরিমাণে বেশীই প্রয়োজন হয়। তিনকোণা ও চ্যাপ্টা কিছু কাঠের টুকরো থাকলেও ভাল হয়। এসব দিয়ে ছোটরা ঘরবাড়ি বানানো ছাড়াও, রেলগাড়ি, এরোপ্লেন ইত্যাদি বানাতে পারে। এর সঙ্গে ধাতু বা প্লাসটিকের তৈরী কিছু মানুষ, জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি থাকলে শিশুদের আনন্দের সীমা থাকে না।

পুতুল—নানা মাপের ও নানা উপাদানের তৈরী পুতুল রাখতে হবে। কিছু কিছু পুতুলকে যাতে স্নান করানো যায়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। পুতুল খেলার জন্য পুতুলের বিছানা, খাট, বালিশ, চাদর ইত্যাদি, তাদের খাবার বাসনপত্র, পেয়ালা-পিরিচ, জামাকাপড় (যা সহজে খোলা ও পরানো যায়)—এ সবই থাকতে হবে। শিক্ষিকা ও সহৃদয়া মায়েরা তাদের পুরানো শাড়ি, জামা, জরি ইত্যাদি দিয়ে পুতুলখেলার নানা মনোহর সাজ-পোশাক তৈরী করে দিতে পারেন।

কাঠের বোর্ডে নানা আকারের ফোকর থাকে, আর সেই মাপের নানা আকার ও আয়তনের কাঠের টুকরো থাকে। খেলাচ্ছলে ঠিক টুকরোটিকে সঠিক ফোকরের মধ্যে (filling in toys) রাখতে হবে ; 'Posting Box'-ও এই ধরনের খেলা। এসব খেলায় ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ছাড়াও, শিশুর আগ্রহের উদ্রেক হয়। তার জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায় এই খেলা। Jig-Saw-Puzzle-ও ছোটদের উপযোগী। এ খেলা হল ছবির ধাঁধার খেলা। যেমন—ধরা যাক, চারটি কাঠের টুকরোতে ছবি এঁটে একটি সম্পূর্ণ ছবি গড়া হয়েছে। কিভাবে এই চারটি ছবিকে সাজিয়ে রাখলে ঐ সম্পূর্ণ ছবিটি হবে, ছোটরা তা বিশ্লেষণ ও সংযোজনের সাহায্যে বের করতে পারে।

হাতুড়ি দিয়ে ঠুকতে, জোরে জোরে শব্দ করতে ছোটরা ভালবাসে। 'Hammering Toy' বলে যে খেলনা আছে, তা ছোটদের দেওয়া চলে। এই খেলনায় একটা বোর্ডে ছয়টি ফুটো থাকে ; তাতে ছয়টি কাঠের রড খুব শক্তভাবে বসানো থাকে। ছোটরা হাতুড়ি দিয়ে ঐ রডগুলিকে ঠুকতে থাকে। এতে তাদের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে। Percussion Band-ও এই দিক থেকে মূল্যবান ; এই Band-এর জন্য চাই তবলা, কাঠি, ঝুমঝুমি, করতাল, ট্যামবুরিন, ঘণ্টা প্রভৃতি।

ছবি আঁকার জন্য বড় খবরের কাগজ, প্যাকিং করার কাগজ, গুঁড়ো রং, লম্বা হাতলের তুলি ও কিছু আঠার প্রয়োজন হয়। এসব দিয়ে শিশুরা তাদের পছন্দমত ছবি আঁকতে পারে। তাছাড়া শুধু আঙ্গুল ও রং দিয়েও শিশুরা ছবির নকশা করে তাদের সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে (finger painting)। ছবি আঁকার জন্য চক, রঙ্গীন পেন্সিল ও ক্রেয়নও ব্যবহার করা করা চলে।

খালি সুতোর রিল, পাউডারের খালি বাক্স বা কৌটো, "ভিম" (Vim)-এর খালি কৌটো, দেশলাইয়ের বাক্স, কাঠের টুকরো—এরূপ নানা অব্যবহার্য জিনিস

নার্সারীর বাচ্চাদের জন্য এক কোণে সংগ্রহ করে রাখা যায়। কাঁচি, কাগজ, আঠা, রঙ্গীন চকচকে কাগজ, পুরানো সচিত্র মাসিক পত্রিকা, নানা রং-এর পশমের টুকরো, চটের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে শিশুরা নানা জিনিস তৈরী করতে পারে।

ছোটদের ব্যবহারের জন্য কিছু ছবির বইও নার্সারীতে থাকবে। সহজ ভাষায় ও বড় অক্ষরে লেখা ছড়া ও গল্পের বই—যাতে প্রচুর রঙ্গীন ছবি আছে—তাও থাকবে। তাছাড়া কার্ডবোর্ডে সুদৃশ্য ও শিশুদের পরিচিত ছবি লাগিয়ে সুন্দর সুন্দর 'ছবির কার্ড'ও তৈরী করা যায়।

কল্পনা উদ্দীপক ও অভিনয়মূলক খেলার মধ্যে বাড়ি বাড়ি খেলা, রান্না করা, অভিনয় করা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। ছোটদের এই বাড়ি পর্দা দিয়ে অথবা কাঠের ভাঁজ করা পার্টিশন দিয়ে, ঘরের এক কোণে সহজেই করা যায়। বাড়িতে থাকতে গেলে টেবিল, চেয়ার, ঝাঁটা, বাসন ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সবই এখানে থাকবে, এবং তা হবে **ছোটদের মাপে—পুতুলের মাপে নয়।** এখানে ছোটরা নিজেরাই মা, বাবা সাজে অথবা দাদা, দিদি হয়ে তাদের মত কাজ করে—তাদেরই অনুকরণে কথাবার্তা বলে। বাড়িতে রান্না করার সময় মায়েরা যেমন চাকি-বেলুন, শিল-নোড়া, হাতা-খুন্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে, ছোটরাও তাদেরই মত ঐ সব ব্যবহার করতে চায়। হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদি খুব ছোট হলে, শিশুরা তার ভেতরে হাতা ও খুন্তি নাড়তে পারে না। বালি দিয়ে ভাত, পাতা দিয়ে মাছ, বিনা আগুনে রান্না করে তা সকলকে পরিবেশন করে খাইয়ে শিশু যে কী গভীর আনন্দ লাভ করে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তা ছাড়া অভিনয়ের জন্য পুরানো জমকালো শাড়ি, জামা, পুথির গহনা, রাংতার মুকুট, ইঁদুর বা শেয়ালের উপযুক্ত মুখোশ ইত্যাদি সম্ভব হলে রাখা দরকার। শিক্ষিকার সহায়তার কাঠ বা কার্ডবোর্ডের তরোয়াল তীর-ধনুক ইত্যাদি ছোটরাও তৈরী করতে পারে, অথবা শিক্ষিকারা তৈরী জিনিসে রং করে দিতে পারে।

অনেক নার্সারী বিদ্যালয়ে মণ্টেসরীর Didactic Apparatus বা শিক্ষামূলক সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকে। ইন্দ্রিয় শিক্ষার ব্যাপারে এগুলো কার্যকরী হলেও, এর অনেকগুলোই অবান্তর ও অত্যধিক মূল্যবান। ফিতা বাধা বা বোতাম

লাগানোর ফ্রেমের বদলে, শিশুরা সহজেই পুতুলের জামা-জুতো পরানোর মাধ্যমে বা নিজেদের পোশাক পরার সময় জুতোর ফিতে বাঁধতে বা জামার বোতাম লাগাতে পারে। তা ছাড়া আমাদের গরীব দেশের প্রত্যেক স্কুলে এত মূল্যবান সরঞ্জাম রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়। তবে মণ্টেসরীর থেকে ধারণা নিয়ে, সহজ জীবন-যাত্রার মাধ্যমে অল্প দামী উপকরণ তৈরী করে, শিশুদের সহজেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা দেওয়া যায়।

এই তালিকাই শেষ কথা নয়। শিক্ষিকা বা মায়েরা তাদের দূরদৃষ্টি, চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে,—এবং সর্বোপরি শিশুকে ভালবেসে আরও নানা ধরনের খেলনা তৈরী করে ছোটদের অপার আনন্দ দিতে পারেন।

উপসংহারে আবার বলছি যে, খেলা শিশুর জীবনের অত্যাবশ্যক। ছোট শিশুর অনুভূতির জীবনের পক্ষে **দেড় থেকে চার বছর** সবচেয়ে সংকটপূর্ণ কাল। এ সময় তার অনুভূতিগুলি সংখ্যায় বেশী না হলেও, সেগুলি শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রবল ও বিভ্রান্তিকর। উপযুক্তভাবে, সহানুভূতির সঙ্গে এ সময় চালিত না হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন একগুয়ে, উচ্ছৃঙ্খল, ভীরু, অসামাজিক বা আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। নার্সারীতে সমবয়স্ক, ছোট এবং বড় সবরকম শিশুর সঙ্গে খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু অনুভূতিপ্রবণ জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করে। কল্পনাপ্রবণ শিশুর কল্পনাশক্তিও খেলার মধ্য দিয়ে নিরাপদ ও আনন্দময় মুক্তিলাভ করে। খেলায় শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সুগঠিত হয়; সুস্থ দেহ তাকে সুস্থ মনেরও অধিকারী করে। গেসেল (Gessel)-এর মতে আড়াই থেকে চার বৎসরের শিশুদের মানস-জীবনে একটা অস্থিরতা, একটা দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। নিজের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু স্বাধীনতা লাভ করতে চায়—মায়ের আঁচলে ঢাকা না থেকে, বাইরের পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে নিজের শক্তির মূল্যায়ন করতে চায়। তাই তো বয়স্কদের হস্তক্ষেপে তার এত বিতৃষ্ণা! অন্য দিকে শিশুর কচি মনে মায়ের অপরিসীম ভালবাসা, বড়দের আদর-যত্ন বা মনোযোগের প্রতিও সমান গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকে। নার্সারী স্কুলে স্বাধীন, প্রীতিময় পরিবেশে নানা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান সহজেই ঘটে। এইজন্যই বলা হয়—'Play is the safety valve'—অর্থাৎ খেলাই হচ্ছে শিশুর মানসিক দ্বন্দ্বের নির্গমনের নিরাপদ উপায়। খেলাই শিশুর জীবন—খেলাতেই শিশুর বিশ্রাম—খেলাতেই শিশুর শিক্ষা।

ভাষা ও সাহিত্য

শিশুর বাক্‌শক্তির বিকাশ ও শিক্ষা

ভাষা শিশুর আনন্দ আহরণের চাবিকাঠি। সাধারণতঃ সাত-আট মাস বয়স থেকেই শিশু আধ-আধ কথা বলতে পারে। তারপর দেড় থেকে শুরু করে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তার অনর্গল বাক্‌শক্তির প্রবাহ চলমান থাকে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ঘুঘুর ডাক যেমন স্বাভাবিক, ছোট্ট পরিতৃপ্ত শিশুর হাত-পা নেড়ে কলকূজন করাও তেমনি স্বভাবজ।

শিশু পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারার পূর্বেই, আশপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে চায়। এজন্যই তিন থেকে পাঁচ মাস বয়সে দেখা যায় যে ছোট্ট শিশু তার পরিচারিকা ও বিশেষ করে মাকে দেখে হাসে। এই হাসিই তার যোগাযোগ রক্ষা করার প্রথম উপাদান। ছয় মাস বয়সে সে 'বা-বা বা-বা', দা-দা 'দা-দা দা-দা' উচ্চারণ করতে পারে, আর নিজের উচ্চারিত শব্দ শুনে আনন্দিত হয়ে খেলা করে। তার অর্থহীন এই কলকূজন শীগ্‌গিরই পরিবর্তিত হয়ে তার রাগ অথবা বিরাগ, আনন্দ অথবা দুঃখ, তার বিরক্তি অথবা সাগ্রহ প্রতীক্ষা বুঝায়, এমন অদ্ভুত শব্দে রূপান্তরিত হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে একেবারে ছোট শিশু যাকে খুব ভালবাসে, তিনি কাছে এলে বা শিশুকে কোলে নিলে, শিশু আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়ে এক ধরনের বিশেষ শব্দ করে। মায়ের বুকের দুধ খাবার আগে অনেক শিশুকে এ-ধরনের শব্দ করতে শোনা যায়। এগারো মাস বয়সে অনেক সময় শিশুরা বাবা কি মার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের শব্দ করে থাকে। কাজেই পরিষ্কারভাবে কথা বলার আগে শিশুরা এইভাবেই তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করে। মায়ের সঙ্গে শিশুর যে নিবিড় সম্পর্ক, তাতে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে মায়ের প্রভাব যে কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়।

শিশুর এই যে কলকূজন, তা সাদা, কালো, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত বা মূর্খ পিতামাতা সন্তানদের ক্ষেত্রে সমভাবেই দেখা যায়; ভৌগোলিক সীমানা এই কলকূজনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় না। এমন কি যে শিশু জন্ম-বধির, সে-ও এই কলকূজনে সমর্থ; এতে প্রমাণিত হয় যে শিশু না শুনে, বা না

অনুকরণ করেই এই শব্দ করতে পারে। কার্ল বুলার (Karl Buhlar) এজন্যই শিশুর কলকূজনকে ভাষার উৎস বা vocal stone quarry বলেছেন।

শিশুর কাছে কোন্ বর্ণ উচ্চারণ সহজ আর কোন্‌টিই বা অপেক্ষাকৃত কঠিন? নানা গবেষণার পর প্রফেসর লুইস (Lewis) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মাতৃদুগ্ধ পান করার সময় শিশুর মুখের ভিতরে যে ধরনের নড়াচড়া হয়, এবং যে বর্ণ উচ্চারণের ঐ একই ধরনের নাড়াচড়া হয়, সেসব বর্ণ শিশু সহজে উচ্চারণ করতে পারে—অন্য বর্ণগুলি তত সহজে উচ্চারিত হয় না। এজন্যই **ওষ্ঠ্য ও দন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ**—যেমন প, ফ, ব, ভ, ত, থ, দ, ধ—শিশু সহজে উচ্চারণ করে। পক্ষান্তরে তালব্য, কণ্ঠ্য ও নাসিক্য বর্ণ তত সহজে উচ্চারণ করতে পারে না। এটি একটি সাধারণ নিয়ম—অবশ্য শিশু বিশেষে এর যে ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়। তাছাড়া ছ, ঝ, স ইত্যাদি উচ্চারণ করতে অনেকেরই কষ্ট হয়; তাই ছাগল হয় "থাগল", চাউল হয় "তাউল", কমলা হয় "তমলা", গরু হয় "দরু" ইত্যাদি। স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময়ও সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিলে যেতে হয়। অ, ই, উ থেকে শুরু করে পরে দীর্ঘস্বর ও সান্ধ্যস্বর শেখানো উচিত। শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ শিক্ষার এই **ক্রমটি** মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

পরিষ্কারভাবে কথা বলার আগে শিশু অনেক কথার অর্থ বুঝতে পারে। "টিকটিক" বললে সে ঘড়ির দিকে দেখায়—"টা টা, বাই বাই" বললে সে হাত নেড়ে বিদায় জানায়। মা কে? বাবা কে? দাদু কে?—প্রশ্ন করলে আঙুল দিয়ে বিশেষ জনকে নির্দেশ করতে পারে। শিশুর দেড় বৎসর বয়স হলে, হঠাৎ যেন রুদ্ধ স্রোতের মুখ খুলে যায়; শিশু তখন অনর্গলভাবে এমন বহু শব্দ উচ্চারণ করে যার অর্থ সকলে বুঝতে পারে না, কিন্তু যারা সর্বদা তার কাছে থাকে, তারা ঐ সকল শব্দের অর্থ বেশ বুঝতে পারে। নিজের পারিপার্শ্বিকের সব কিছুর ওপরই শিশুর অসীম আগ্রহ! আর অনেক সময়ই **ধ্বন্যাত্মক শব্দের** মাধ্যমে শিশু আশপাশের জিনিসকে প্রকাশ করে। তাই বিড়াল "মিউ মিউ", কুকুর "ভৌ ভৌ", মুরগী "কুক্‌রু কুক্‌রু", গাড়ি "গ গ"—এইভাবে প্রকাশিত হয়।

এই বয়সে একটি বাচ্চার উচ্চারিত এক-একটি শব্দ এক-একটি বাক্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। "দুধ" বললে সে বোঝায়—"আমাকে দুধ দাও"।

অনুরূপ ভাবে "চেয়ার" বললে "আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দাও",—"লাঠি" বললে "আমাকে লাঠি নিয়ে বেড়াতে চল"—এই সবই বোঝাতে চায়। কাজেই এই বয়সে ব্যবহৃত এক-একটি শব্দ কেবল একক শব্দই বোঝায় না,—এক-একটি একক শব্দ এক-একটি সম্পূর্ণ অবস্থাকে বর্ণনা করে।

শিশু কখন প্রথম বাক্য বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে কার্ল বুলার (Karl Buhlar) বলেন যে, চৌদ্দ মাস থেকে শুরু করে কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য বলতে সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত লেগে যায়। 'কি?' 'কি?' 'এটা কি?' 'ওটা কি?'—এই ভাবে শুরু করে, কয়েকটি শব্দ নিয়ে সম্পূর্ণ বাক্য শিশু গঠন করে বটে, কিন্তু তার বাক্য-গঠন-রীতি ঠিক বয়স্কদের মত হয় না। অনেক সময় শিশু তার অনিচ্ছা বোঝাতে প্রথমে ইতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে, পরে তার সঙ্গে নেতিবাচক কিছু যোগ করে। দুধ খেতে না চাইলে সে বলে, "খোকা দুধ খাবে—না, না, না।" ঘুমাতে না চাইলে বলে, 'খোকা ঘুমাবে—না, না, না।" এই বয়সের শিশুর কথায়—'একজনের আছে, অন্যজনের নেই,'—এই বিপরীত ভাবও প্রকাশ পায়। যেমন—'মিউ (বিড়াল) এর লেজ আছে, বাবার লেজ নেই।' এই সময়ের মধ্যে পরিচিত জিনিসপত্র লোকজন বা পশুপাখি ইত্যাদির যে নাম সে শিখেছে, বই-এর ছবি দেখে—ঐসব নাম সে বলতে পারে। এমনকি ছবি দেখে সে নূতন মন্তব্যও করতে পারে। এক বৎসর নয় মাস বয়সের নাস্তু একটা ছবি দেখে বলেছিল—'বাবা হাসছে, মা হাসছে—সবাই মিলে হাসছে'।

দুই বৎসরের পূর্বে শিশুরা যে ভাষা বলে, তাতে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদই বেশী থাকে—সময় সময় বিশেষণেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু **সর্বনামের ব্যবহার** প্রায় দেখাই যায় না। 'আমি বেড়াতে যাব' না বলে শিশুরা বলে, 'খোকা বেড়াতে যাবে'; 'আমি ভাত খাব না' না বলে সে বলে, 'খুকু ভাত খাবে না'। উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক শিশু অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ পরিত্যাগ করে ঐ স্থলে স্বরবর্ণের উচ্চারণ করে, যেমন—গরু গউ; ভেড়া ভেআ প্রভৃতি। শিশুর কাছে প্রথম অবস্থায় স্বরবর্ণের উচ্চারণ অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ সহজ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণও করতে পারে,—তবে এজন্য তার স্পষ্ট উচ্চারণ শোনার প্রয়োজন; অযথা শিশুর আধ-আধ কথার প্রশ্রয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণতঃ দুই বৎসরের একটি স্বাভাবিক শিশু ২৫০-৩০০ শব্দ বলতে পারে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে আসার পর শিশুর বাক্‌-শক্তির অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মণ্টেসরী এজন্যই **দুই থেকে পাঁচ বৎসর** বয়সকে শিশুর ভাষাজ্ঞান অর্জন ও ভাষার বিকাশের প্রকৃষ্ট সময় বলে বর্ণনা করেছেন। নার্সারীতে যোগদান করার ফলে শিশু যে সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাতে ভাষা শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত হয়। সামাজিক আদান-প্রদানের মূলই হল ভাষা। নার্সারীতে অন্যান্য শিশু ও বয়স্কদের উপস্থিতির দরুন, শিশু চারিদিকে যা দেখে, শোনে, অথবা সে যা উপভোগ করে, সে সব কিছু সম্বন্ধেই বলতে আগ্রহী হয়। প্রথম অবস্থায় শিশু অনেকটা আপন মনেই কথা বলে (monologue); পাশাপাশি হয়তো দুটি শিশু বসে খেলা করছে—এদের প্রত্যেকেই নিজে নিজে কথা বলছে, একে অন্যের কথা হয়তো শোনেও না বা উত্তরও দেয় না,—তবু এই শিশুর পরস্পরের সান্নিধ্য তাদের দুজনকেই কথা বলতে উদ্দীপিত করে। এই সময়ে এদের কথাবার্তার ধরন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এরা একই বাক্য সামান্য পরিবর্তিত করে বার বার ব্যবহার করে, কিন্তু বাক্যের মূল কাঠামো একই থাকে। যেমন—"আমার মা আমাকে একটা পুতুল দেবে।" "আমার মা আমাকে একটা খুব বড় পুতুল দেবে।" "আমার মা আমাকে একটা লাল জামা পরা খুব বড় পুতুল দেবে।" "আমার মা আমাকে এই পুতুলটার মত একটা বড় পুতুল দেবে।" আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায়—শিশু বড়দের উপস্থিতিতেও আপন মনে অনেক কথা বলে ; বড়দের উপস্থিতিই তার উদ্দীপনার কারণ হয়ে ওঠে। সে সব সময় তার আপন মনের কথার (monologue) কোন উত্তর বড়দের কাছে আশা করে না,—কিন্তু সে তার কথা বলার সময়ে বড়দের মনোযোগ দাবি করে।

সকালে নার্সারীতে এসে, অনিয়ন্ত্রিত খেলা করার পর শিশুরা যখন একত্র হয়ে বসে, তখন শিক্ষিকা শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করতে পারেন। "তুমি রাস্তায় আসতে আসতে কি দেখেছ ?" "পূজার জন্য কি কি কেনা হয়েছে ?" "আজ কি দিয়ে ভাত খেয়েছ ?" "রুমার জন্মদিনে কি কি হয়েছিল"—এধরনের অজস্র প্রশ্নের উত্তর শিশু খুব উৎসাহের সঙ্গে দিতে চেষ্টা করে, কারণ এসবই তার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। শিশু প্রথমে হয়তো একটি মাত্র কথার উত্তর দেবে—ক্রমে ক্রমে সে সম্পূর্ণ বাক্য বলতে পারবে। এই কথোপকথনের সময় শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন যে শিশুর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে

কিনা ! তার উচ্চারণের ত্রুটি হলে, কোন কারণেই তাকে অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ করবেন না ; নিজে বার বার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে শিশুকে তা শোনাবেন, তবে শিশু সহজেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে চেষ্টা করবে।

ছড়া, কবিতা, গান, অভিনয়, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর ভাষা শিক্ষার কাজ খুবই দ্রুত এগিয়ে যায়। একই ছড়া বা একই গল্প শিশু বার বারই শোনে, ফলে সহজেই তা তার মুখস্থ হয়ে যায়। এর একটা স্থায়ী ফল এই হয় যে, শিশুর দৈনন্দিন জীবনে ঘটে না এমন সব ধারণা বা বস্তুর সঙ্গে সে খুব সহজেই পরিচিত হয়ে যায়, এবং অনায়াসেই সে এসবকে ভাষায় রূপ দিতে পারে। এমনিভাবে তার ভাষাজ্ঞান বেড়ে যেতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে দুই থেকে পাঁচ বৎসর ভাষাশিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় ; কেননা, এই সময় শিশুরা সহজেই গ্রহণ করতে পারে, তাড়াতাড়ি অনুকরণ করতে পারে, আর পারে যা শোনে তার পুনরাবৃত্তি করতে। কাজেই ভাষাশিক্ষার দিক থেকে সেই সময়টাকে যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করতে হবে। তা ছাড়া দরদী শিক্ষিকার সুকণ্ঠে উচ্চারিত সুললিত বাণী, তাঁর কণ্ঠের ভঙ্গিমা, তাঁর গল্পোচিত পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা, নায়ক-নায়িকার দুঃখে-সমব্যথী বা সুখে আনন্দিত হওয়া—এ সব কিছুই শিশুমনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। এতে শুধু শিশুর ভাষাশিক্ষাই হয় না, এতে এই কচি বয়সে শিশু-মনে সাহিত্য-রস-আস্বাদনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়।

দুই থেকে চার বৎসরের শিশু সময় জ্ঞাপক শব্দের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না। তিন বৎসরের শিশুর পক্ষে **গতকাল** বা **আগামী কালের** পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ নয়। এইজন্য ছোটদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, "আমরা কি গতকাল বেড়াতে যাব ?" ছোট শিশুর কাছে বর্তমানই সব—সে অতীত বা ভবিষ্যৎকে ভাল করে বুঝতেই পারে না। ভবিষ্যতে শিশুকে কোন কিছু দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলে সেই ভবিষ্যৎকে অনির্দিষ্ট কাল বলে উল্লেখ না করে, শিশুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা করলে, তা শিশুর বোধগম্য হয়। যেমন—তুমি আজ রাত্রে ঘুমাবে—আবার আরও এক রাত্রি ঘুমাবে—তারপর দিন তোমার জন্মদিন ; সেদিন তুমি অনেক উপহার পাবে।"

ছোট শিশুর মন চির-জিজ্ঞাসু। তাই তো আমরা অনবরতই তার কাছ থেকে প্রশ্ন শুনি, "কেন হয় ?" "কি করে হয় ?" ইত্যাদি। কিন্তু অসম্ভব মনে হলেও, একথা সত্য যে শিশু এই ধরণের **প্রশ্ন করার** বহু পূর্বেই এ সমস্যার

সম্মুখীন হয়েছে এবং তার খেলার মাধ্যমে এর কিছু কিছু সমাধানও করতে চেয়েছে। তিন বৎসর বয়স থেকে সে এই ধরনের বহু প্রশ্ন করে। এই বয়সে প্রশ্ন করাটাই শিশুর মূল লক্ষ্য ; এই সময় প্রশ্নের **Pattern**-এর দিকেই তার নজর থাকে। কিন্তু এরপর শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর খোঁজে এবং এই উত্তরের ভিত্তিতেই তার ধারণাগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। পাঁচ বৎসর বয়সের একটি সাধারণ শিশুর শব্দভাণ্ডার প্রায় দুহাজার পর্যন্ত হয়।

শিশুর বাক্-শক্তি পিছিয়ে পড়ার কারণ

(ক) যে সব শিশু স্বল্প পরিসর জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং অতি অল্প পরিমাণে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(খ) যে পরিবারের পিতামাতা অজ্ঞ।

(গ) যে পরিবারের শিশুরা অবহেলিত হয়।

(ঘ) যেখানে শিশুর প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে, শিশুর প্রশ্ন করার আকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয়ে যায়।

(ঙ) শিশুর প্রক্ষোভজনিত নির্ভরতা ও চিরশিশু থাকার বাসনা।

(চ) শিশুর সুস্বাস্থ্যের অভাব।

(ছ) শিশুর বধিরতা।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করতে পারলে, শিশুর বাক-শক্তির বিকাশ সহজ ও দ্রুত হয়। বলা বাহুল্য, শিক্ষিত পরিবারে চিন্তা ও ভাষার উন্নতি হয়,—এমন ধরনের কথাবার্তা ও খেলাধূলার সহায়তায় শিশুরা ভাষা শিক্ষার কাজে অতি দ্রুত এগিয়ে যায়।

ভাষা-শিক্ষিকার কাজ

ছোটদের যিনি ভাষা শিক্ষা দেবেন, তাঁকে যে ভাষাতত্ত্ব বিশারদ হয়ে Phonetics জানতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তবে বর্ণের উচ্চারণ স্থান কোথায়, হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর কি কি, সান্ধ্যস্বরই বা কি—এসব তত্ত্ব তার জানা প্রয়োজন। বই, পুস্তকাদি পড়ে নিলে যে কোনও শিক্ষিকার পক্ষে এটি খুব কঠিন কাজ হবে না। ভাষা-শিক্ষিকার পক্ষে সবচেয়ে বড় দরকার—**ভাষার প্রতি অনুরাগ**। তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর হবে—একঘেয়ে হবে না ; সুস্পষ্ট হবে—অথচ অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হবে না। শিক্ষিকা যদি পরিষ্কার ও স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথা বলেন,

তবে স্বভাবতঃই দেখা যাবে যে ছোট ছোট শিশুরাও ঐভাবে কথা বলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে ; অবশ্য শিক্ষিকারও এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এক কথায় বলা যায় যে, এই বয়সেই শিক্ষিকা তাদের 'শোনার কান' তৈরী করে দেবেন। কারণ মনোযোগ দিয়ে শোনা—বাক্-শক্তি বিকাশের অন্যতম সহায়ক।

তবু হয়তো কোন কোন শিশুর ত্রুটি থেকে যাবে। কারো উচ্চারণ হয়তো অস্পষ্ট, কারো বা আঞ্চলিকতা-দোষে দুষ্ট, কেউ-বা ক-বর্গ, চ-বর্গ ও ট-বর্গ ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে না—এমনি নানা ধরনের ত্রুটি ছোটদের মধ্যে দেখা যেতে পারে। এসব ত্রুটির জন্য যদি আমরা শিশুদের ভুল উচ্চারণকে অনুকরণ করে লজ্জা দিতে যাই, তবে তা মারাত্মক ভুল করব। এতে শিশুর ভুলের সংশোধন তো হয়ই না, বরং তার **ক্ষতি** হয় ঢের বেশী। শিশু ভুল উচ্চারণ করলে, তাকে শ্রেণীর অন্য সকলের কাছ থেকে আলাদা করে স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে বার বার তাকে শুদ্ধ উচ্চারণটি শেখানো দরকার। শিশুর ভুল নানা কারণে হতে পারে। সে হয়তো জন্মাবধি ঐ ভুল উচ্চারণই শুনে এসেছে—কেউ তাকে বলে দেয়নি যে ঐটি ভুল। এবারে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে, তার কান তৈরী হয়, সে আর ভুল করে না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষিকার ধৈর্যের প্রয়োজন।

এ ছাড়া, পুতুল নাচ ও অভিনয় করার মাধ্যমে শিশুদের বাচনভঙ্গীর ত্রুটি অতি দ্রুত অপসারিত হয়। যে সব শিশু অতিমাত্রায় **আত্ম-সচেতন,** তারা পুতুলনাচের সময় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে, অতি সুন্দরভাবে বলতে সক্ষম হয়। তাদের বলার মধ্যে বা উচ্চারণে কোন ত্রুটি থাকলে, এ ব্যবস্থায় তা সহজেই দূর হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তোতলামিকে যদিও বাক-শক্তির ত্রুটি বলে সাধারণতঃ ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যারা তোতলামি করে, তাদের নিয়ে হাসাহাসি করা বা তাদের অনুকরণ করে ব্যঙ্গ করে কথা বলা—একান্তই অনুচিত। তোতলামির নানা কারণ থাকতে পারে ; বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে এর চিকিৎসা করানো দরকার।

ছড়া

ছড়া লোক-সাহিত্যের একটি শাখা। আর এই লোক-সাহিত্য হচ্ছে সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি—ব্যক্তি-বিশেষের একক সৃষ্টি নয় ; উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে এইখানেই তার প্রভেদ।

এই ছড়াগুলির লেখক কে, এদের উৎপত্তি কোথায় কোন্ গ্রামে, এগুলি কে কখন রচনা করেছিলেন—এসব কিছুই জানা যায় না। Mac Edward Leach এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—"All aspects of folklore, probably originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of recreation which through constant variation and repetition, become a group product." অর্থাৎ এই লোক-সাহিত্য শুরুতে একজনের সৃষ্টি ছিল, কিন্তু কালক্রমে হাত-বদল হতে হতে বহুজনের সৃষ্টি হয়ে সমাজের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। এজন্য ছড়াকেও Commercial Re-creation-এর পর্যায়ে ফেলা চলে ; কারণ দশে মিলে একে রচনা করেছেন—আর দশজনকে আনন্দ দানের জন্যই এগুলি রচিত হয়েছে। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় ছড়াও প্রথমে মৌখিকভাবে রচিত হয়েছিল ; মৌখিক আবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই ছড়ার সজীবতা রক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা ছড়াগুলিকে ছাপার অক্ষরে ধরে রাখতে পারছি।

রবীন্দ্রনাথ "লোকসাহিত্য" প্রবন্ধে ছেলেভুলানো ছড়ার প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমাদের ভাষা ও সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ **স্বাভাবিক কাব্যরস** আছে, সেইটিই আমার কাছে অধিক আদরণীয় বোধহয়।' তিনি আরও বলেছেন—'...ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে। সেই মাধুর্যটিকে **বাল্যরস** আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত সিদ্ধরস এবং যুক্তিসঙ্গতিহীন।'

একটি বৃহৎ বনস্পতির ডালপালা ছেঁটে দিলে আবার নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা গজাবে, কিন্তু তাতে মূল গাছটি তো একই থেকে যায় ; তেমনি ছড়ার আঙ্গিকের পরিবর্তন হলেও মুল কাঠামো একই থাকে। তাই ছড়ার মধ্যে চিরত্ব সত্ত্বেও চিরনবীনতা বজায় থাকে। তাই তো ছড়া এত সজীব ও প্রাণোচ্ছল।

ছড়াগুলি মেঘের ন্যায় বন্ধনহীন। সুসংলগ্ন কোনও কার্যকারণসূত্রের পারম্পর্য রক্ষা করে এগুলো রচিত হয়নি। আর অসংলগ্নতা শিশু-মনেরই প্রতীক। তা ছাড়া ছড়ায় কি মর্মার্থ নিহিত আছে, তার খোঁজ শিশুরা বড় একটা করে না। ছড়া আবৃত্তির বা শোনার সময় যে সুরের ঝংকার সৃষ্টি হয়, সেই সুললিত মাধুর্যে

শিশুর মন ভরে ওঠে, শিশুর ছোট্ট মানসপটে ছড়ার ছবিটি ভেসে ওঠে—সে অপার আনন্দ লাভ করে। তাই তো ছড়া শিশুর এত প্রিয়।

ছড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের নানাবিধ বিকাশে ছড়া শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ।

(ক) ছড়ার ছন্দের ঝংকার, সুর ও মিল শিশু-মনে আনন্দ-দান করে ও অজ্ঞাতসারে সাহিত্য রসসৃষ্টির খোরাক হয়।

(খ) ছড়া আবৃত্তির দ্বারা শিশুর উচ্চারণের জড়তা কেটে যায় ও বাক-শক্তির বিকাশে সহায়তা করে।

(গ) ছড়া বলার মাধ্যমে শিশু আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে; এতে অভিনয় করারও সহায়তা হয়।

(ঘ) এর অদ্ভুত ও অসংলগ্ন ছবি ছোটদের কল্পনা-শক্তি বিকাশের সহায়ক।

(ঙ) এতে স্মৃতিশক্তিরও চর্চা হয়।

(চ) ছড়া শুনতে শুনতে শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়।

(ছ) ছড়ায় দলগত আবৃত্তিতে, অপেক্ষাকৃত ভীরু ও লাজুক শিশু তার ভীরুতা ও লজ্জাশীলতা দূর করতে পারে।

(জ) ছড়ায় শিশু নিজেকে বয়স্কদের মত কল্পনা করে অভিনয় করে। এতে তার অনুকরণ প্রবৃত্তি সন্তুষ্টি লাভ করে ও তার মানসিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

(ঝ) শিশু এতে প্রচুর আনন্দ লাভ করে।

ছড়া শেখাবার পদ্ধতি ঃ মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা-খুকুর স্তবের জন্যই ছড়াগুলি রচিত হয়েছিল। তাই তো দেখা যায় যে, ছোট শিশুরা মায়ের মুখনিঃসৃত ছড়ার ছন্দের জাদুতে, ছবির কল্পনায় এক অপরূপ স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হয়ে অপার আনন্দলাভ করে। তাই ছোটরা ছড়া শিখতে এত ভালবাসে। ছড়া শেখাবার সময় কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে ; যথা—

(১) ছড়ার বিষয়বস্তু বর্ণনা করে এক বা একাধিক ছবি থাকবে। ঐ ছবি দেখিয়ে, ছবিতে কি হচ্ছে, তার একটা ধারণা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছোটদের দিতে হবে।

(২) ছড়া নির্বাচনের সময়ে শিশুর বয়সের ক্রম স্মরণ রেখে ক্রমশঃ সহজ থেকে জটিলে যেতে হবে।

(৩) সম্ভব হলে, দুই বা চার লাইনের সমস্ত ছড়াটি বার বার বলতে হবে। একই শব্দ বা একই পংক্তির পুনরাবৃত্তি অমনোবৈজ্ঞানিক।

(৪) শিক্ষিকার আবৃত্তি স্পষ্ট ও গলার স্বর সুন্দর হতে হবে। ছড়ার তাল, লয় ও ছন্দ যেন ঠিক থাকে, আর ছড়া আবৃত্তি কালে ছড়ার যথাযথ ভাবটি যাতে প্রকাশ পায়, তা দেখতে হবে।

(৫) শিক্ষিকার আবৃত্তি শুনে প্রথমে শিশুরা সমবেতভাবে আবৃত্তি করবে।

(৬) পরে শিক্ষিকা প্রত্যেক শিশুকে দিয়ে আলাদা করে আবৃত্তি করাবেন; তাদের উচ্চারণের বিকৃতি অথবা অসম্পূর্ণতা দূর করাবেন।

(৭) সম্ভব হলে, শিশুরা ছড়াটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে অভিনয় করবে।

ছড়ার প্রকারভেদ ঃ ছড়াগুলোকে নিম্নলিখিত আটটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া, (২) খোকা-খুকুর স্তব সম্বলিত ছড়া, (৩) প্রাকৃতিক শোভা সম্পর্কে ছড়া, (৪) খেলার ছড়া, (৫) পাখি জন্তু জানোয়ার সম্পর্কিত ছড়া, (৬) পারিপার্শ্বিক লোক সামাজিক প্রথা ও নানা অভিজ্ঞতার ছড়া, (৭) গুনতি ছড়া এবং (৮) মজার কল্পনা উদ্দীপক ছড়া।

(১) **ঘুমপাড়ানী গান ঃ** ছোট শিশু ঘুমে ঢলে পড়ার আগে মাকে খোঁজে; মা বা মাতৃকল্পা কারো মুখে সে ঘুমপাড়ানী ছড়া বা গান শোনে—পরম তৃপ্তির আবেশে তার চোখ দুটি বুজে আসে। আবার প্রাণচঞ্চল শিশুর দৌরাত্ম্যপনায় যখন মায়েরা অধীর হয়ে ওঠেন—খোকার চোখে কেন যে ঘুম নেই—ঘুমপাড়ানী মাসি বা পিসি এসে দয়া করে যদি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারেন, তার জন্যে গান—

> ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস।
> খাট নাই, পালঙ্ক নাই, খোকার চোখে বস।
> শান বাঁধানো ঘাট দেব, বেসম মেখে নেও
> শীতল পাটি পেতে দেব শুয়ে ঘুম যেও।

দুরন্ত শিশুকে মা ক্ষণিকের জন্য হলেও মাসি পিসির হাতে সঁপে দিতে চান; তাই তো বাড়িতে আসতে তাদের সাধ্যসাধনা করছেন; কিন্তু কি দিয়ে মা তাদের অভ্যর্থনা করবেন? কোথায় তাদের বসাবেন?—খোকার চোখই হল তাদের বসার প্রকৃষ্ট জায়গা। তাই মা খোকার চোখে হাত বুলিয়ে মাসি পিসির

বসার জায়গাটি দেখিয়ে তার চোখ বোজাবার প্রচেষ্টা করেন। গরম দেশে শান-বাঁধানো ঘাট—ভাল করে স্নান করা—শীতল পাটিতে শোওয়া—এ সবই একটা স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা পরিবেশের সৃষ্টি করে, যে পরিবেশে ঘুম আসা স্বাভাবিক !

আর একটি ঘুমপাড়ানী ছড়া—

আয় ঘুম, আয় ঘুম বাগদী পাড়া দিয়ে,
বাগদীদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে।

কত সহজ কথা, কত সহজ ছন্দ! ভাষার মায়াজাল রচনা করার বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোনও চেষ্টা নেই তবু "ছবিগুলি একটা রেখা—একটি কথার ছবি।" একটিমাত্র ঘর্ষণে দেশলাই যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি একটি কথার টানে শিশুর মনে একটি সমগ্র চিত্র এক নিমেষেই জেগে ওঠে। বাগদীপাড়া কোথায়, সে নিয়ে শিশুর মনে কোন প্রশ্ন জাগে না, কিন্তু সেখানে যে ছেলেটি জাল মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে এক কোণে পড়ে পড়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে—সেই ঘুমের ছবিটিই শিশুর মনে জেগে ওঠে। ঘুমিয়ে পড়ে সে বাগদী ছেলের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়।

(২) **খোকা খুকুর স্তব সম্বলিত ছড়া**ঃ মায়ের কাছে খোকা-খুকুরা শিশু-দেবতার প্রতীক, কারণ যেখানে মানুষের সুগভীর স্নেহ ও অকৃত্রিম প্রীতি, সেখানেই তার দেবপূজা। শিশুরা প্রত্যেকেই তাদের মায়ের কাছে 'রাজার রাজা,' 'সাতরাজার ধন এক মাণিক' বা 'আকাশের চাঁদ'-এর সদৃশ্য। খোকার অভাবে মা আগুনে পুড়ে মরতে পারেন ; তাই স্নেহের বাৎসল্য রসে রঞ্জিত ছড়ার কতই না প্রাচুর্য আমরা দেখতে পাই। যেমন—

"ধন, ধন, ধন, বাড়িতে ফুলের বন ;
এ ধন যার ঘরে নাই, তার কিসের জীবন ?
তারা কিসের গরব করে, আগুনে পুড়ে কেন না মরে ?"

অথবা

"খোকন আমার সোনা,
সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা।
তোমরা কেউ করো না মানা।"

অথবা

"আয় আয় চাঁদমামা, টিপ দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ, টিপ দিয়ে যা।

মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব, সোনার থালে ভাত দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ, টিপ দিয়ে যা।"

মায়ের স্নেহের দৃষ্টিতে খোকন চাঁদেরই মত মনোহর। মাটির এই চাঁদকে খুশী করতে মা খোকনের বন্ধু আকাশের চাঁদকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ; তাকে মাছের মুড়ো, দুধের বাটি, সোনার থালা ইত্যাদির প্রলোভন দেখাচ্ছেন, যেন সে তার আকাশ-বাড়ি ছেড়ে এসে খোকনের সঙ্গে খেলা করে।

মায়ের প্রাণের দুলাল খোকন যে রাজারও রাজা। তাকে কি শুধু ছিটের কাপড় দিয়ে সাজানো চলে? তার জন্য চাই লক্ষ টাকা দামের পোশাক ও সোনার চাদর। নইলে যে মায়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। তাই তো মায়ের মুখে শুনি—

"খোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে,—
লক্ষ টাকার মলমলি থান, সোনার চাদর গায়ে।"

(৩) **প্রাকৃতিক শোভা সম্পর্কে ছড়া :** ছোটদের উৎসুক মন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক, তাই আশেপাশের ফুলফল, গাছপালা, রোদবৃষ্টি সবই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে। বৃষ্টি পড়লে ছোটরা আনন্দে নেচে ওঠে—আর বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে—

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে,—ধান দেব মেপে"—।

বৃষ্টির নানা সুবিধে-অসুবিধে, এসবও ছড়ায় দেখা যায়—

"ঝপ ঝপ ঝপ বৃষ্টি পড়ে নরম হলো মাটি।
পায়ের কাপড় হেঁটোয় তুলে, ডিঙি মেরে হাঁটি॥"

বেশী বৃষ্টি হলে শিশুদের অসুবিধেও হয়—ঘরে আবদ্ধ হয়ে শিশুরা বিরক্ত হয় ; তাই ছড়াতে বৃষ্টি বন্ধ হবার অনুরোধও আছে—

"লেবু পাতা করমচা,
ওরে বৃষ্টি থেমে যা।'

সবুজ গাছপালা—লাল, হলুদ ফুল—এ সবার সঙ্গে শিশুর মিতালী ; তাই ছড়ায় শুনতে পাই—

"সবুজ বরণ গাছ পাতা, লাল শিমূল ফুল।
হলুদ বরণ পাকা কলা, কালো মাথার চুল॥"

অথবা

"জাদু, এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ !
চার কালো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ ॥
কাক কালো কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ ।
তাহার অধিক কালো কন্যে, তোমার মাথার কেশ ॥"

এতে নানা প্রাকৃতিক জিনিস ও বিভিন্ন রং-এর সঙ্গে শিশু সহজেই হয় পরিচিত ।

প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আকাশের ঘন মেঘ ও বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে বোনটির মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক !

"ওপারেতে কালো রং, বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম্ ।
এপারেতে লঙ্কা গাছটি লাল টুকটুক করে ।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥"

(৪) **খেলার ছড়া ঃ** ছোটরা খেলতে ভালবাসে। খেলার সময় তারা নিজেরাই রেলগাড়ি, মোটর, নৌকো, বা জাহাজ হয়ে যেতে পারে। কল্পনায় তারা কি-ই-বা না হতে পারে ? নিজেরা তারা সৈন্য হয়ে মার্চ করে, ঢুলি হয়ে ঢোল বাজায়, পানের খিলি কিনে খায়—আরও কত কি করে ! যেমন—

"আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম সাজে,
ঢাল, মৃদঙ্গ ঘাঘর বাজে ।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলী,
ঢুলী গেল সেই কমলাপুরী ।
কমলাপুরী টিয়েটা
সূর্যি মামার বিয়েটা
আয় লবঙ্গ হাটে যাই,
পানের খিলি কিনে খাই—॥" ইত্যাদি—

এখানে শিশুরা অগ্রবর্তী, পার্শ্ববর্তী ও অশ্বারোহী সৈন্যের ভূমিকা নিয়ে অভিযান চালাবার কল্পনা করছে ; তাদের যাত্রার সঙ্গে ঢোল মৃদঙ্গ ও ঘুঙুর বাজতে থাকবে। কমলাপুরীতে গিয়ে সৈন্যদল থামবে,—সেখানে সূর্যিমামার বিয়ে। অপেক্ষাকৃত ছোটরা এতটা কল্পনা করতে পারে না। তারা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে এ খেলা খেলে, আর ছড়ার ছন্দের ঝংকারে আনন্দিত হয়।

অথবা

"আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি,
যত্ন মাস্টার শ্বশুর বাড়ি।
রেল কাম ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম ॥"

রেলগাড়ির মত হয়ে পরস্পরকে ধরে অগ্রসর হতে হতে শিশুরা এ ছড়াটি বলে—আর শেষ পংক্তিটি আবৃত্তি করার সময় পা পিছলে পড়ে যাবার ভান করে বসে পড়ে।

ফুটবল খেলায় ছোটদের খুব আনন্দ ; তাই তো ছড়ায় আছে—

"চল চল খেলি চল, ফুটবল সকলে।
বুট, শার্ট, হাফ প্যাণ্ট, বল নিয়ে বগলে ॥
ধাঁই করে মারি বল, ওই বুঝি হয় গোল—
চারিদিকে ঘন ঘন হাত তালি জয়রোল।"

(৫) **পাখি, জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কিত ছড়া ঃ** পশু পাখি সম্বন্ধে শিশুর অসীম কৌতূহল। এদের চলাফেরা, খাওয়া, ব্যবহার—সব কিছুই শিশু গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে—এদের সঙ্গে মিতালী পাতাতে চায়। যেমন—

"তাঁতীর বাড়ি ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায়, গান গায়,—তাই রে নাই রে না ॥"

ছোট শিশুর কাছে ব্যাঙের ছানার অস্তিত্ব এবং মনের সুখে তার গান গাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ; তাই তারাও এ-ছড়াটি বলতে ভালবাসে।

'বক মামাকে' শিশু জলের ধারে এক পা তুলে বসে থাকতে দেখেছে। তাই সে বলে—

"বক মামা, বক মামা, এক পায়ে দাঁড়িয়ে।
ঝুপ করে মাছ খাও, কাঁটা নাহি ছাড়িয়ে ॥
তারপর উড়ে যাও বাঁশ গাছের ঝাড়েতে ;
ভোর হলে ফের নাব মাছ খেতে জলেতে ॥"

চিড়িয়াখানায় শিশু, জিরাফ দেখেছে, তাই সে জিরাফের ছড়া শেখে—

"বাসরে সে কি লম্বা গলা, দেখলে হাসি পায়।
"জিরাফ' নামে বিখ্যাত সে পশুর দুনিয়ায় ॥

উঁচু গাছের মাথার থেকে,
ফল পাতা সে দেখবে চেখে,
ফাঁক করে তার লম্বা দু' পা নদীতে জল খায়।
আফ্রিকাতে বাস করে সে নিবিড় নিরালায় ॥"

(৬) **পারিপার্শ্বিক লোকজন, সামাজিক প্রথা বা নানা অভিজ্ঞতা বিষয়ক ছড়া ঃ** চারিপাশে লোকজনের সম্বন্ধে শিশুর প্রভূত আগ্রহ। ধোপা, পিয়ন, গয়লা-বৌ—সবার কথা নিয়েই তাই ছড়া রচিত হয়েছে।

"আমি গরীব গয়লা-বউ, বেড়াই দুধ নিয়ে।
মাখন, ছানা বেচি আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ॥
চিনিপাতা দৈ বসাই অতি চমৎকার।
সদাই আমি ব্যস্ত থাকি কাজে আপনার ॥"

পিয়নকে ছোটরা রোজই দেখে। কোথা থেকে সে এত চিঠি পায়, তা তাদের ধারণার অতীত। একটা চিঠি পাবার জন্য খোকাখুকুর কত আকুতি!

পিয়ন দাদা, পিয়ন দাদা, কোথায় তুমি যাও?
রোজ সকালে এত চিঠি কোথায় তুমি পাও?
এ সব চিঠির মধ্যে কি ভাই, আমার চিঠি নাই?
আমার নামে একটা চিঠি কেউ লেখে না ছাই।
কেউ লেখে না একটা চিঠি, ছোট্ট খোকা ভেবে,
নেহাত যদি নাই লেখে, আমায় একটা দেবে?
তোমার হাতে চিঠির থলে, দিচ্ছ বাড়ি বাড়ি।
আমায় যদি কিছু না দাও,—থাকবে জেনো আড়ি !!"

সামাজিক প্রথা অবলম্বনে কতই না ছড়া রচিত হয়েছে। অনভিজ্ঞা কিশোরী কন্যার শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দুঃখে সমগ্র পরিবারের একটি অশ্রুসজল করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

"আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবে শ্বশুর বাড়ি সংসার কাঁদায়ে।
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে—
সেই যে মা দুধ দিয়েছেন, গলা ভিজায়ে।

বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন আপিসে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন বাক্স সাজিয়ে ॥"

এতদিন যে কন্যা মা-বাবার স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিতা হচ্ছিল, আজ তাকে সেই আজন্ম-পরিচিত গৃহ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ; মা-বাবার চোখের জল তাই আজ আর বাধা মানছে না।

অপেক্ষাকৃত যারা বয়সে ছোট, তারাও সামাজিক প্রথার রীতিনীতি বুঝতে পারে, তাই তাদের জন্য ছড়া লেখা হয়েছে—

"দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনী ॥
বর আসবে এখুনি।
নিয়ে যাব তখুনি ॥"

বর এসে যে কন্যাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে—এই রীতিটির সহিত অল্প বয়সেই শিশু পরিচিত হয়।

শ্বশুর বাড়িতে কন্যাকে পাঠিয়েও মায়ের শান্তি নেই ; কন্যার শাশুড়ীকে তুষ্ট করারও প্রয়োজন। তাই দেখি—

"খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে কুনো বিড়াল, কোমর বেঁধেছে।
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, পথে জল খেতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ী ভোলাতে ॥"

বাঙালী সমাজের নানা ধরনের সামাজিক চিত্রও ছড়ায় পাওয়া যায়। যেমন—

"ও পারেতে তিল গাছটি তিল ঝুরঝুর করে।
তারি তলায় মা আমার লক্ষ্মী-প্রদীপ জ্বালে ॥
মা আমার জটাধারী ঘর নিকোচ্ছেন।
বাবা আমার বুড়ো শিব, নৌকা সাজাচ্ছেন।"

সমাজে অসমান বয়সের বা অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ের চিত্র—নদীমাতৃক বাংলা দেশের একটি খাঁটি ছবি এখানে ফুটে উঠেছে।

বাংলা দেশে কত পূজো-পার্বণ—কত মেলার ছড়াছড়ি। এই সব উপলক্ষেও নানা ছড়া রচিত হয়েছে। রথের মেলার জন্য ছেলেদের আকুতি এইরূপ—

"আমায় কিন্তু জাগিয়ে দিও, কালকে সকাল বেলা।
কালকে বড় মজার দিন,—কালকে রথের মেলা ॥"

অথবা "ও পাড়ার ময়রা বুড়ো
রথ করেছে তের চুড়ো,
তোরা রথ দেখতে যা,
তোদের হলুদ মাখা গা।
আমরা পয়সা কোথায় পাব,—আমরা উলটো রথে যাব।"

রথের দিন পয়সা না থাকলে ছেলেদের মজা হয় না ; আসল রথের দিন হাতে পয়সা না থাকায়, শিশু উলটো রথের দিন মেলায় যাবে ঠিক করেছে ; মনে মনে আশা,—সেদিন সে বাবা মার কাছ থেকে কিছু পয়সা পাবে।

(৭) **গুনতি ছড়া ঃ** ছড়ার সাহায্যে ভাবাজ্ঞান তো বৃদ্ধি হয়ই, পরন্তু অনেক ছড়ায় শিশু গুনতেও শেখে। যেমন—

"**এক দুই**,—শুই শুই।
চুপ কর খুকু তুই ॥
তিন চার,—খাবে মার।
দুষ্টুমি নয় আর ॥
পাঁচ ছয়,—আর নয়।
শুয়ে পড়, রাত হয় ॥
সাত আট,—পেতে খাট।
খোকা শোয় বড় লাট ॥
নয় দশ,—ব্যস ব্যস।
নাক ডাকে ভঁস ভঁস ॥"

আরও ছোটদের জন্য রচিত হয়েছে—

"এক দুই তিন, নাচি ধিন্ ধিন্।
চার পাঁচ ছয়, বসে পড়তে হয় ॥" ইত্যাদি

বলার সময় ছোটরা অঙ্গভঙ্গী করে ছড়ায় বর্ণিত কাজগুলি দেখাবে।

যোগেন্দ্রনাথ সরকারের "হাসিখুশী" বই-এ যোগ ও বিয়োগ শেখাবার দুইটি উৎকৃষ্ট ছড়া আছে। শিশুদের তখনও অঙ্ক করার বয়স হয়নি, কিন্তু এ-ধরনের ছড়া শিখে তারা অঙ্কের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। যেমন—

"মামাদের বাগানেতে চরিছে হরিণ,
দুই পশু, এক মাছ,—দুয়ে একে তিন।"

অথবা "হারাধনের **পাঁচটি** ছেলে, গেল বনের ধার।
একটি গেল বাঘের পেটে, রইল বাকি **চার**।"

(৮) **মজার ও কল্পনা উদ্দীপক ছড়া :** শিশু মন কল্পনাপ্রবণ ; তাই সে কল্পনার জাল বুনে অনায়াসেই বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন মিলিয়ে অদ্ভুত ছবি আঁকে। সময় সময় সে সব মজার ছবি আমাদের হাসির খোরাক যোগায়। এইসব মজার ছড়ার মাধ্যমে শিশু-মনে হাস্যরস উপভোগের প্রথম সূচনা দেখা দেয়। শিশু-মনের অন্যতম পরিচয় হচ্ছে "অসংলগ্নতা" ; এ-ধরনের ছড়ায় তারও সন্ধান মেলে। যেমন—

"হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং।
তারা হাট্টিমা টিম টিম॥"

হাট্টিমা টিম টিমের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। শিশুর কল্পনায়—দুটো খাড়া শিং নিয়ে তারা বেঁচে থাকে।

আবার "ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ীর পাঁচ বোন থাকে কালনায়।
শাড়িগুলি তারা উনুনে বিছায়, হাঁড়িগুলি রাখে আলনায়॥
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে, নিজে তারা থাকে লোহা-সিন্দুকে।
টাকা কড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে, রেখে দেয় খোলা জানালায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে, চুন দেয় তারা ডালনায়॥"

উনুনে শাড়ি রাখা, হাঁড়ি আলনায় রাখা—এসব ওলটপালট কাণ্ড শিশু-মনে প্রচুর হাসির খোরাক যোগায়।

অন্যত্র— "ছি ছি ছি, রাণী রাঁধতে শেখেনি।
শুক্তোনিতে ঝাল দিয়েছে,—
অম্বলেতে ঘি॥"

অসংলগ্ন শিশুমনের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে বহু ছড়া রচিত হয়েছে। এসব ছড়াতে ভাবের পরম্পর সম্বন্ধ নাই। যথা—

"আয়রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে

ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা॥"

এখানে প্রথমে টিয়ে পাখির কথা বলে ছেলেকে ভোলানো হচ্ছে। টিয়ে পাখির পাখা আছে—সে অনায়াসেই উড়তে পারে, কিন্তু এ-ছড়ায় টিয়ে পাখি আসছে নৌকো করে। এত সব জিনিস থাকতে বোয়াল মাছ এসে কেনই-বা নৌকো নিয়ে যাবে—ভোঁদড়ই-বা কোথা থেকে এসে, তা দেখে নাচতে থাকবে—এ আমাদের বয়স্কদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু এই ছড়াটি অসংলগ্ন হলেও, ছোটদের খুব প্রিয়।

অথবা "টিয়ের মার বিয়ে,
লাল গামছা দিয়ে।
অশথের পাতা ধনে,
গৌরী বেটী কনে।
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে, চড়ক ডাঙায় ঘর॥

এ সব ছড়ার বিষয়-বস্তু নিয়ে সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন শিশু-মনে জাগে না। টিয়ে সমাজে বিয়ের সময় লাল গামছা লাগে কিনা, অশথের (অশ্বত্থের) পাতা কি করে ধনে নামক মসলাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়—এ সবই শিশুর কাছে তুচ্ছ। সুমিষ্ট কণ্ঠে, ছন্দের তালে তালে এ প্রকারের অসংলগ্ন ও অসম্ভব ঘটনা যে সকল শিশুর কাছে উপস্থিত করা হয়, তা তারা বিশ্বাস বা সন্দেহ কিছুই করে না কিন্তু মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ এই সবের ছবি দেখে, আর উপভোগ করে।

ছড়াগুলি ভাল করে শিখতে পারলে, এদেরই সাহায্যে শিশুরা সহজে চিত্রাঙ্কন, গণনা, শরীর-চর্চা, ভাষাশিক্ষা, অভিনয় প্রভৃতি কাজে এগিয়ে যেতে আগ্রহবোধ করবে।

গল্প ও রূপকথা

"একটা গল্প বল"—শিশুর এই আবদার কে না শুনেছে? গল্প শুনতে চায় না, এমন শিশু দেখেছি বলে মনে হয় না। যিনি ভাল গল্প বলতে পারেন, তাঁর কাছে অতি দুরন্ত শিশুও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকে। তাই ছোটদের শিক্ষিকা ভগবানের কাছে এই বরই চান যে, যেন তিনি ছোটদের মন দিয়ে, তাদেরই

চোখ দিয়ে এই জগৎটাকে দেখতে পারেন, এবং নিজেও ঐ শিশুদেরই একজন হয়ে, তাদের মনের মত গল্প বলতে পারেন।

গল্প বলার কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়। আগেকার দিনে যখন সমাজ-ব্যবস্থা এতটা জটিল ছিল না, তখন সন্ধ্যেবেলায় মা বা ঠাকুরমার কাছে শুয়ে-বসে শিশু কত ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, সাত ভাই চম্পা, রাক্ষস-খোক্কস, রাজপুত্র-রাজকন্যা, সুয়োরানী-দুয়োরানীর গল্প শুনে গভীর তৃপ্তি লাভ করত। এখন সমাজ-ব্যবস্থা পালটাচ্ছে—একান্নভুক্ত পরিবার ভেঙে পড়ার দরুন পরিবারের ঠাকুমা, দিদিমার স্থানের অকুলান—আর জীবন-ধারণের তাগিদে মাকে থাকতে হয় ব্যস্ত। এক ঠাকুমা-দিদিমার মত "জাত শিল্পীর" অভাব—তার ওপর অভাব মায়ের সময়ের। আরও একটা অভাব দেখা যায়। আগেকার দিনের উপকথা রূপকথায় শিশু-মন ভাষার মধ্যে যে জাদুর পরশ পেত,—সেই ভাষা এখনকার শিক্ষিতা মা-দিদিমাদের লেখনী বা মুখ দিয়ে যেন বেরুতে চায় না; সেই ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত স্রোত আজ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে; এই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে আজকের দিনের শিশুরা প্রকৃতই অভাগা। তবুও বলব যে চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। খানিকটা ধৈর্য ধরলে এবং চেষ্টা করে নিজেকে তৈরী করে নিতে পারলে, বড়রা অনায়াসেই গল্প বলে শিশুদের মনোরঞ্জন করতে পারেন।

বর্ষার প্রাক্কালে যখন মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে অন্ধকার করে আসে, যখন অনবরত বৃষ্টি পড়ে পড়ে চারপাশ ঝাপসা হয়ে যায়, অথবা যখন দিনের আলো নিভে গিয়ে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে—আর তার ফলে শিশুরা যখন তাদের সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে খেলতে পারে না, তখনই গল্প বলার প্রকৃষ্টতম সময়। যিনি ভাল গল্প বলতে পারেন, তাঁর সুধাকণ্ঠের জাদুতে শিশুরা তখন মানসলোকে এই অন্ধকার বা বৃষ্টিভরা বিরক্তিকর সময় থেকে মুক্তি পেয়ে এক অপূর্ব আনন্দ-লোকে উপস্থিত হয়; সেখানে আকাশ মেঘমুক্ত ও সুনীল—সেখানে কত ফুল ফুটে আছে—সেখানে পাখিরা মনের আনন্দে সুমিষ্ট স্বরে গান গায়—গাছের পাতায় পাতায় হিল্লোল জাগে, আর এরই মধ্য দিয়ে গল্পের নায়ক রাক্ষস-খোক্কস বধের জন্য এগিয়ে চলে। অবশ্য গল্প শোনার খানিক পরেই শিশু আবার বাস্তব লোকে ফিরে আসে, কিন্তু তবু ক্ষণকালের জন্যও সে যে এই পরম রমণীয় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে পারে, তারই রেশ তার ছোট্ট হৃদয়টি পরিপূর্ণ করে রাখে।

প্রসঙ্গত বলা চলে যে উপন্যাস ও রূপকথা—এই দুই-ই হচ্ছে আখ্যানাশ্রয়ী

রচনা। উভয়কেই বাস্তবের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করতে হয়। তবে উপন্যাসকে থাকতে হয় বাস্তবের বেড়া দেওয়া গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ—রূপকথার বেলায় তা হয় না। রূপকথার মূল থাকে বাস্তবের মাটিতে—কিন্তু সে ফুল ফোটায় আকাশে। তাই রূপকথা বাস্তবের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে এমন এক মায়াময় বাস্তব-কল্প পরিবেশ রচনা করে, যেখানে বাস্তবের বাঁধন-না-মানা শিশু ও কিশোর-মনের অবাধ সঞ্চরণের পথ অবারিত। কিছু বাস্তব আর কিছু স্বপ্ন—এই দুয়ে মিলেই রূপকথার আঙ্গিক গড়ে ওঠে।

উপকথা, রূপকথা প্রভৃতিতে এ-ধরনের স্বপ্নময়তার প্রাচুর্য আছে বলে মণ্টেসরী ছোটদের এ-জাতীয় গল্প বলতে বারণ করেছেন। তাঁর মতে—যা কিছু অলীক, তা থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে। এই ধরনের গল্পে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ—বাস্তবে ও অলীকে ভেজাল। এতে পরী বা বামন এসে হঠাৎ জাদুমন্ত্রে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়ঃ এতে শিশুকে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কোনরকম চেষ্টা করবার প্রেরণা যোগায় না। তা ছাড়া এসব গল্পের বিমাতার নিষ্ঠুরতা, কাকা বা জ্যেঠার বঞ্চনা—অসহায় শিশু-মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে তাদের অসুখী করে।

মণ্টেসরীর এই মন্তব্য আংশিকভাবে হয়তো সত্য, কিন্তু তাঁর এই নীতিকে আমরা সমগ্রভাবে সমর্থন করতে পারি না। কারণ এইসব গল্পে অবান্তর বিষয় পরিত্যক্ত হয়ে, শিশু-মানসে নায়ক বা নায়িকার গুণাবলীই বিশেষভাবে জেগে থাকে, কারণ নায়ক এখানে সাহসী ও বিনীত। সে মোটেই স্বার্থপর নয়। যারা বিপদে পড়েছে, খেতে পাচ্ছে না বা শীতে কষ্ট পাচ্ছে, অথবা যে গ্রামবাসীর মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে—নায়ক তাদের সকলের প্রতিই সহানুভূতিশীল। এই নায়কের আর একটি বিশেষ গুণ দেখা যায় ; সেটি হল, সে সকল ইতর প্রাণীরই বন্ধু—কুকুর, শেয়াল, ইঁদুর কাউকেই সে অবহেলা করে না। গল্পের নায়ক রাজপুত্রকে বহু পরিশ্রম করে, অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে, নানা বিপদ-আপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবেই জয়ী হতে হয়। নায়কের এই বীরত্ব, দুঃখ সইবার ক্ষমতা, প্রফুল্ল মুখ, তার দয়া ও সহানুভূতি—এই গুণগুলি শিশু-চিত্তের অবচেতনে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। যেসব পরীর গল্পে অত্যধিক বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার কথা আছে, একেবারে নিতান্তই ছোট শিশুদের সেগুলি না বলে, অন্য গল্প অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উপকথা, রূপকথা ও নানা ধরনের গল্প একেবারে ছোট শিশু থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের বলা চলে। একেবারে ছোটদের

জন্য যে সব গল্প বাছতে হবে, তার কয়েকটি বিশেষত্ব থাকবে। যথা—(১) গল্প-গুলি ছোট হবে, (২) গল্পের কাঠামো সরল হবে, (৩) গল্পে ঘটনা কম থাকবে, (৪) প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি থাকবে, (৫) ভাষায় ছড়া বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি থাকবে, (৬) সময় যেন বেশী না লাগে,—এইগুলির দিকে নজর রাখতে হবে।

ছোটদের এ-ধরনের গল্প বলা ছাড়া, কিছু কিছু বাস্তব ঘটনার গল্প—যথা, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে গল্প অথবা কোনও দেশপ্রেমিক বা মহাপুরুষের ছেলেবেলাকার কোনও বিশেষ কাহিনীকে ছোট করে গল্পাকারে—বলা যেতে পারে। এসব কাহিনী শুনে শিশু-মনে সাহসের কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জাগবে—তাদের অন্তরে মহৎ আদর্শের বীজ রোপিত হবে, অর্থাৎ তাদের মনে **মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা** জাগবে।

ভাল গল্পের স্বরূপ

কতকগুলি গুণ না থাকলে সত্যিকারের ভাল গল্প হয় না। ভাল গল্পের এই গুণগুলি থাকা চাই—

(ক) গল্পের আঙ্গিক সহজ হবে।

(খ) তার প্রকাশভঙ্গী সরল অথচ নাটকোচিত হবে।

(গ) গল্প পরিণতির দিকে সাবলীলভাবে এগিয়ে যাবে।

(ঘ) গল্পের উপাদানের মধ্যে থাকবে এমন কিছুটা যা শিশুর পরিচিত (শিশু তাহলে গল্পকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে), আর কিছু অপরিচিত ও রহস্যময় উপাদান (তাতে শিশুর কল্পনার বিকাশ ঘটবে ; শিশু "কি হয়, কি হয়"—এই মুহূর্তটির জন্য আনন্দের সঙ্গে প্রতীক্ষা করবে)।

(ঙ) গল্পে নানা কাজ ও অভিযান (adventure)-এর বিবরণ থাকবে।

(চ) ভাষা চিত্রধর্মী হবে।

(ছ) ভাষা সরল, আঞ্চলিক শব্দবর্জিত ও জনপ্রিয়বহুল হবে এবং ইন্দ্রিয়ানু-ভূতি ও আবেগ—এই উভয়কে আকর্ষণ করার উপযোগী হবে।

(জ) গল্পে কিছু কিছু ছন্দোবদ্ধ পদ থাকবে ও প্রত্যক্ষ উক্তি থাকবে।

(ঝ) আলাদা করে নীতি উপদেশ দেওয়া চলবে না।

উপকথার রূপকথার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে এরা

Specific নয়। অর্থাৎ "এক যে ছিল রাজা"—এর মধ্যে সে কোন্ দেশের রাজা, তার ভৌগোলিক বিবরণ কি, রাজার নাম কি, এসব বলার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এসব গল্প সচরাচর মিলন-ধর্মী, ট্র্যাজেডি নয়। যে দোষ করে অথবা অপরকে বঞ্চনা করে ভোগ করতে চায় (যেমন সুয়োরানী), পরিণামে তার পরাজয় হয়। আর যে বঞ্চিত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে (যেমন দুয়োরানী) গল্পের শেষে দেখি, হয় তিনি হয়েছেন রাজমাতা, নয়তো পাটরানী। তাই তো গল্প শেষ হয় এই দিয়ে······"তারা সকলে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল।" এই সুখের ও পরিতৃপ্তির রেশটি শিশুর ছোট্ট অন্তরটিতে অনেকক্ষণ ধরে অনুরণিত হতে থাকে। গল্প বলার সময় শ্রেণীবদ্ধভাবে শিশুদের বসিয়ে দিলে, শিক্ষিকা ঠিকমত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন। বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা গল্প শোনার সময় শিশুরা যেমন ঠাকুমা, দিদিমার কোল ঘেঁষে বসে, তেমনি করে শিক্ষিকার কাছে এসে শিশুরা বসবে—শ্রেণীকক্ষের মত সারি সারি হয়ে বসবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে শিক্ষিকা সকল শিশুরই মুখ দেখতে পান। এক কথায় একটা মজলিশী আসরের আবহাওয়াই হচ্ছে গল্প বলার উপযুক্ত পরিবেশ।

শিশুদের জন্য বিশিষ্ট গল্পগুলিকে এইভাবে ভাগ করা চলে—

(ক) উপকথা, রূপকথা, পৌরাণিক ও পরীর গল্প ;

(খ) জীবজন্তু বা পশুপাখিদের গল্প, তাতে তাদের পারিবারিক জীবনেরও আভাস থাকবে ;

(গ) মজার গল্প ;

(ঘ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গল্প ;

(ঙ) পাখি, ফুল, ঋতু বা উৎসবের জন্ম ও উৎসব সংক্রান্ত গল্প ;

(চ) সত্যিকার জীবন ও ইতিহাস থেকে নেওয়া কোন মানুষের সাহসিকতা, বীরত্ব বা মহত্বের গল্প।

একেবারে শেষের দুই ধরনের গল্প "জাত শিল্পী" না হলে, একান্ত ছোটদের উপযোগী করে বলার কাজটি কিছু কঠিন হতে পারে ; অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে-মেয়েরা এই ধরনের গল্প আগ্রহ সহকারেই শোনে।

আগেই বলেছি, "এক যে ছিল রাজা"—সাধারণত এই দিয়েই আমাদের দেশের রূপকথার শুরু। সে কোন্ দেশের রাজা, অথবা রাজার নাম কি—

তা শিশু জানতেও চায় না। রাজার কোথাও এক রানী, কোথাও সাত রানী, আবার কোথাও-বা মাত্র দুটি রানী—সুয়ো আর দুয়ো। 'এক যে রাজা' শোনামাত্রই শিশুর কল্পনা করে নেয়, সে নিজেই রাজা ;—তার কত হাতি, ঘোড়া, লোক লশকর, সেপাই সান্ত্রী। রাজার **এক রানী** শুনলে শিশুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—কিন্তু সুয়ো ও দুয়ো শুনলেই শিশুর ভাবনা হয়। সুয়োর কত কি থাকে—তার আছে হীরের বালা, মাণিকের চুড়ি, সোনার মুকুট, মুক্তোর হার,—আর আছে আকাশের মত নীল, বাতাসের মত ফুরফুরে, জলের মত চিকণ মেঘডম্বর শাড়ি, সাত মহলা বাড়ি, আর সাত সাতশ দাসী। সেই সুয়োরানীর "সোনার খাটে গা'—রূপোর খাটে পা।" অন্যদিকে—বেচারী দুয়োর যে আর কষ্টের অবধি নেই ; তার একবেলা খাওয়া জোটে, অন্যবেলা উপোস—রাজবাড়ির ঝলমলে প্রাসাদ ছেড়ে তাকে রাত কাটাতে হয় ভাঙা কুঁড়ে ঘরে, আর দিন যাপন করতে হয় "ঘুঁটে কুড়ানী দাসী" হয়ে। শিশুর কোমল কচি মনে স্বভাবতঃই এই দুয়োরানীর জন্য সমবেদনা জাগে। রূপকথায় আরও থাকে তেপান্তরের মাঠ পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-খোক্কসের দেশ, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ শব্দ, আর অপরূপ স্বপ্নময় দেশে বন্দিনী ঘুমন্ত রাজকন্যা! সোনার কাঠি, রুপোর কাঠির কথা শিশুরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে—কি করে রুপোর কাঠির স্পর্শে রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়েন—আবার সোনার কাঠি দিয়ে কি করে রাজকন্যার ঘুম ভাঙে! তরুণ রাজকুমার কি করে তাঁর সাহস, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহৃদয়তার বলে সব বাধাবিঘ্নকে কাটিয়ে—জিয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি নিয়ে রাক্ষসদের প্রাণ-প্রতীক ভোমরাকে মেরে ফেলে, রাক্ষস বংশ নির্মূল করে, বন্দিনী, সুন্দরী, সুশীলা রাজকন্যাকে উদ্ধার করে দেশে ফিরে আসেন—কি করে রাজকুমারের দুঃখিনী মায়ের সব দুঃখের অবসান হয়—এইসব রোমাঞ্চকর কাহিনী শিশুরা আপন-ভোলা হয়ে শোনে এবং মনে মনে এইসব চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

এরপর আসে ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, "টুনটুনির" বই—এইসব বই-এ পশুপক্ষীর পারিবারিক জীবন, তাদের বন্ধু বা শত্রুর প্রতি ব্যবহার, তাদের দয়া-মায়া, উপস্থিত-বুদ্ধি—এ সব-কিছুরই পরিচয় রয়েছে ; এসব গল্পের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এখানে পশু-পাখিরা কথা বলে এবং মানুষের মত ব্যবহার করে। তাদেরও রাজা আছে, মন্ত্রী আছে, প্রজা সাধারণ আছে—

তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা যায়, আর তার পূরণও করা হয়। "নেকড়ে ও ছাগলছানা" গল্পে ছাগলদের পারিবারিক জীবনের একটি চমৎকার রেখাচিত্র পাওয়া যায়; সেখানে মা-ছাগল বাজার করতে বেরুবার আগে বাচ্চা ছাগলদের দরজা বন্ধ করে দিতে ও সাবধানে থাকতে বলে; তারা যেন নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে লক্ষ্মী হয়ে থাকে—মা-ছাগল সেই উপদেশও দেয়। 'তিন ভালুক' গল্পটিতেও পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই: বাবা-ভালুক, মা-ভালুক ও খোকা-ভালুক আর তাদের ঘরবাড়ি, খাওয়া-দাওয়া ও বিছানাপত্রকে কেন্দ্র করে এই চমৎকার গল্পটি গড়ে উঠেছে। ইতর প্রাণীরও বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ, তা ঈশপের গল্পের 'কাকের গল্প', 'বেজীর গল্প' ইত্যাদি পড়লেই বোঝা যায়। সেখানে ক্ষমতায় ক্ষুদ্র হয়েও, বুদ্ধির বলে মা ও বাবা-কাকা কি করে তাদের পরম শত্রু ভীষণ সাপকে ধ্বংস করতে পেরেছিল—কি করে বামুনের পোষা বেজী, মনিবের একমাত্র সন্তানকে নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেছিল—এসব কাহিনী অতি মনোরমভাবে বর্ণিত হয়েছে। এইসব মনজয়-করা গল্পে শিশুরা ব্যবহারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পারে, এবং গল্পচ্ছলে নানা নীতিকে মনের গভীরে অনায়াসেই স্থান দেয়।

ছোটদের জন্য সুখলতা রাও-এর "গল্প আর গল্প"—এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "টুনটুনির বই" রচনা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে দুখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

গল্প বলার উদ্দেশ্য

গল্প, উপকথা, বলার মুখ্য **উদ্দেশ্য** হল শিশুদের আনন্দ দান করা। এতে শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, আর স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভাল গল্প ঠিকমত করে শোনাতে পারলে, শিশু-মনে সাহিত্যপ্রীতির বীজ উপ্ত হয়। গল্প শোনার মাধ্যমে শিশুর অনেক অবরুদ্ধ আবেগ, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। এছাড়া ছোটদের ভাষা শিক্ষা ও আত্মপ্রকাশের কাজটি অতি সহজেই এই গল্প বলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ আমার আড়াই বৎসরের এক আত্মীয়-শিশু, যার মা বিদেশিনী, আমাকে যে গল্পটি বলেছিল তা হুবহু উদ্ধৃত করলাম—

"And then, then the lion came, tiger came, elephant came, rhino came, doggy came—all came and started fighting.

And then, they all **died and lived happily ever after.**" গল্পটি শুনে আশপাশে যাঁরা ছিলেন, সবাই অবশ্যি হেসে ফেলেছিলেন; কিন্তু শিশু-মনের বিশেষত্বই যে এখানে। সে চিড়িয়াখানা দেখেছে, পশুপাখির নাম জেনেছে, আর মায়ের কাছে শোনা গল্পের "lived happily ever after-এর সুরও তার মনে জেগে আছে। মরে গিয়ে আবার বেঁচে থাকা যায় কিনা—ইহলোক, পরলোকের মধ্যে সীমারেখা কোথায়—এসব কথা শিশু-মনে উদিত হয় না। তার সবই এ-ধরনের ওলটপালট কাণ্ড—কেননা, সে যে শিশু ভোলানাথ!

অভিনয়

শিশুরা গল্প শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পছন্দ করে সেই শোনা গল্পকে কথোপকথনের, নাচে ও গানে রূপায়িত করতে। এই প্রকাশের তাগিদ শিশুর জন্মগত; তাই গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি—অভিনয়।

নিজের মনের ভাব শুধুমাত্র কথায় ব্যক্ত করে শিশুর তৃপ্তি হয় না। তাই তো ছোট শিশুকে দেখি ছড়া বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে স্বীয় মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলছে। শিশু আবৃত্তি করে—

"কাঠবেড়ালি ভাই,—
একটুখানি পেয়ারা ফেলে, দাও না মোরে খাই।
লেজ দুলিয়ে সারা দুপুর,
গাছের ডালে খুটুর খুটুর,
দুই চোখে কি দুষ্টু বেড়াল, ঘুমটি তোমার নাই?"

সঙ্গে সঙ্গে সে কাঠবেড়ালির কাছে পেয়ারা চাওয়ার ভঙ্গী করে হাত পাতে; তারপর পেছনে হাত নিয়ে, হাতটাকে লেজের মত করে দোলায়; খুটুর খুটুর শব্দ বোঝাবার জন্য হাত দুটোকে মুঠো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়; দুটি চোখে ঘুম নেই দেখাবার জন্য নিজের উজ্জ্বল চোখ দুটিতে হাত বুলায় ও সেই সঙ্গে মাথা নেড়ে, ঘুম নেই এই ভাবটিও প্রকাশ করে। শিশুর এই স্বাভাবিক প্রকাশ ভঙ্গীই তো অভিনয়।

ছড়া থেকে শুরু করে অভিনয় এগিয়ে চলে গল্পকে অবলম্বন করে। কোন্ গল্প অভিনয় করা হবে, তা শিশুরা বাছতে পারলেই ভাল হয়; নতুবা শিক্ষিকা তাদের একত্র করে, তাদের মতামত নেবেন।

অভিনয়ের গল্পের বিশেষত্ব ঃ শিক্ষিকা নিজে যখন ছোটদের অভিনয়ের জন্য গল্প বেছে নেবেন, তখন তাঁকে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ—

(ক) গল্পটি শিশুদের অভিনয়ের উপযোগী কি না ;

(খ) গল্পে প্রভূত পরিমাণে প্রত্যক্ষ উক্তি আছে কি না ;

(গ) নানা প্রকারের অঙ্গভঙ্গী করার এবং কাজ করার সুযোগ আছে কি না ;

(ঘ) অনেকের অংশ গ্রহণের উপযোগী চরিত্র আছে কি না।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ছোট শিশুদের অভিনয় বড়দের অভিনয়ের মত নিখুঁত হউক, এটা কখনই কাম্য নয়। অভিনয় যদি একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়, তবে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যাবে ; স্বাভাবিকতা হারিয়ে অভিনয় হয়ে উঠবে আড়ষ্ট।

অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা ঃ অভিনয়ে যে সাজ-পোশাক বা মুখোশ ইত্যাদির প্রয়োজন, তা শিশুদের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাদের দিয়ে রং ইত্যাদি দেওয়ালে, শিশুদের মধ্যে যে আনন্দময় প্রতিক্রিয়া ও সৃজনপ্রতিভা লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে তার মূল্য অসীম। শিশুরা নিজেরা যে মুখোশ বা সাজ-পোশাকের জন্য যে তীর, ধনুক, তরোয়াল ইত্যাদি করবে, তা বড়দের মাপ-কাঠিতে নিশ্চয়ই অচল, কিন্তু ছোটরা নিজেদের তৈরী এইসব জিনিস দিয়ে অভিনয় করে আনন্দ তো পায়ই, তাছাড়া এতে তাদের সৃজন-প্রতিভা ও বিকাশধর্ম চরিতার্থ হয়। শিশুরা যে অভিনয় করবে. তা শিশুবিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দেখানো দরকার। এতে সামাজিক গুণের বিকাশ ছাড়াও, স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষমতা—বলা কথাকে অঙ্গভঙ্গীতে সুস্পষ্ট করা বা মনের ভাবকে ফুটিয়ে তোলার কাজের সহায়তা হয়। অপরপক্ষে—যারা অভিনয় দেখে, তারা চুপ করে বসতে ও অন্যান্য শিশুর প্রশংসা করতে শেখে।

অভিনয় দ্বারা পড়ার প্রস্তুতির কাজটিও খুব ভালভাবে সম্পন্ন হয়। শিশুরা যখন অভিনয় করে, তখন গল্পের বলা বাক্যগুলি তাদের বলতে হয় ; বার বার এইভাবে বলার ফলে শিশু-মনে তা গেঁথে যায়। পরে শিশু যখন বই পড়তে শেখে, তখন ছাপার অক্ষরে ঐ একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি দেখে তার আনন্দের সীমা থাকে না। ছাপার বইতে একটা শব্দের পর অন্য কি শব্দ আসবে, শিশু তা আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যাশা করে—তার ফলে পাঠক্রিয়া শিশুর নিকট প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

পুতুল-নাচঃ প্রকারভেদ ও বিশেষত্ব

পুতুল-নাচও ছোটদের অভিব্যক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পুতুল-নাচে শিশুদের ভাষা শিক্ষার কাজে প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। বিশেষ করে যে শিশু লাজুক বা self-conscious, পুতুল-নাচের সময় তার ও শ্রোতার মাঝখানে একটা পর্দার আড়াল থাকে বলে, শিশুর পক্ষে বলার কাজটি অনেক সহজ হয়। সোজা সহজ কথায় প্রত্যক্ষ উক্তি পুতুল-নাচের পক্ষে আদর্শ। গল্পের বিষয়-বস্তু যেন গুরুগম্ভীর না হয়, তাও দেখতে হবে। অদ্ভুত, কিম্ভূতকিমাকার চরিত্র—হাসির খোরাক জোগায় এমন চরিত্রের বিচিত্র রূপায়ণ অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে শিশুরা সহজেই করতে পারে, আর ঐসব অদ্ভুত ভঙ্গী দেখে অন্য শিশুরাও প্রচুর আনন্দ পায়। একেবারে ছোট শিশুর পক্ষে প্রথমে stick puppet ও পরে glove puppet উপযোগী। Stick puppet-এ কোন জন্তু-জানোয়ার বা অদ্ভুত কোন লোকের ছবি এঁকে তার পেছনে কাঠি বেঁধে দিতে হয়। ছোটরা পর্দার পেছনে থেকে, সেই কাঠি নেড়ে চরিত্রগুলির রূপায়ণ করে ও কথা বলে। Glove puppet-এ যে চরিত্রকে দেখাতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন হয় শুধু একটা মুণ্ডু ও ধড়ের। শরীরের অন্যান্য অংশের প্রয়োজন হয় না। গলায় কুচি দিয়ে খুব শক্ত করে বেধে হাতওয়ালা একটা ঢিলে জামা পুতুলকে পরানো হয়। শিশুরা মাত্র তিনটে আঙ্গুল দিয়ে,—অর্থাৎ একটি পুতুলের মাথার ফাঁকে ও অন্য দুটি জামার দুই হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে—অনায়াসেই পুতুলের বিচিত্র ভঙ্গী দেখাতে পারে। String puppet—যা পেশাদার পুতুল-নাচিয়েরা দেখায়, তা নার্সারীর শিশুদের উপযোগী নয়। আরও বড় ধরনের না হলে. এই সব শিশুরা দড়ি দিয়ে পুতুল নাচাতে পারে না। এ ধরনের পুতুল-নাচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা নয়-দশ বৎসর বয়সে দেখিয়ে অন্যদের আনন্দ দিতে পারে।

পুতুল-নাচের ভেতর দিয়ে শিশুদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়—তারা পরিষ্কার উচ্চারণ করে কথা বলতে শেখে ; পুতুলের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর অভিনয় দেখে প্রাণ খুলে হাসতে পারে—আর লাভ করে প্রচুর আনন্দ। তাছাড়া পুতুল-নাচের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিকতার প্রসার ঘটে, এবং ধৈর্য, মনোযোগ ইত্যাদি গুণেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ছোটদের নাটকের নমুনা—(১) ছোট গোলাপ, (২) লালিমা।

আমাদের নার্সারীর বালক-বালিকারা যে নাটকগুলি সর্বদাই অভিনয় করে, তার থেকে তাদের প্রিয় দুটি নাটকের নমুনা এখানে দেওয়া হল। প্রথমটির নাম **ছোট গোলাপ**। রূপকথার 'ঘুমন্ত রাজকন্যা'র গল্পটি শিশুরা শুনেছে ; সেটি অবলম্বন করেই এই নাটিকা। রাজকন্যা গোলাপের মত সুন্দরী—তাই তার নাম—"ছোট গোলাপ"। নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্ছে—ছোট গোলাপ, রাজপুত্র, পরী, রাজপুত্র ও ছোট গোলাপের বন্ধুবর্গ। **শ্রেণীর সকলেই** এই নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আগাগোড়া নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে এর ভাববস্তু ফুটিয়ে তুলতে হবে। তিন থেকে সাড়ে তিন বৎসরের বাচ্চারা এটি অভিনয় করবে।

ছোট গোলাপ

(রাজকন্যার প্রবেশ ও নৃত্য)

শ্রেণীর বাচ্চাদের সমবেত গান—

"ছোট গোলাপ বড় সুন্দরী।
তার বাড়ি ছিল রাজবাড়ি ॥"

(পরীর হালকা পায়ে প্রবেশ ও নৃত্য)

"এক পরী তথায় আসিল।"

(পরী রাজকন্যাকে ছোঁবে ও রাজকন্যা ঘুমের ভান করবে)

"ছোট গোলাপ তখন ঘুমাল।" [পরীর প্রস্থান]

(রাজার ছেলের প্রবেশ ও বীরভাবে নৃত্য)

"এক রাজার ছেলে আসিল।"

(রাজপুত্র রাজকন্যাকে জাগাবে ও রাজকন্যা জেগে দাঁড়াবে)

"ছোট গোলাপ তখন জাগিল।"

(রাজকন্যা ও রাজপুত্রের নৃত্য)

"ছোট গোলাপ তখন নাচিল।"
তখন,—রাজার ছেলে নাচিল।"

(শ্রেণীর সকলের সমবেত নৃত্য)

"এখনই আমরা সবাই নাচিব।
এখন আমরা সবাই গাহিব।" [সকলের প্রস্থান]

নাচে, গানে, পরীর হালকা নৃত্য-ভঙ্গিমায়, রাজপুত্রের বীর পদক্ষেপে এ অভিনয়টি যে কত প্রাণবন্ত হতে পারে, তা যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না।

দ্বিতীয় নাটকটি ৪ থেকে ৫/৫½ বৎসরের শিশুদের উপযোগী। এর নাম **লালিমা**। Red Riding Hood গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্ছে—লালিমা, লালিমার মা, লালিমার বন্ধুরা, দিদিমা, খরগোশ, নেকড়ে বাঘ ও শিকারী।

লালিমা

প্রথম দৃশ্য

(লালিমার বন্ধুরা খেলছে)

প্রথম বন্ধু। কৈ,—লালিমা তো এখনও এল না।

দ্বিতীয় বন্ধু। ঐ যে লালিমা আসচে।

তৃতীয় বন্ধু। দেখ, দেখ—লালিমা আজও লাল জুতো আর লাল জামা পরেছে।

চতুর্থ বন্ধু। মাথায় আবার লাল ফিতেও বেঁধেছে।

লালিমা। আজ তোমরা খেলবে না ?

বন্ধুরা। না,—আজ আমরা নাচ গান করবো।

(সকলের গান ও নাচ)

"ফুলের পোশাক পরবো মোরা, সাজিয়ে দে মা ভাল করে।
নেচে নেচে করবো খেলা, পোশাক পরে বনের ধারে ॥
পরবো হাতে ফুলের বালা, পরবো গলায় ফুলের মালা।
ধরবো মাথায় ফুলের ডালা,—ফুল বিলাবো ঘরে ঘরে ॥"

(নেপথ্যে—'লালিমা, লালিমা' ডাক)

লালিমা। যাই, মা!

(লালিমার মায়ের প্রবেশ)

মা। লালিমা, তোমার দিদিমার অসুখ করেছে, দেখতে যাবে না ?

লালিমা। হ্যাঁ, মা যাব।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালিমা ও মা

(লালিমার হাতে সাজিতে ফল)

মা। লালিমা, ফলগুলি দিদিমাকে দিও। আর পথে খুব সাবধানে যাবে ;
—দেরি করবে না।

লালিমা। আচ্ছা, মা।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(খরগোশরা লাফাচ্ছে, খাচ্ছে, কান নাচাচ্ছে ; লালিমার প্রবেশ)

খরগোশরা। তুমি কে গো ?

লালিমা। আমি লালিমা।

খরগোশরা। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

লালিমা। দিদিমার অসুখ ; তাই দেখতে যাচ্ছি।

খরগোশরা। আমাদের সাথে একটু খেলা কর না ?

(সকলের গান ও নাচ)

"আমরা খরগোশ, দলে দলে বাস করি ঐ গাছের তলে।"
কড়াই শুঁটি আর কপি ক্ষেতে, লুটোপুটি খাই সবাই মেতে ॥"

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

(বনের পথে লালিমা একা যাচ্ছে)

নেকড়ে। হালুম, হালুম—তুমি কে ?

লা। আমি লালিমা।

নে। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

লা। দিদিমার অসুখ, তাই দেখতে যাচ্ছি।

[নেকড়ের ছুটে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

(দিদিমা শুয়ে, দরজার বাইরে ঠক ঠক শব্দ)

দিদিমা। কে ?

নেকড়ে। দিদিমা, আমি লালিমা, দরজা খোল।

দিদিমা। দরজা খোলাই আছে—তুমি ভেতরে এস।

(নেকড়ে ভেতরে আসতেই দিদিমার পলায়ন। নেকড়ে দিদিমা সেজে, দিদিমার বিছানায় শুয়ে থাকবে।)

(দরজার বাইরে ঠক ঠক শব্দ)

নেকড়ে। কে?

লালিমা। দিদিমা, আম লালিমা, দরজা খোল।

নেকড়ে। দরজা খোলাই আছে,—তুমি ভেতরে এস।

(ফলের সাজি হাতে লালিমার প্রবেশ)

লালিমা। দিদিমা, তোমার জন্য এইসব ফল এনেছি।

নেকড়ে। ঐখানে রেখে দাও। (লালিমা ফলের সাজি রাখবে)

(নেকড়ে-রূপী দিদিমার কাছে গিয়ে)

লালিমা। দিদিমা, তোমার চোখ এত বড় কেন?

নে। তোমার সুন্দর মুখটি দেখবো বলে।

লা। দিদিমা, তোমার কান দুটি এত বড় কেন?

নে। তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনবো বলে।

লা। দিদিমা, তোমার মুখটা এত বড় কেন?

নে। তোমাকে খাব বলে।

(নেকড়ে লাফিয়ে উঠবে,—লালিমা খুব চীৎকার করবে)

(শিকারীর প্রবেশ ও বন্দুক ছোঁড়া—এবং নেকড়ের পতন। অন্য দিক দিয়ে দিদিমার প্রবেশ।

দিদিমা। তুমি কে?

শি। আমি শিকারী।

দি। তুমি খুব ভাল লোক। নেকড়েকে মেরে খুব ভাল কাজ করেছো।

[শিকারীর প্রস্থান]

(দিদিমা লালিমাকে আদর করবে)

দি। আমার লালু, আমার নাতু, আহা,—বাছা আমার কতদূর থেকে এসেছে, কত ক্ষিধে পেয়েছে, এস, তোমাকে খেতে দি।

[সকলের প্রস্থান]

পড়ার জন্য প্রস্তুতি

প্রস্তুতির বিশেষ কর্মসূচী

পড়তে শেখা শিশুদের পক্ষে একটি জটিল ব্যাপার। ভাল করে বই পড়তে পারার আগে প্রতিটি শিশুকে কতকগুলি কঠিন কঠিন স্তর উত্তীর্ণ হতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে শিশুর প্রথম পদক্ষেপ ও প্রকৃত হাঁটতে পারার মধ্যে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন, অথবা যে সময়ের ব্যবধান লক্ষিত হয়, শিশুর কোনও বিক্ষিপ্ত অক্ষর চেনা এবং অবলীলাক্রমে কিছু পড়তে পারার মধ্যেও অনুরূপ ব্যবধান রয়েছে। কাজেই ছোট শিশুকে বই পড়ানো শুরু করার পূর্বে—তারা **পড়ার জন্য প্রস্তুত কিনা**, এটা জেনে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। অভিভাবকদের অনেকে হয়তো অবজ্ঞা ভরে বলবেন, "বই পড়তে শুরু করবে, তার আবার প্রস্তুতি কি? হাতেখড়ি ভাল দিন দেখেই হয়েছে—এবার তবে পড়ার পক্ষে বাধা কোথায়?" কিন্তু কার্যকালে দেখা যায়, বাধা সত্য সত্যই আছে। যে শিশু পড়ার জন্য প্রস্তুত নয়, তাকে যদি জোর করে বই পড়তে দেওয়া হয়, তবে সেটা শিক্ষকের দিক দিয়ে পণ্ডশ্রম, আর শিশুর পক্ষে অযথা সময় নাশের কারণ হয়।

অনেক দিনের চেষ্টার পর, হাঁটি হাঁটি পা পা করে টলে টলে, অনেকবার আছাড় খেয়ে, তবে শিশু হাঁটতে শেখে। প্রথম অর্থহীন কলকূজন থেকে শুরু করে, বা বা, বা বা, দা দা ইত্যাদি বলার প্রচেষ্টার আরও অনেক পরে শিশু পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারে। অনুরূপভাবে অনেক প্রচেষ্টা, অনেক সাধনার পর, তবেই শিশু কাগজে কি লেখা আছে (তা ছাপাই হোক আর হাতে লেখাই হোক), তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। পড়ার কাজে শিশু যাতে সহজেই সফলতা লাভ করতে পারে, তার জন্য পড়তে শেখার মৌল ভিত্তি কি, তা জানা দরকার; অর্থাৎ আমাদের দেখতে হবে যে, (১) শিশু মনোযোগ দিয়ে লেখা বা ছাপার অক্ষর **দেখতে পারে কিনা**, (২) শব্দের **আকৃতি মনে রাখতে পারে কিনা** এবং (৩) **উচ্চারিত শব্দের অর্থ বুঝতে পারে কিনা**। পড়তে শেখার আগে শিশুর এই মৌল ক্ষমতাগুলি অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।

জন্মের পর থেকে শিশু এ জগতের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ—এসব উপভোগ করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। ছোটবেলা থেকেই সে বুঝতে শিখেছে, কোন্‌টা কি

জিনিস তা বলতে পারছে, তাদের পরস্পর সম্পর্ক কি, সে সম্বন্ধেও তার খানিকটা ধারণা হয়েছে। সে আগে যা দেখেছে, কিন্তু বর্তমানে যা অনুপস্থিত সেই অনুপস্থিত জিনিসের দৃশ্যগত রূপটি (visual image) মনে করতে পারে। সে নূতন নূতন দৃশ্য-প্রতিমারও সৃষ্টি করতে পারে বাস্তবে যার কোনও অস্তিত্বই হয়তো নেই ; যেমন—"ডানাওয়ালা বেড়াল" বা "শিংওয়ালা মানুষ"। এ ধরনের নূতন নূতন image সৃষ্টি সে খুব সহজেই করতে পারে। একই সঙ্গে তার অন্যান্য বহু শক্তিরও বিকাশ হয়। সে শব্দ শুনতে পারে, কোন্‌টা কিসের শব্দ, মোটামুটি তা বুঝতে পারে, পুরানো শোনা শব্দের কথা স্মরণ করতে পারে এবং পারিপার্শ্বিকে হচ্ছে, এমন বহু শব্দ নিজেই করতে পারে। এই বাল্যকালেই শিশু একটি জিনিস ও তার বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে **যোগসূত্র** স্থাপন করতে পারে, এবং যে কোনও একটির উপস্থিতি তাকে অন্যটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বোলতা দেখলে শিশু তার বোঁ বোঁ শব্দের কথা মনে করে,—অথবা বোঁ বোঁ শব্দ শুনলে তার মনে হলদে, বাদামী রং-এর একটা প্রাণীর দৃশ্যরূপ জেগে ওঠে। অনুরূপভাবে রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ শুনলে, পুরো রেলগাড়ির ছবিটি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে—বা রেলগাড়ি দেখলে সে মনে মনে ঐ গাড়ির কি ধরনের বাঁশি বাজে—এই দুয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায়। তেমনি মেঘের গর্জনের সঙ্গে বৃষ্টিরও যে একটা সম্বন্ধ আছে, তা সে বুঝতে পারে। "হাম্বা", "প্যাক প্যাক", ভৌ ভৌ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যথাক্রমে গরু, হাঁস ও কুকুর বোঝায় ; পক্ষান্তরে ঐসব প্রাণী বোঝাতে সে পর্যায়ক্রমে উক্ত ধ্বনিবাচক শব্দগুলি ব্যবহার করে। যে শব্দ শিশুরা শোনে, তার অনুকরণ করে, এবং সে শব্দটি যে জিনিসের প্রতীক, তা বোঝাতে পারে। এ ব্যাপারে, বলা বাহুল্য, সব শিশুর সমান উন্নতি দেখা যায় না—পারিপার্শ্বিকের পার্থক্যের জন্য এর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

ছোট শিশু তার দৈনন্দিন জীবনে বই, খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন, কৌটা বা কাগজের বাক্সের ওপর লেখা সদা সর্বদাই দেখতে পায়। প্রথমে ঐসব হিজিবিজি দাগগুলি কি,—এ সম্বন্ধে তার মনে কৌতূহল হয় ; ক্রমে ক্রমে সে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে ঐসব দাগগুলির কোনও বিশেষ অর্থ আছে। রাস্তায় যেতে যেতে রঙীন বিজ্ঞাপন দেখে ছোট শিশু যখন জিজ্ঞেস করে, "এতে কি লেখা আছে ?" অথবা—"এটা আমাকে পড়ে দাও", তখন অনুভব করা যায় যে সে বুঝতে পারছে যে ঐ অর্থহীন হিজিবিজি দাগগুলি **ভাষারই প্রতিরূপ**। আমরা কে না

দেখেছি যে ছোট বাচ্চারা খবরের কাগজ নিয়ে হয়তো উলটো করে ধরেই পড়ার ভান করে, অথবা ছবি ও ছড়ার বই খুলে, ছবিটা দেখে হুবহু ছড়া বলে যায়—মাঝে মাঝে আঙ্গুল দিয়ে লেখাগুলিও দেখায়—যদিও তখন পর্যন্ত **তার অক্ষর পরিচয়ই হয়নি।** এসব থেকে বুঝতে পারা যায় যে পড়তে না পারলেও, পড়া জিনিসটি কি, সে সম্বন্ধে শিশুর কিঞ্চিৎ ধারণা আছে—কিন্তু কৌতুহল আছে আরও অনেক বেশী।

পড়ার প্রস্তুতির জন্য যে কর্মসূচী থাকবে, তা শিশুরা যাতে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পারে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কাজে সফলতা লাভ করলে তবেই আনন্দ হয়—তবেই শিশুরা কাজটি করতে উল্লসিত হয়। বড়দের বেলায়ও দেখা যায় যে, আমাদের যে কাজ করতে ভাল লাগে, আমরা সে কাজই করতে চাই ; আর যে কাজ আমরা ভাল করে করতে পারি, সে কাজ করতেই আমাদের ভাল লাগে। আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, শিশু যদি পড়তে পারার প্রথম প্রচেষ্টার সময় অকৃতকার্য হয়ে তিরস্কার লাভ করে, তবে তার ফল শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। সে তখন পড়া কাজটিকে "কঠিন", "ভাল লাগে না" বলে, এবং সমগ্র পাঠ কার্যটির প্রতি তার একটা **বিরূপ মনোভাবের** সৃষ্টি হয়। এই বিরূপ মনোভাব যতদিন সে বিদ্যালয়ে থাকে, ততদিনই বজায় থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু পড়ার প্রস্তুতির কাজে সফলতা লাভ করে, সে ক্রমে ক্রমে পাঠ কার্যটিতে আগ্রহী হয়ে, আরও বেশী করে ঐ কাজটি করতে হয় ;—পরের দিন সে কি পড়বে, এই ভেবে শেখার জন্য **সানন্দে প্রতীক্ষা** করে।

প্রসঙ্গতঃ আমরা এখানে শিশু মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞা ডঃ মণ্টেসরীর দুইটি বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করতে পারি। **প্রথমটি হচ্ছে** যে, তাঁর মতে - প্রত্যেক কাজেরই একটা **প্রস্তুতি-স্তর** আছে। এই প্রস্তুতি-পর্ব সম্পন্ন করে তবেই প্রকৃত কাজটিতে হাত দেওয়া উচিত। একটি ক্ষীণমেধা শিশুকে তিনি যখন সেলাই শেখাতে যান, তখন লক্ষ্য করেন যে শিশুটি তা করতে পারছে না ; কিন্তু ঐ শিশুটি যখন কাগজ দিয়ে বোনার কাজ (weaving mats) করতে শিখল' তারপর সে অনায়াসেই সেলাই করতে পারল। এর থেকে মণ্টেসরী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—"Preparatory movement could be carried on and reduced to a mechanism by means of repeated exercises—not

in the work itself—but in that which prepares for it, Pupils could then come to the real work, able to perform it without ever having directly set their hands to it before."* কাজেই প্রকৃত কাজে হাত দেবার আগে—প্রস্তুতি-পর্বে একটু বেশী সময় দিলে, **কাজটি সহজেই সুসম্পন্ন হয়।** তাই তো বই পড়ার আগে তার প্রস্তুতির বিশদ কর্মসূচী রূপায়ণের প্রয়োজন।

ডঃ মণ্টেসরীর **দ্বিতীয় মন্তব্যটিও** প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"By education, must be understood the **active help** given to the **normal expansion** of the child," অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে সক্রিয় সহায়তা। কিন্তু শিশুকে এই সাহায্য যে কোনও সময় দিলে চলবে না—তার একটা বিশেষ নির্দিষ্ট সময় আছে। এই সময়টিকে মণ্টেসরী "Psychological Moment" বলে উল্লেখ করেছেন। এই মূল্যবান মুহূর্তটি কি, তা বোঝাতে তিনি বলেছেন—"Psychological Moment in the educative process come **when the consciousness of a need arises** in the child mind." অর্থাৎ শিশু যখন তার কোনও বিশেষ **চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখনই সেটা তার মনস্তত্ত্ব মুহূর্ত।** কাজেই শিশুকে পাঠ শিক্ষা দেবার আগে, তার এই বিশেষ শুভ মুহূর্তটি এসেছে কিনা, সেটা দেখে নেওয়া একান্তই আবশ্যক।

ডঃ মণ্টেসরীর এই দুইটি মূল্যবান উপদেশ পালন করা ছাড়াও, পড়ার প্রস্তুতি-পর্বে **তৃতীয়তঃ** আমাদের দেখে নিতে হবে যে শিশু **শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ** কিনা; অর্থাৎ **সে চোখে ভাল দেখতে পায় কিনা, কানে শুনতে পায় কিনা, কথা বলতে পারে কিনা**—অথবা তার **অসুখ বা মানসিক দিক দিয়ে কোনও অপসঙ্গতি আছে কিনা,** সে **সামাজিক ও সুখী কিনা।** এক কথায় বলা যায় যে প্রস্তুতি-পর্বে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের ওপর ভিত্তি করে আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে। এসব দিক দিয়ে যে শিশুর কোনও ত্রুটি নেই এবং যে শিশু সহজে পড়ার প্রস্তুতির কার্যসূচী অনুসরণ করতে পারে, সে বই পড়ার উপযুক্ত হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

*Advanced Montessori Method—by Montessori, P. 261.

উপরোক্ত তিনটি মূলসূত্র মেনে নিয়ে, **নানাবিধ কাজের মাধ্যমে** শিশুদের পড়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। যেমন—(ক) মৌখিক ভাষা বুঝতে ও ব্যবহার করতে প্রচুর সুবিধা দান ; (খ) বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলি যাতে সংঘবদ্ধ করা যায় ও উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায়, তার জন্য চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ দান ; (গ) ছবিতে যা আঁকা আছে, অথবা গল্পে যে ঘটনা বা চরিত্রের প্রতিফলন রয়েছে, শিশু যাতে তা অনায়াসে বুঝতে পারে, তার সুবিধা করে দেওয়া ; এবং (ঘ) মৌখিক ও লিখিত ভাষার সমন্বয় সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া।

(ক) **মৌখিক ভাষা বুঝতে ও ব্যবহার করতে প্রচুর সুবিধা দান :** শিশু এককভাবে বেড়ে উঠলে কথা বলার সুযোগ কম পায়। বাড়িতে ভাই বোন, দাদু, ঠাকুমা প্রভৃতি থাকলে, তাদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে শিশু সহজেই অনেক কথা শিখে ফেলে। নার্সারী স্কুলে সমবয়স্ক, কম বা বেশী বয়স্ক অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গ শিশুর ভাষা শিক্ষায় প্রচুর সহায়তা করে। তাদের সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা ও ভাবের আদান-প্রদানে শিশু মৌখিক ভাষা চটপট **বুঝতে ও বলতে পারে**। নার্সারী স্কুলে Free play বা অনিয়ন্ত্রিত খেলার সময় ছোটদের বাক-শক্তির যথেষ্ট উন্নতি হয় ; তাছাড়া প্রার্থনার পূর্বে যখন শিশুরা সমবেত হয়ে গোল হয়ে বসে, তখন শিক্ষিকা ছোটদের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন—তারা সাধ্যমত তার উত্তরও দেয়। এ বিষয়ে শিশুর বাক্-শক্তি বিকাশের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গল্প বলা ও শোনার দ্বারাও মৌখিক ভাষা বোঝার সাহায্য হয়। এজন্যই পড়ার প্রস্তুতি-স্তরে অজস্র গল্প বলা দরকার। এসব গল্প আবার মাঝে মাঝে বই থেকে পড়ে শোনালে ভাল হয়—কেননা, তাতে পড়ার বই-এর কথাগুলো হুবহু ছোটদের মনে গেঁথে যায় ; পরে বই পড়ার সময় ছাপার অক্ষরে ঐ একই কথা দেখে শিশু খুবই খুশী হয়—কোন্ শব্দের পর আর কোন্ শব্দটি আসবে তা প্রত্যাশা করতে পারে, আর এই প্রত্যাশার পূরণ হলেই সে পাঠে সফলকাম হয়—এতে তার আনন্দের সীমা থাকে না, পাঠ-কার্যটিও আনন্দময় হয়ে ওঠে।

ছড়া, কবিতা শোনা ও বলার মাধ্যমেও ছোটদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ছড়াগুলি উপযুক্ত ভঙ্গী সহযোগে, সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়ে শোনালে,—তা বেশী কার্যকর হয়।

ছবির বই দেখা ও তার বর্ণনার ভিতর দিয়েও শিশু ভাষা শিখতে ও বুঝতে পারে। এজন্য ছোটদের নানা ধরনের ও বিভিন্ন বিষয়ের ছবির বই দেওয়া দরকার। নার্সারী স্কুলে "ছবির বই-এর গ্রন্থাগার" বা "Book Corner" করে দিতে পারলে, ছোটরা ঐসব বই নিয়ে আপন মনে নাড়াচাড়া করবে—তার পরিচিত পশু-পাখি, ব্যবহারের উপযুক্ত জামা-জুতো, তার প্রিয় মোটর গাড়ি বা উড়োজাহাজের ছবি দেখে আনন্দ পাবে—ঐসব ছবিকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করবে। এমন কি ছবির সাহায্যে সে আপন-পর, নিজের আনন্দ-বেদনা—এ সবের অভিব্যক্তিও ভাষার সাহায্যে করতে পারবে।

অভিনয় ও পুতুল-নাচের দ্বারাও শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং প্রকাশভঙ্গীর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

গল্প, অভিনয় ইত্যাদির **মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পারম্পর্য** (Sequence) যাতে **শিশু অনুসরণ করতে** পারে, তার সুযোগ দিতে হবে। শিশু যখন গল্প বলবে, তখন মূল ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়ে, সমগ্র গল্পটিতে একটি যাতে টানাভাব (continuity) বজায় থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, বহু শিশু গল্পের পারম্পর্য রক্ষা করতে পারছে না। এ ব্যাপারে কুশলতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ধরনে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, "লাউ গড় গড়" গল্পটি শিশুরা শুনেছে। এই গল্পে পাহারা দেবার জন্য বাড়িতে রঙ্গা ও ভঙ্গাকে রেখে, বুড়ি শরীর সারাতে মেয়ের বাড়ি যাচ্ছে। পথে বুড়ি পর পর **শেয়াল, বাঘ** আর **ভালুককে** দেখল। গল্পের শেষে প্রশ্ন করা হবে—বুড়ি **ফেরার পথে** কাকে প্রথম দেখল ? তারপর সে কাকে দেখবে ? তারপরই বা সে কাকে দেখবে ? বলা বাহুল্য, ফেরার পথে ক্রমটি উলটিয়ে **ভালুক, বাঘ** এবং সবশেষে **শেয়াল** হবে। ছোটরা বুড়ির যাবার পথের ক্রম অনুসরণ করে যদি বলে বুড়ি প্রথমে শেয়ালকে দেখেছে, তা হলে গল্পের উপসংহারে ভুল অনিবার্য হবে।

তাছাড়া এই একটি গল্পের পাঁচটি বিভিন্ন ছবি তৈরী করা যেতে পারে। ঐ ছবিগুলি একত্র মিশিয়ে দেওয়া হবে। শিশু শোনা গল্পের ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে যদি ছবিগুলিকে পরপর সাজিয়ে রাখতে পারে, তবে সে যে গল্পটির ক্রম অনুসরণ করেছে,—তার পরিচয় দেবে।

(খ) **চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ দানঃ** শিশু বয়সে অপরিণত

থাকে—তাই তার ধারণাগুলিও থাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলিকে একত্র করে কাজে লাগাবার জন্য শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশের প্রয়োজন। এই বিকাশের সুযোগ আছে, এমন কয়েকটি কাজের কথা এখানে উল্লেখ করছি।

একটা ছবিতে তিনটে **ফলের ছবি** আঁকা আছে ; শিশুকে আরও **একটি ফলের** ছবি আঁকতে বলা হল। অনুরূপ ভাবে পশু, পাখি, ফুল ইত্যাদির ছবি করা চলে ; এই কাজে তার চিন্তার প্রয়োজন হয়, এবং চিন্তাশক্তি বাড়ে।

নানা রকমের তরকারি দিয়ে একটা চার্ট করা যায়। প্রতিটি শিশু যে কোনও একটা তরকারির ছবি রঙ্গীন কাগজে কাটবে বা সুন্দর করে রেখা ধরে ধরে ছিঁড়বে (paper tearing)। এই কাজ করার সময় সে ঐ বিশেষ তরকারির নামটি বলবে। যখন সে ঐ কাটা ছবিটি অন্য বড় কাগজে আঠা দিয়ে লাগাবে—অন্য ছেলেমেয়েরা তা দেখবে, এবং কি লাগানো হল, তার নাম বলবে। এমনি করে এক-একটি শিশু যখন যে ভিন্ন ভিন্ন তরকারির ছবি বড় কাগজে লাগাবে,—অন্য শিশুরা তা দেখে তাদের নাম বলবে ; পরে শিশুরা আগ্রহী হলে শিক্ষিকা ঐ সব জিনিসের নামও লিখে দিতে পারেন।

কথা বুঝে কাজ করতে পারে কিনা, বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারে কিনা—তা দেখার জন্য এই ধরনের কাজ দিতে হবে। যেমন—

একটা বড় বল আঁক।

বলটাতে দাগ কেটে ভাগ কর।

দাগ কাটা ভাগগুলিতে লাল ও নীল রং দাও।

অথবা আমি **যা বলছি,** তা **কর—**

লাফাও। নাচ। বসে পড়।

অথবা আমি **যা করছি,—তাই** কর। একে **কি বলে ?**

শিক্ষিকা-লাফাবেন।

তালি দেবেন।

পা ছড়িয়ে বসবেন।

চোখ মিটমিট করবেন।

এক পায়ে লাফাবেন।

কোন্ **ভঙ্গীতে মনের ভাব প্রকাশ হয়,** তা **বোঝাতে পারে কিনা** জানার জন্য শিক্ষিকা বলবেন—

এ রকম হলে কি **করতে** হয়, **দেখাও ঃ**

ঘুম পেয়েছে ॥ ক্লান্ত হয়েছে ॥ খুব খুশী হয়েছে ॥ খুব দুঃখিত হয়েছে ॥

চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির জন্য নানারকম **প্রশ্নও করা** চলে। যেমন—

জুতো পর কেন ?

চুল না আঁচড়ালে কি হয় ?

আকাশ কালো হয়ে আছে ; এর পর কি হবে ?

ছাতা আমাদের কি কাজে লাগে ?

গ ও ঘ ছবিতে যা আঁকা আছে, গল্পে যে ঘটনা বা চরিত্র আছে, তা বুঝতে এবং মৌখিক ও লিখিত ভাষার সমন্বয়ের সহায়তা করা (growth in interpretative skill) ঃ নানাভাবে এই বোঝার সহায়তা করা যেতে পারে। **ছবিতে বা গল্পে** কি কি চরিত্র আছে, তারা কি কি কাজ করছে, তারা কেনই-বা ঐ কাজ করছে, অর্থাৎ কি উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ কাজ করছে, এইসব কাজ করার সময় তারা কি ধরনের কথাবার্তা বলবে বলে তুমি মনে কর, অথবা তাদের মনের অবস্থা কেমন হবে—এ সব কিছুর আলোচনার মাধ্যমে এই Interpretative skill বেড়ে যায়। খেলা হিসাবে নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুসরণ করা যায়।

পর পর চারটি ছবিতে একটি গল্প তৈরী করা হল। আমাদেয় বাংলা ভাষার লেখা শুরু হয় বাঁ দিক থেকে, এবং তা ক্রমশঃ ডান দিকে এগুতে থাকে। শিশুর দৃষ্টিও যেন এরূপ বাঁ থেকে ডানদিকে এগিয়ে যায়—এই উদ্দেশ্য মনে রেখে, ছবিগুলিকে ১, ২, ৩, ৪, বলে চিহ্নিত করে নীচে নীচে বা এলোমেলো ভাবে না রেখে, এমনি করে সাজিয়ে রাখবে।

১ ২

৩ ৪

পর পর সাজানো এই চারটি ছবিতে একটি সম্পূর্ণ গল্প হবে। গল্পের পারম্পর্য রক্ষা করতে শিশুর চোখ বাঁ দিক থেকে ডানদিকে যাবে—আবার ঘুরে এসে ৩ নং থেকে শুরু করে ডানদিকে ৪ নম্বরে শেষ হবে। শিশু প্রতিটি ছবি খুব ভাল করে দেখবে—এতে কারা কারা আছে, তারা কে কি করছে—সব বলবে। একের পর এক-একটি ছবি বর্ণনা করলেই দেখা যাবে যে, একটি সুন্দর গল্প তৈরী হয়েছে।

অক্ষর বা শব্দের দৃশ্যরূপ (visual image) যাতে ছাত্রের মনে গেঁথে থাকে, তা ভাষা শিক্ষকের দেখা দরকার। এরই প্রস্তুতি হিসাবে আমরা ছবির মাধ্যম নিতে পারি। এবার একটি সম্পূর্ণ ছবি দেখানো হবে। ধরা যাক, তাতে একটি ছোট ছেলে আর একটি মেয়ে একটা বল, একটা বেলুন আর একটা গাড়ি নিয়ে খেলা করছে। পরের বার শিশুকে প্রায় ঐ একই ছবি দেখানো হবে, কিন্তু সে ছবিতে হয়তো গাড়িটা নেই ; গাড়ির জায়গায় একটা গোলাকার চিহ্ন দেওয়া। শিশুকে প্রশ্ন করা হবে, ছবিতে কি নেই ?

এবার যে খেলার কথা বলব, তাকে সগোত্রীকরণ বলা যায়। শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ ধরনের খেলা খেলতে পারে। এ খেলায় শিশুর চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন। যেমন—

তিনটি বিভিন্ন ফুল ও একটি ছাতার ছবি একই সঙ্গে মেশানো আছে ; কোন্ তিনটি একসঙ্গে যাবে – আর কোন্‌টি আলাদা ?

অথবা, একটি জামা, একটি শাড়ি, একটা পেয়ালা, ও একটা টুপি ; কোন্ তিনটি একত্রে যাবে—কোনটিই বা পৃথক ?

অথবা, গাজর, আলু, কাঁচি ও বাঁধা কপির ছবি। কোন্ তিনটি একসঙ্গে যাবে—আর কোন্‌টি পৃথক ?

এর চাইতেও সহজভাবে ছবির খেলা দেওয়া যাইতে পারে। চারটি কাঠবিড়ালীর ছবি—তিনটে বাদামী, একটা কালো ; অথবা চারটি কুকুরের ছবি—তিনটে ছোট, একটা বড়।

শিশুকে বলা হবে – কোন্‌টা তফাত দেখাও।

আরও একটু কঠিন ছবির খেলা ; এতে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়। যেমন—

পর পর একই ছেলের ছয়টি ছবি। ছেলেটি **বাঁ দিকে** মুখ করে বই পড়ছে—পাঁচটি ছবি একরকমের। অন্য ছবিটিতে ছেলেটি **ডানদিকে** মুখ করে পড়ছে। কোন্ ছবিটি আলাদা, দেখাও।

অথবা, শিশু বোর্ডে লিখছে ডান হাত দিয়ে—এমন ধরনের পাঁচটি ছবি ; মাঝখানে অন্য একটা ছবিতে শিশুটি বাঁ হাতে বোর্ডে লিখছে। কোন্‌টি অন্যরকমের বের করতে বলা হবে।

আমাদের বর্ণমালায় অনেক অক্ষর আছে, যার দৃশ্যরূপে অন্য অক্ষরের সাদৃশ্য বর্তমান। ব, র, ক, ধ, ঝ—অনেকটা একই রকমের দেখতে। একটি

অক্ষরের সঙ্গে অন্য অক্ষরের বৈসাদৃশ্য ঠিক কোন্‌খানে—ঠিক মত পড়তে গেলে, তা শিশুকে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। উপরের ছবির খেলার সাহায্যে শিশু ঠিক মত পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাই ভবিষ্যতে পড়ার সময় ব-কে র, র-কে ধ, ধ-কে ক বলে ভুল করে না।

তা ছাড়া নানা জিনিসের অংশ ও সম্পূর্ণকে আলাদা করে মিশিয়ে দিয়ে কোন্‌টা কার অংশ বের করতে দেওয়া হয়। এটাও ছবির সাহায্যেই খেলা হয়। যেমন—ছবিতে একদিকে রয়েছে একটা **গাছ**, একটা **বাড়ি** ও একটা **মোটর গাড়ি**। অন্যদিকের সারিতে আছে একটা **জানালা**, একটা **গাড়ির চাকা** ও একটা **পাতার** ছবি। কোন্‌টা কার অংশ, অর্থাৎ কে কার সঙ্গে যাবে, দাগ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

ছবি দেখে গল্প বলা ছাড়াও গল্পের চরিত্রের নানা অভিব্যক্তির মাধ্যমে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের বিকাশ ঘটে। কোন্ ঘটনায় লোকের দুঃখ হয়, কেন শিশু ভয় পায়, কোন জন্তু কেন তার মায়ের কাছে শাস্তি পেল আর কাঁদল, কেন কোন বাচ্চা খুব খুশী হল—এসব শিশু বুঝতে পারে এবং ভাষায় তা প্রকাশও করতে পারে।

আরও একটা ছবির খেলা আছে, যাতে শিশুর **পছন্দ ও মেজাজ** বুঝতে পারা যায়। ধরা যাক, একটি মেয়ে ও কুকুরের ছবি আছে তাদের চারটি বিভিন্ন ধরনের solution দেওয়া আছে; ১নং ছবিতে মেয়েটি ভাত খাচ্ছে, কুকুরটি তাকিয়ে দেখছে। ২নং ছবিতে কুকুরটি এসে মেয়েটির পাত থেকে ভাত খেয়ে নিচ্ছে। ৩নং ছবিতে মেয়েটি কুকুরটিকে লাঠি দিয়ে মারছে। ৪নং ছবিতে, মেয়েটি কুকুরকে খানিকটা ভাত কুকুরের বাটিতে দিয়ে দিচ্ছে। কোন্ ছবিটি শিশু সবচেয়ে ভাল বলে—তার ওপর শিশুর decision **নেবার ক্ষমতা** ও মেজাজ-মরজির পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া প্রস্তুতি-পর্বে flash card-ও বেশ উপকারী। গল্প বলার পর, সে-গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম, অথবা শিশুর পরিচিত শব্দের (word) ছবি ও লেখা যুক্ত কার্ড তাদের দেখানো চলে। আঁকা ছবিটি ও তার নামের লেখাটি বার বার দেখতে দেখতে শিশু এই দুটোর মধ্যে একটা **সমন্বয় বা যোগাযোগ কল্পনা** করে নেয়—এই দুয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়; ইংরাজীতে একেই বলা হয় Bond Formation। ছবি ও লেখা এই দুয়ের image বা প্রতিমা তার মনে গাঁথা হয়ে যায়; পরে

একটির **অনুপস্থিতিতে সে অন্যটিকে স্মরণ করতে পারে,** অর্থাৎ ছবি না দেখে, শুধু লেখা দেখেই সে-লেখাটা কি, তা শিশু বলে দিতে পারে; বলা বাহুল্য, তখনও তার অক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়নি, এবং সে বানান করতেও পারে না। সে একান্তভাবে শব্দটির সমগ্র দৃশ্যরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

শিশুদের পড়ার-পর্বের কর্মসূচীর কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল। উৎসাহী ও মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞা শিক্ষিকা শিশুর চিন্তাশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি ও প্রকাশভঙ্গীর বিকাশের জন্য এমন ধরনের আরও অনেক খেলা উদ্ভাবন করে নিতে পারেন; ছবি তৈরী করে শিশুদের খেলতে দিয়ে, একই সঙ্গে তাদের শিক্ষাও দিতে পারেন। "রাণুর প্রথম ভাগে" দেখেছি, রাণু তার প্রথম ভাগ বই পড়ার সময় **অচল, অধমকে** কাজল দিয়ে কালো করে, অথবা ছোট্ট আঙ্গুলের ঘষায় নির্মূল করে মুছে ফেলে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল। কেননা, প্রথম ভাগের ঐ অচল, অধম তার কাছে অর্থহীন। পড়ার প্রস্তুতির এই খেলাগুলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে, এই বিশেষ কর্মসূচীর অনুসরণ করলে, শিশুরা প্রস্তুতির কাজে দক্ষ হবে অনেক বেশী; আর প্রস্তুতির কাছে দক্ষ হতে পারলে, যখন প্রকৃতপক্ষে বই পড়তে হবে তখন তা শিশুর কাছে একেবারেই দুরূহ বা দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে না—পড়ার কঠিনতম কাজটি সহজে ও আনন্দের সঙ্গে শুরু করা যাবে, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ শিশু-মন নূতন নূতন পাঠগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে।

গণিতের জন্য প্রস্তুতি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অঙ্কের ঘণ্টায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। অঙ্ককে ভয় করে না এমন শিশু কমই আছে। তাইতো অঙ্ক করতে বললে শিশুর পেট ব্যথা করে, মাথা ধরে—নয়তো সে ক্লাস পালায়। এর কারণ স্বরূপ বলা চলে যে শিশুদের যে ভাবে অঙ্ক শেখানো হয়, তাতে তাদের **গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতার ব্যক্তিগত পার্থক্যের** দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। শিশু বস্তু (concrete) ও বিশেষ (particular)-কে সহজে বুঝতে পারে, কিন্তু বিমূর্ত ও নির্বস্তুক (abstract)-এর ধারণা সহজে করতে পারে না। জীবনের নানা প্রয়োজনে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, অনেক পরে শিশু এ ধারণা আয়ত্ত করে। বিমূর্ত জিনিসের এবং সংখ্যার বিশ্লেষণের জ্ঞান না থাকার দরুন কিন্তু বাইরের কয়েকটি নিয়ম মেনে যন্ত্র-চালিতের ন্যায় যোগ বা বিয়োগ করতে গিয়ে, পদে পদেই ভুল করে ; আর এ অসাফল্য তার অমনোযোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অঙ্কের প্রতি তার মনে তীব্র বিতৃষ্ণা এনে দেয়। শুধুমাত্র অঙ্কই তো গণিত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়—গণিত শাস্ত্র আরও অনেক ব্যাপক। কাজেই এই শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করতে হলে, শিশুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা দিতে হবে। কেননা, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে শিশু যদি **নিজে আগ্রহ করে, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োজন বুঝে হাতে কলমে কিছু শিখতে পারে,** তবেই সে শিক্ষা সার্থক হয়।

শিশুকে **অঙ্ক শেখাবার আগে** তার **প্রস্তুতি-স্তর হিসাবে** প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে নানা কাজের ভেতর দিয়ে তাকে **আকার, পরিমাণ, আয়তন, ওজন, সময়, পরিমাপ, সংখ্যা** ইত্যাদির ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

শিশু যখন প্রথম নার্সারীতে আসে, সে শূন্য মন নিয়ে আসে না। তার ঐ দুই বা আড়াই বৎসরের জীবনে সে গণিতের বিভিন্ন ধারার অর্থাৎ আয়তন, আকার, সময়, সংখ্যা ইত্যাদির কিছু কিছু বাস্তব জ্ঞান নিয়ে আসে। ছোট শিশু সন্ধ্যেবেলায় মায়ের কোলে চড়ে দেখেছে, আকাশে **একটি** চাঁদ,—কিন্তু **একের বেশী অনেক** তারা। শিশু জানে, তার খাবার থালা **ছোট**, কিন্তু বাবার থালাটি **বড়**। বাড়িতে শিশু দেখেছে কাঠের চেয়ারটা কত **ভারী**, অথচ ছোট্ট মোড়াটি

কত **হালকা** ; আমগাছটা কত **লম্বা** আর বেলফুলের গাছ কত **খাটো ;** মায়ের শাড়ির লালপাড় কত **চওড়া,** আর বাবার ধুতির পাড় কত **সরু।** সে আরও জানে যে **সকালে** ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাড়ু দেয়, **বিকেলে** দাদা মাঠে ফুটবল খেলতে যায় ; **রাত্রি** হলে অন্ধকার হয়, **ভোরবেলা** সূর্য ওঠে। সে বোঝে যে মামার বাড়ি অনেক **দূরে** কিন্তু মাসির বাড়ি **কাছেই।** শিশুকে একটা বিস্কিট বা কমলালেবু দিলে, সে তা দেখে বলতে পারে তা **আস্ত,** না **ভাঙা ;** অসমান করে ভেঙে দিলে, কোন অংশ **কম,** আর কোন অংশ **বেশী** তাও সে বুঝতে পারে। অনেকে এক, দুই তিন চার বলতেও পারে, কিন্তু তার সঠিক অর্থ হয়তো অনেকেই জানে না।

উপরে উল্লিখিত গণিতের জ্ঞান শিশু তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অর্জন করে, তারপর নার্সারীতে এসেছে। শিশুর এই জ্ঞানকে ভিত্তি করেই, প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের গণিতের প্রস্তুতি-পর্ব ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। শিশুর পারিপার্শিক থেকে সময়, আকার, সংখ্যা প্রভৃতি **বোধের প্রথম সূত্রপাত হলেও,** প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে, নার্সারী বিদ্যালয়ে এসে, খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে **এসব ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করা হয়।**

শিশুরা স্বভাবতঃই রংচং-এ জিনিস নিয়ে খেলতে ভালবাসে। ছোট ছোট পুতুল, কড়ি, রঙীন কাঠের পুতি (beads), কাচের বড় পুতি, রঙীন চক ও পেন্সিল, তাস, তেঁতুল বীচি, প্লাস্টিকের তৈরী ফুল, মাছ, পাখি বা জীবজন্তু—এসব দিয়ে সহজেই শিশুদের জন্য নানা চিত্তাকর্ষক খেলার ব্যবস্থা করা যায়। **মণ্টেসরী ও ডিক্রোলী** পদ্ধতিতে এই ধরনের জিনিস দিয়ে বহু কাজ ও খেলা করার প্রক্রিয়া রয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুরা **আনন্দের সঙ্গে, আগ্রহী হয়ে, সুস্পষ্ট ভাবে** শিখতে পারে। আমাদের নার্সারীতে যে সব কাজের মাধ্যমে শিশুর গণিতের ধারণাকে সুস্পষ্ট করা হয়, তা নীচে উল্লেখ করা হল।

(১) **পৃথকীকরণ :** একটা বাক্সে বোতাম, রীল, পুতি, চকের টুকরো, প্লাস্টিকের ছোট ছোট খেলনা রেখে শিশুকে প্রত্যেকটি জিনিস আলাদা করে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পৃথকভাবে রাখার জন্য সুদৃশ্য ও রঙীন কয়েকটি টিনের কৌটো রাখা হয়। শিশু আনন্দের সঙ্গে জিনিসগুলি বেছে বেছে আলাদা করে পৃথক পৃথক কৌটোয় রাখবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পৃথকীকরণের বিভিন্ন বস্তু মাপে ও আকারে যেন মোটামুটি একরকম থাকে,

অর্থাৎ বোতাম যেন খুব বেশী বড় বা ছোট না হয়। এই সকল দ্রব্য রঙীন ও চকচকে হলে শিশু সহজেই এই কাজ করতে আকৃষ্ট হয়।

(২) **বড় ও ছোট ঃ** শিশুকে কয়েকটি দুই মাপের অর্থাৎ বড় ও ছোট খেলনা—যেমন পুতুল, গাড়ি, রথ, বল ইত্যাদি দেওয়া হল। টেবিলে বা মেজেতে একটা দাগ কেটে শিশুকে বড় খেলনাগুলি বাঁদিকে, আর ছোট খেলনাগুলি ডানদিকে রাখতে বলা হবে। এই কাজের উদ্দেশ্য আকার নির্ণয় করা ; কাজেই যে পুতুল বা গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাচ্চাকে খেলতে দেওয়া হবে তা যেন একই জিনিসের তৈরী হয়, **প্রথম অবস্থায়** সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে অর্থাৎ দুটি পুতুলই যেন প্লাস্টিকের অথবা দুটি গাড়িই যেন টিনের তৈরী হয়। পরে অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলে।

(৩) **বেশী ও কম ঃ** শিশুদের দুই প্রস্থ করে কার্ড দেওয়া হয়। এদের একটি প্রস্থে শিশুর পরিচিত ও প্রিয় খেলনা বা অন্য কোনও দ্রব্যের **বেশী** ছবি থাকবে ; অন্য প্রস্থে ঐ একই জিনিসের **কম** ছবি থাকবে। শিশু শিক্ষিকার দেওয়া দাগের দুপাশে ঐ ছবিগুলিকে বেশী বা কম—এই দু'ভাগে পৃথক করে রাখবে।

(৪) **লম্বা ও বেঁটে ঃ** বিভিন্ন মাপের ফিতে, দড়ি, পেন্সিল, কাগজের টুকরো ইত্যাদি দ্বারা ছোটরা কোনটা লম্বা, আর কোনটা বেঁটে, তা আলাদা করে পৃথকীকরণ করতে পারে। এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুদের মধ্যে কে সবচেয়ে লম্বা বা কে সবচেয়ে বেঁটে—শিশুরা তা অনায়াসেই বের করতে পারে।

(৫) **ভারী ও হালকা ঃ** অনুরূপভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুরা ভারী ও হালকার জ্ঞান লাভ করে। দুটি দুটি করে সমান আয়তন ও আকারের টিন বা বাক্সতে বালি ভরে রাখতে হবে ; তাদের একটাতে বেশী বালি থাকবে ও ভারী হবে ; অন্যটা হয় খালি থাকবে, না হয় তাতে খুব অল্প বালি থাকবে। শিশু বাক্সটি তুলে, অনুভব করে ভারী বাক্স ও টিনগুলি একদিকে রাখবে—হাল্কাগুলি অন্যদিকে।

(৬) **মণ্টেসরীর কয়েকটি শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার ঃ** গণিতের প্রাথমিক ধারণার জন্য—সুদৃশ্য ও রঙীন কাঠের টুকরোয় ফুটো করা হয়েছে, এবং সেই ফুটোগুলিতে যাতে ঠিকমত বসে, এমনি ধরনের কাঠের সিলিণ্ডার

রয়েছে। এই সরঞ্জামগুলি আকার, আয়তন ও dimension-এর প্রভেদ অনুযায়ী চারটি set-এ বিভক্ত এবং ক্ষেত্রফল অনুযায়ী পরপর ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে। শিশুরা এগুলি দিয়ে খেলতে খেলতে আকার, আয়তন, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ভুলভাবে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখতে পারে। তাছাড়া **Pink Tower** অর্থাৎ গোলাপী রং-এর কাঠের টুকরো দিয়ে চওড়া থেকে ক্রমে ক্রমে সরু হয়ে যাওয়া মিনার বা টাওয়ার, **Broad Stair** অর্থাৎ কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী ক্রমশঃ চওড়া সিঁড়ি, **Long Stair** বা লাল-নীল রং-এর দশটি কাঠের রড্ দিয়ে দৈর্ঘ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে সজ্জিত সিঁড়ি, **Number Rod** বা সংখ্যা গণনার রঙীন কাঠি, সুদৃশ্য পুঁতি ইত্যাদি অসংখ্য শিশু চিত্তাকর্ষক শিক্ষা উপাদানের আবিষ্কার মণ্টেসরী করে গিয়েছেন। এই উপাদানগুলি এমনভাবে সাজানো যে ভুল করলে শিশু নিজেই তা বুঝতে পারে, এবং স্বচেষ্টায় সে ভুল সংশোধনও করতে পারে। এগুলো নাড়াচাড়া করে করে শিশু সংখ্যা সম্বন্ধেও প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।

এইসব কাজ ও খেলার ভেতর দিয়ে শিশুরা নিম্নলিখিত চারটি স্তর অতিক্রম করে—(১) অভিজ্ঞতা (experience), (২) সুস্পষ্টতা (clarification) (৩) কৌশল (skill) এবং (৪) প্রয়োগ (application)। খেলা বা কাজগুলি করতে করতে শিশুরা যখন এই চারটি স্তরের সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন তারা যা শেখে, তা **অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রয়োগ করে** শেখে বলে শেখাটা সার্থক হয়।

সংখ্যার ধারণা ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, অনেক শিশু ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি বলতে পারলেও, তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে প্রকৃত কোন জ্ঞানই থাকে না। নির্বস্তক ও বিমূর্ত সংখ্যার ধারণা শিশু সহজে করতে পারে না—তার নিকট ১, ২, ৩ ইত্যাদি অর্থহীন চিহ্ন মাত্র। সংখ্যা গণনা শেখবার প্রথম স্তরে তাই শিশুর প্রিয় বা পরিচিত বস্তুর সাহায্য নিতে হবে। "তোমার জিভ কই ?" শিশু জিভ দেখালে, শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার কয়টা জিভ ?" তারপর—"পা কয়টা ?" শিশুরা হয়তো উত্তর দিতে পারবে, না পারলে শিক্ষিকা নিজে তাঁর একটি পা দেখিয়ে বলবেন, **এক**,—অপরটি দেখিয়ে বলবেন, **দুই**। শিশু শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে এক ও দুই কথা দুটি বার বার বলবে। অনুরূপভাবে চোখ, কান, হাত—এসব বিভিন্ন অঙ্গ যে **দুইটি** করে, তা দেখাবেন, বলবেন এবং শিশুদের বলতে বলবেন। যখন শিশু একে অন্যের সঙ্গে বল বা

তেঁতুল বীচির থলে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করে, তখন শিক্ষিকা সেখানে উপস্থিত থেকে প্রতি বারে ছোঁড়ার সময় ১, ২, ৩ ইত্যাদি উচ্চারণ করবেন; এর থেকেও সংখ্যার ধারণা পাবে। দুই বললে যে শুধু **দুটো পা বোঝাবে তা নয়**—দুটো পা, দুটো হাত, দুটো চোখ, দুটো পাখি, দুটো খরগোশ, দুটো পুতুল—এরূপ যে কোনও জিনিস হতে পারে। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার সময় শিশুকে তার প্রিয় ও পরিচিত জিনিস হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে দিতে হবে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রথমে **পাঁচ পর্যন্ত**—এবং পাঁচ সম্বন্ধে ভাল ধারণা হলে **দশ পর্যন্ত** সংখ্যার **সঙ্গে তার পরিচয়** ঘটানো হবে। অনেক শিশু বাড়িতে মা-বাবার কাছ থেকে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত **হয়তো গোনা মুখস্থ করে আসে; কিন্তু পরীক্ষা** করে দেখা গিয়েছে যে, এদের অনেকেরই **পাঁচ** পর্যন্তও সংখ্যার **ধারণা নেই**। নানা প্রকারের খেলা, কাজ ও ছড়া ইত্যাদির সাহায্যে আনন্দের মাধ্যমে সহজেই শিশুদের সংখ্যার ধারণা দেওয়া যায়।

সংখ্যা সম্বলিত ছড়া আবৃত্তি করতে করতে শিশুর সংখ্যা বলার অভ্যাস হয়; পরে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এর সত্যতা শিশু যাচাই করে নিতে পারে।

যেমন— "এক দুই শুই শুই
চুপ কর খুকী তুই।
তিন চার খাবে মার
দুষ্টুমি নয় আর।
পাঁচ ছয় আর নয়
শুয়ে শুয়ে রাত হয়।
সাত আট পেতে খাট
খোকা শোয় বড়লাট।
ন' দশ ব্যাস্ ব্যাস্
নাক ডাকে ভঁস্ ভঁস্।"

তাছাড়া 'হাসিখুশি'ই সুপরিচিত দুইটি ছড়া—

"মামাদের দরজায়" এবং "হারাধনের দশটি ছেলে"—শিশুদের এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা সামনে ও পেছনে (forward & backward) গুণতে সহায়তা করে; যোগ-বিয়োগেরও খানিকটা ধারণা এতে পাওয়া যায়।

যেমন— "দুই পশু এক মাছ,—
দুয়ে একে তিন।"

অথবা— "চার পশু, এক মাছ—
চারে একে পাঁচ।"

অথবা— হারাধনের **চারটি** ছেলে
নাচে ধিন ধিন,
একটি মল আছাড় খেয়ে
রইল বাকি **তিন**।

সমস্ত গণিতের মূল হচ্ছে সংখ্যা গণনা। **যোগ, বিয়োগ, গুণ অথবা ভাগ**—এই চারটি মূল **প্রক্রিয়ার ভিত্তি হচ্ছে গুনতে পারা**। এই প্রসঙ্গে ব্যালার্ড (Ballard) বলেছেন—"Addition is counting forwards, subtraction is counting backwards ; in multiplication & division we count forwards or backwards by leaps of uniform length". অর্থাৎ—যোগে আমরা **সংখ্যা গুণে গুণে এগিয়ে যাই,—বিয়োগে সংখ্যা গুণে গুণে পেছিয়ে যাই,**—আর **গুণ যোগের** এবং **ভাগ বিয়োগের** জটিলতর সংস্করণ

নিম্নলিখিত উপায়েও শিশুদের সংখ্যার ধারণা দেওয়া যায়—

(১) পুতি দিয়ে মালা গাঁথা। শিশুরা পুতুল খেলতে ভালবাসে ; তাদের পুতুলের জন্য মালা গাঁথা তাদের প্রিয় কাজ। এই কাজের মধ্য দিয়ে, তাদের সংখ্যার জ্ঞান হয় এইভাবে ; প্রথমে বলা হবে—

১টা লাল ও ১টা কালো পুতি দিয়ে মালা গাঁথ ○●○●
২টো লাল ও ১টা সাদা নাও ●●○●●○●●○
৩টে চারকোণা ও ২টো গোল নাও □□□●●□□□●●
এক এক রং-এর বা আকারের পুতি দুটি করে,
তিনটি করে বা **চারটি করে নাও**। □□□□●●●●□□□□

(২) কয়েকটি খালি Vim অথবা ঐ আকারের পাউডারের কৌটো উজ্জ্বল রং করে নিয়ে, তার একদিকে বড় করে কোন একটা সংখ্যা লিখতে হবে। (সংখ্যা ১০-এর মধ্যেই হবে) ঐ কৌটোগুলি কিছুটা দূরে সারি সারি সাজিয়ে রেখে শিশুরা

D. Ballard—Teaching the Essentials of Arithmetic.

এক-একজন বল দিয়ে এক-একটি কৌটোকে ফেলে দিতে চেষ্টা করবে। যার কৌটো পড়ে যাবে, সে কত পেল, অর্থাৎ সে কৌটোয় কি লেখা আছে, সেটা তাকে বলতে হবে।

(৩) ১টা ট্রেতে **১০টি** ছোট বাটি থাকবে। এই সব বাটিতে যথাক্রমে ১, ২, ৩ করে ১০ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যার পুঁতি বা প্লাস্টিকের ছোট পাখি থাকবে। শিক্ষিকার সহায়তায় শিশু প্রত্যেকটি বাটি থেকে জিনিস তুলবে, এবং সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে বলবে।

(৪) জলের টবে কয়েকটি প্লাস্টিকের মাছ ভাসিয়ে দিতে হবে ; তাদের গায়ে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা থাকবে। শিশুরা ছিপ বা হাতে তৈরী ছোট জাল দিয়ে একটি করে মাছ ধরবে, এবং সংখ্যাটি কি, তা বলতে চেষ্টা করবে।

(৫) কয়েকটা খালি ঝুড়ি বা টিন রং করে নিয়ে তাতে সংখ্যা লিখে রাখতে হবে। শিশুরা অল্প দূরে দাঁড়িয়ে তেঁতুল বীচির থলে বা বল ঐ সব ঝুড়িতে ফেলবার চেষ্টা করবে—কার কত সংখ্যা হলো, তা দেখবে।

(৬) তা ছাড়া ডমিনো, লুডো, সাপ ও মই খেলার মাধ্যমেও শিশুরা সহজে গুনতে শেখে।

(৭) নার্সারীর বাগানের চারপাশে অজস্র ফুলের গাছ ; সেই সব গাছের নীচে অনেক করবী ফুল পড়ে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত খেলার সময় ছোটরা সাজি করে সেই ফুল তুলে আনে। এক-এক দিন খেলা হয় বার বার—৫টা ফুল নিয়ে কে কত রকম ভাবে সাজিয়ে রাখতে পারে ; শিক্ষিকা প্রথমে একটু ধরিয়ে দেন—শিশুরা পরে নিজেরাই এভাবে সাজায়—

●●●●●	●●●	●	●	●	●●	●●	●●●
	●●	●	●●	●●●	●●●	●	●
		●●●	●●	●		●●	●

এইভাবে সাজানোর ফলে শিশু সংখ্যার ক্রমিক অর্থ ছাড়াও, সমষ্টিগত অর্থটি বুঝতে পারে ; **পরে** এই খেলায় **Analysis of Number** বা **সংখ্যা বিশ্লেষণের** সাহায্য হয়। ৫ যে কত রকম ভাবে হয়—এই খেলার ভিত্তিতে **পরে** শিশু তা এইভাবে লিখতে পারে—

৫ = ১ + ১ + ১ + ১ + ১

৫ = ৩ + ২

৫ = ১ + ১ + ৩

৫=১+২+২

৫=১+৩+১

৫=২+৩

৫=২+১+২

৫=৩+১+১ ইত্যাদি।

(৮) শিশুকে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি ধারণা দেবার সময় নানা জিনিস বা তার ছবি দেওয়া কার্ড ব্যবহার করতে হবে। শিশু দেখবে একটি জিনিসের পাশে ১, দুইটি জিনিসের পাশে ২, তিনটি জিনিসের পাশে ৩—এইরূপ লেখা আছে। শিশু ক্রমে বুঝতে পারবে যে, সংখ্যাগুলি **একটা নিয়মের বন্ধনে** আবদ্ধ, ১-এর পর ৪ বা ২-এর পর ৬ বলা যায় না। সংখ্যাগুলি নিয়ম মেনে **ক্রমিকভাবে এক এক করে বেড়ে** যাচ্ছে।

১ হল ১টি পাখি ;

১ আর ১টি পাখি হল—২

২ আর ১টি পাখি হল—৩

৩ আর ১টি পাখি হল—৪

৪ আর ১টি পাখি হল—৫ ইত্যাদি।

(৯) সংখ্যার কিছুটা ধারণা হলে **মৌখিক জ্ঞানের চর্চা** দরকার। তোমাদের এখানে কজন ছেলে? কজন মেয়ে? ঘরে কয়টা দরজা বা জানালা? কয়জন দিদিমণি আছেন? ইত্যাদি। আরও একটু অগ্রসর হলে—মা দুটো লজেন্স দিলেন, স্কুলে একটা পেলে—তোমার কয়টা লজেন্স হল? **অথবা** নীলার তিনটে পুতুল ছিল, একটা ভেঙে গেছে—এখন নীলার কয়টা পুতুল আছে? বলা বাহুল্য, এ স্তরে শিশু হয়তো **যোগ কাকে বলে** বা বিয়োগ কাকে বলে জানে না, এবং অনেক সময় সংখ্যা লিখতেও পারে না।

(১০) এ সব কাজ ও খেলা ছাড়া দোকান দোকান খেলাতেও শিশুরা সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করতে শেখে। তারা হয়তো ৪ বা ৫ বা ৮ লিখতে বা পড়তে পারে না, কিন্তু কোন জিনিসের কি দাম তা যদি প্রথমে লেখে, তারপর বিন্দু বা দাঁড়ি দিয়ে সেই সংখ্যাটি জিনিসের গায়ে এঁটে দেওয়া থাকে, তবে সেগুলি গুনে দেখে শিশু বুঝতে পারে, কার কি দাম। যেমন, খেলনার দোকানে লেখা আছে—

বাড়ি—৫ পয়সা ○○○○○

নিশান—১ পয়সা ○

রথ—২ পয়সা ○○

পুতুল—৩ পয়সা ○○○

শিশু ৫, ১, ২, ৩ পড়তে পারে না, কিন্তু সঙ্গের বিন্দু দেখে দাম দিতে পারে। পরে ধীরে ধীরে সে সংখ্যার প্রতীকের অর্থ বুঝতে পারে।

(১১) "Abacus" বা "Ball frame"-এর সহায়তায়ও অনেক স্কুলে বা বাড়িতে সংখ্যা গণনা শেখানো হয়। এতে একটা চতুষ্কোণ কাঠের ফ্রেমে সমান্তরালভাবে দশটি শক্ত তার লাগানো থাকে; প্রত্যেকটি তারে দশটি করে রঙীন কাঠের ছিদ্র-যুক্ত বল লাগানো থাকে। বলগুলি এদিক-ওদিক করে সরিয়ে নিয়ে শিশুরা অনায়াসেই সংখ্যার জ্ঞান লাভ করে।

(১২) সংখ্যার প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের নার্সারীতে সুফল পেয়েছি।

শিক্ষিকাকে তিন সেট কার্ড তৈরী করতে হবে। প্রথম সেটে ধরা যাক তিনটি জিনিসের ছবি থাকবে—যেমন তিনটি বলের ছবি। দ্বিতীয় সেটে থাকবে এক-পাশে তিনটি বলের ছবি ও ৩ সংখ্যাটি বড় করে লেখা। তৃতীয় সেটে শুধু ৩ সংখ্যাটি থাকবে।

● ● ● ১ম সেট

● ● ● ৩ ২য় সেট

৩ ৩য় সেট

প্রথমে ছবিগুলি শিশুরা গুনে দেখবে; দ্বিতীয় সেটে তাদের পরিচিত জিনিস ও সংখ্যার প্রতীক চিহ্নের দৃশ্যরূপ এই দুয়ের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়; ইংরাজীতে একে Association অথবা Bond Formation বলা হয়। পরে তৃতীয় সেটে পরিচিত জিনিসের অনুপস্থিতিতেও শিশুরা সংখ্যার প্রতীকচিহ্নের দৃশ্যরূপটি স্মরণ করতে পারে এবং প্রকৃত সংখ্যাটি বলতে পারে।

(১৩) এইভাবে বিভিন্ন সংখ্যার চিহ্নের সহিত পরিচিত হলে, শিশুদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি লেখা কার্ড ও খেলার দ্রব্যাদি, তেঁতুল বীচি বা পুঁতি ইত্যাদি দিলে, তারা গুণে গুণে প্রতিটি সংখ্যার পাশে নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিস রাখতে পারে।

(১৪) সংখ্যার জ্ঞান হলে, তাকে দাগ কেটে মজার খেলার মধ্য দিয়ে, এই জ্ঞানকে আরও সুপরিস্ফুট করা যায়। যেমন—একপাশে **এলোমেলো ভাবে** প্রথমে ১—৫, পরে ১—১০ বা ১২ পর্যন্ত সংখ্যা থাকবে; অন্যদিকে ওলটপালটভাবে উক্ত সংখ্যক বিন্দু বা শিশুর প্রিয় জিনিসের ছবি থাকবে। কোনটা কার সঙ্গে যাবে, শিশু দাগ কেটে বোঝাবে।

(১৫) মণ্টেসরী পদ্ধতির সংখ্যা শেখাবার দুইটি উপায় ছোটদের খুব উপযোগী।

একটি বাক্সে ০ থেকে ৪, এবং পরে ৫ থেকে—৯ পর্যন্ত এই দশটি বিভিন্ন খোপ আছে; ০-এর (শূন্যের ঘরটি খালি—এতে কিছুই নেই; কিন্তু ১নং খোপে ১টি, ২নং খোপে ২টি, ৩নং খোপে তিনটি—এরকম করে ৯ নম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন সংখ্যা অনুযায়ী পুঁতি বা রঙীন কাঠি আছে। প্রত্যেক খোপের নীচে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই সংখ্যাগুলি বড় বড় করে লেখা ও শিরীষ কাগজ দিয়ে আঁটা রয়েছে। শিশু চোখ **দিয়ে দেখে,** শিক্ষিকার ও নিজের উচ্চারিত শব্দগুলি **কান দিয়ে শোনে, আঙ্গুল দিয়ে** জিনিসগুলি নেড়েচেড়ে এবং শিরীষ কাগজের কাটা সংখ্যার ওপর হাত বুলিয়ে—সহজেই সংখ্যার **লিখিত রূপের** সঙ্গে পরিচিত হবে। সাধারণতঃ শিশুরা বোর্ডে লেখা জিনিস দেখে শুধু Visual Imagery বা দৃশ্য প্রতিমার সাহায্যে মনে রাখতে চেষ্টা করে; মণ্টেসরীর এই পদ্ধতিতে শিশুরা **চোখে দেখে, কানে শোনে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়তায় শিক্ষা করে;** কাজেই এস্থলে শুধু visual imagery নয়—grapho-motor Imagery. সহায়তায় শিক্ষা হয় বলে, শিশু তা পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে পারে।

মণ্টেসরী পদ্ধতির অন্যতম উপাদানের মধ্যে "Long Stair" ছোটদের সংখ্যা শেখা কাজে বেশ সহায়তা করে। এতে দশটি রডের ১টি সেট থাকে। প্রথমটি অর্থাৎ নীচেরটি ১ মিটার, আর শেষেরটি অর্থাৎ ওপরেরটি ১ ডেসিমিটার বা ১০ সেন্টিমিটার। মাঝের সংখ্যাগুলি প্রত্যেকটি ১ ডেসিমিটার করে কমে যাবে। রডগুলি সাজালে সিঁড়ির মত দেখায়—তাই এই নাম। খেলাচ্ছলে এগুলো শিশুরা পর পর সাজিয়ে সিঁড়ির মত করে রাখে; ওলোটপালোট করে সাজালে সে ভুল সহজেই শিশুর চোখে ধরা পড়ে। প্রথম রডটি বাদে অন্য রডগুলিতে পর পর লাল ও নীল রং দিয়ে ডেসিমিটারে ভাগ করা আছে। শিশুরা এই রড দিয়ে

সংখ্যা গুণতে শিখে এবং গোনার সময় প্রতি বারই এক থেকে আরম্ভ করে; যেমন—এক, এক দুই, এক দুই তিন, এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার পাঁচ ইত্যাদি এবং গোনার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে লাল ও নীল অংশ স্পর্শ করে। এইভাবে শিশুরা অনায়াসেই ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনতে শেখে। তারপর এই রড দিয়ে খেলতে খেলতে পরীক্ষা করতে করতে সে এই জ্ঞানও লাভ করে যে সবচেয়ে বড় অর্থাৎ ১ মিটার রডের—সমান করতে তাকে ১ ও ৯ ডেসিমিটার, অথবা ৮ ও ২ অথবা ৪ ও ৬ অথবা ৫ ও ৫, অথবা ৩ ও ৭—এই মাপের দুটি রড দিতে হবে।

শিশুর দশ পর্যন্ত সংখ্যার **ধারণা খুব স্পষ্ট করে** হলে, তারপর তাকে এগারো, বারো, ইত্যাদি শেখাতে হবে। দশের বেশী সংখ্যা শেখাবার সময় কাঠি বা পেন্সিল দিয়ে শিশুদের দিয়ে গুনে গুনে দশটি নিয়ে, তা দিয়ে একটি আঁটি বাঁধবেন। এই আঁটিতে দশটি পেন্সিল বা কাঠি আছে, কাজেই তা হবে **এক দশ**। এগারো হবে একদশ এক,—বারো হবে একদশ দুই—এভাবে উনিশ পর্যন্ত শেখাবার পর, দুটো দশকের আঁটি দিয়ে দুই দশের ধারণা দিতে হবে। উনিশ, ঊনত্রিশ, ঊনচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ—এগুলি অনেক সময়ই ছোটরা গোলমাল করে ফেলে; শিক্ষিকার এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সংখ্যার ধারণা দোকান দোকান খেলার মাধ্যমে বেশ ভাল করেই হতে পারে, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের দোকান করলে, তাদের ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদির অপরিস্ফুট ধারণাগুলি অনেক বেশী পরিষ্কার হয়ে যায়। দুধ বিক্রির বা শরবতের দোকান করলে **বড় ১ লিটার** যে **মাঝারি দুটি আধ লিটারে** হয়, অথবা **৪টি ছোট বোতলে** হয়, তা সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝে নেবে। ছোট ছোট দাঁড়িপাল্লা তৈরী করে **১ কিলো ও আধ কিলো** (সত্যিকার মাপের) বালি (ছোটরা বলবে চিনি) অথবা ইটের টুকরো (ছোটদের মতে লজেন্স) বিক্রি করে ওজন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। ফিতে, লেস ইত্যাদির দোকান করে তারা মিটার সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করে; **ছোট বড়, সরু মোটা**—এসব ধারণা তাদের আছেই। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে, লেস ফিতে ইত্যাদির দামের যে তারতম্য হয়, তা শিশুদের দোকান দোকান খেলার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এই দোকান দোকান খেলতে খেলতেই শিশুরা বিভিন্ন মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত হয়; মুদ্রা নেড়েচেড়ে দেখে তাদের আকৃতি, আয়তন ও মূল্য সম্বন্ধে

শিক্ষালাভ করে; দোকানের কোন জিনিস কিনতে হলে কি মুদ্রার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও তার ধারণা জন্মে। বলা বাহুল্য, দোকান করার সময়, প্রথমে শিক্ষিকাকেই দোকানদার হতে হবে, ও তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে দুইজন শিশু থাকবে। শিশুরা জিনিসের দাম দেখে বা দাম জিজ্ঞেস করে, তারপর ঠিকমত পয়সা গুণে দিচ্ছে কিনা, সেটা প্রথম প্রথম শিক্ষিকা দেখে নেবেন—তারপর তাঁর সাহায্যকারীরাই ঐ কাজ করবে। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন দোকান হলে, শিক্ষিকা **প্রত্যেকটি** দোকানের কাজে **সাহায্য ও পর্যবেক্ষণের** জন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যয় করবেন—একই দোকানে যেন বেশী **ভীড় বা গোলমাল না হয়,** সেদিকেও লক্ষ্য রাখবেন। বিভিন্ন দোকান থাকলে, কে সেদিন কোন্ দোকানে খেলা করবে, তা আগে থেকে শিশুদের ইচ্ছানুযায়ী ঠিক করে নিলে, অযথা হট্টগোল এড়ানো যায়। শিশুরা তাদের নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে, পয়সা দিয়ে **পছন্দমত জিনিস কিনে** নিজের জায়গায় ফিরে আসে; এসে দেখে তার কাছে আর কত পয়সা অবশিষ্ট আছে। তারপর সে আবার অন্য দোকানে যায়—আবার তার **পছন্দমত জিনিস** কেনে। এই ভাবে শিশুর আগ্রহ অনুসারে সমগ্র "দোকান দোকান" খেলাটি পরিচালনা করা হয়—একেই বলা হয় **motivation**। বলা বাহুল্য, এ স্তরে—ওজন, দৈর্ঘ্য বা সংখ্যা লেখার জন্য **জোর করা হয় না; মৌখিক হিসাব করাকেই** প্রাধান্য দেওয়া হয়। কাজেই লিখতে বা পড়তে না পারলেও,—প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে এই সব কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে গণিতের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুর পরিচয় সহজ ও সার্থক হয়।

সংখ্যার ধারণা করা প্রকৃতপক্ষে প্রথম অবস্থায় একটি জটিল ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে **থর্নডাইকের মতামত** লিপিবদ্ধ করা হল। থর্নডাইক সংখ্যার অর্থজ্ঞানের **চার প্রকারের** ব্যাখ্যার কথা বলেছেন; যথা—(১) **পারম্পরিক** (Series) **অর্থ**; অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে ৪ সংখ্যাটি ৩ এবং ৫-এর মধ্যবর্তী একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সমষ্টির অন্যতম।

(২) **সমষ্টিগত** (Collection) **অর্থ**—অর্থাৎ ৪ নির্দেশ করে চারটি এককের সমষ্টি অথবা ৩ নির্দেশ করে অনুরূপ তিনটি এককের সমষ্টি।

(৩) **আনুপাতিক** (Ratio) **অর্থ**—যেমন ধরা যাব, ২ সংখ্যাটি; এটি হল যাকে একক বলা হয়, তার দ্বিগুণ, ৩ সংখ্যা—যাকে একক বলা হয়, তার তিন গুণ ইত্যাদি।

(৪) সর্বশেষে **সম্বন্ধগত** (Relational) **অর্থ**—এটাতে কোনও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার সংখ্যা সম্পর্কীয় যাবতীয় সম্বন্ধ ও তথ্যসমূহের অর্থ বোঝা যায়। থর্নডাইকের মতে—শিশুদের এবং জুনিয়র স্কুলের ছেলেমেয়েদের এই **চারটি অর্থের** প্রতিই নজর দিতে হবে। **চার** হচ্ছে এমন একটি জিনিস যেটি তিন এবং পাঁচের মধ্যবর্তী **পারস্পরিক সংখ্যা সমষ্টির মধ্যে** ; এই সংখ্যাটি **কয়েকটি পৃথক বস্তুর সমষ্টি** একটা **নামরূপ** ; এটি সর্বতোভাবে চারটি **এককের গুণফলের দ্বারা** সৃষ্ট (৪ পোয়া দুধে ১ সের হয়,—অথবা ১ সের দুধে চারটি পৃথক পৃথক পোয়া আছে)। আমরা আরও জানতে পারি যে, **চার** এমন একটা জিনিস—**যা তিনের সঙ্গে এক যোগ করলে** পাই—**দশের থেকে ছয় বাদ দিলে** পাই—**দুটো দুই একসঙ্গে নিলে পাই** অথবা **আটের অর্ধেক নিলে পাই**। একটি বিশিষ্ট সংখ্যার অর্থ বুঝতে হলে—আমাদের সংখ্যাটির এই **চার ধরনের অর্থই** বুঝতে হবে,—তবেই সংখ্যাজ্ঞান সার্থক হবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি-পর্বের **প্রয়োজনীয়তা** কতটা, তা আমরা দেখিয়েছি। বলা বাহুল্য, গণিত এবং অঙ্ক শেখার বেলায় এই প্রস্তুতি-পর্বের গুরুত্ব আরও অনেকাংশেই বেশী।

পরিবেশ-পরিচিতি

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি—এই নিয়ে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে মতভেদের শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শের মূলসূত্রের পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দেশ-কাল ভেদে সকল মতদ্বন্দ্বের মধ্যেও শিক্ষার একটি মাত্র মূলসূত্রে সকলেই বিশ্বাসী; সেটি হল—"শিক্ষা" কথাটির অর্থ "Adjustment"। এই Adjustment বা মানিয়ে নেওয়ার জন্যই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জানতে হয়। সমাজ-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল—এসব কিছুই মানুষকে তার পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। যেহেতু কেবলমাত্র প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার কথাই আমরা এ পুস্তকে আলোচনা করছি, তাই আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা পরিবেশ পরিচিতির শুধুমাত্র প্রকৃতি-বিজ্ঞান অংশটুকুই আলোচনা করব।

মানুষে মানুষে দেখার মধ্যেও পার্থক্য আছে। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে, আমরা সেটাকে সাদা চোখে দেখি—সাধারণ ঘটনার পর্যায়েই তাকে ফেলি। কিন্তু কবিরা সেই সাধারণ ঘটনার মধ্যে কত রং, কত ছন্দ ও সুষমার সন্ধান পান; বৈজ্ঞানিকরা সেই সাধারণ ঘটনা থেকে কতই না অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আমরা রোজই তো কত জিনিস দেখি, কিন্তু সত্যিকার সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে তো দেখি না; আবার দেখার সু-অভ্যাস গঠিত না হওয়ার ফলে, কত অমূল্য জিনিস আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। তাই তো কবিগুরু আক্ষেপ করে বলেছেন—বহু দিন ধরে, বহু দেশ ঘুরে কতই না জিনিস তিনি দেখলেন, কিন্তু—

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের ওপর
একটি শিশির বিন্দু!"

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই অসম্পূর্ণতাকে দূর করতে হবে। সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে, আবিষ্কারকের ভূমিকা নিয়ে শিশুরা যাতে তাদের পরিবেশকে জানতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে, আর সেই লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—আমাদের সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

(১) শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ করা। (২) শিশুর ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি সাধন করা। (৩) আবিষ্কার করবার, দেখে জানবার বা পরীক্ষা করার মনোবৃত্তিকে জাগ্রত করা। (৪) বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য নিরীক্ষণ, কার্যকারণ সম্বন্ধ, এবং মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু জানা।

শিক্ষার পদ্ধতি

প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে এতে শিশুকে দেখবার, পরীক্ষা করবার ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবার সুযোগ দিতে হবে। "Second-hand-knowledge" বা হাত-ফেরতা জ্ঞান শিশুর কাছে নিরর্থক।

শিশু বাড়িতে বা নার্সারীতে প্রথমে কথোপকথনে, পরে ছড়া ও গল্পের সাহায্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারে—যদিও সে জ্ঞান তার অসম্পূর্ণই থাকে। যেমন—

ফলের নাম—

"শশা আর কলা খাও, খাও পাকা আম।
আনারস, ডাব, আতা আর কালো জাম।"

ঋতু প্রসঙ্গে—

"দিনের আলো নিভে এল, সূর্য ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে, চাঁদের লোভে লোভে॥"

অথবা— "শীত, শীত, শীত!
তুমি যখন আস তখন কেন এত শীত?
পরতে হয় গরম জামা, হাওয়ায় হয় খেলতে মানা।
কেন, কেন, শীত?"

এই সব ছড়াতে প্রথমে শিশুরা শুধু নামই জানতে পারে। পরে যখন বাস্তব ক্ষেত্রে ডাব, আনারস, আতা প্রভৃতি দেখে, অথবা মেঘের কালো ছায়া দেখে, তখনই ঐসব জিনিস সম্বন্ধে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদে বই-এর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা চলে না। প্রকৃতির বিরাট রাজ্যই শিশুর পাঠ্যপুস্তক। ছোট্ট একটা হলদে পাখি শিশুরা দেখল—সে যে কিচির কিচির করে ডাকছে, গাছের ডালে বসে ডানা নাড়ছে, তাও দেখল। তারপর পাখিটা যখন উড়ে চলে গেল, শিশুরাও তার পেছন পেছন খানিকক্ষণ ছুটল—পরে যখন পাখিটাকে আর দেখা গেল না,—তখন ফিরে এসে পাখি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে অজস্র প্রশ্ন করে, তাদের জানবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করতে চাইল। যেসব নার্সারীতে অবারিত খোলা মাঠের মেলা, সেখানে কাঠবেড়ালী শিশুদের নিত্য সঙ্গী। রোজই সেখানে শিশুরা কাঠবেড়ালী দেখে—তার পিঠটা কেমন ডোরাকাটা, লেজটা কেমন সুন্দর, বড় আর লোমে ঢাকা, লেজটা কেমন করে সে অনায়াসে পিঠের ওপর নিয়ে যেতে পারে, কেমন করে লেজটা দোলায়, কেমন করে খুটুর খুটুর করে হাত দিয়ে খায়, কেমন করেই-বা অবাক হয়ে ছোটদের দিকে একটুখানি তাকিয়ে, হঠাৎ দ্রুত ছুটে পালিয়ে যায়—এ সবই ছোটরা দেখে। এ দেখেই তাদের শিক্ষা হয়। বড়দের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে অধিকতর আনন্দলাভ করে।

আমাদের নার্সারীতে দেখা আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। অনিয়ন্ত্রিত খেলার সময় শিশুরা মাঠে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, খেলাও করছে। সাড়ে তিন বছরের শমী একটা শামুক দেখে বলে উঠল, "দেখ, দেখ, একটা শামুক।" চার বৎসরের সুস্মিতা বলল, "এটা তো শঙ্খ-শামুক।" তখন প্রশ্ন হল, "কি করে জানলে?" সুস্মিতা উত্তর দিল, "ওটা শাঁখের মত দেখতে কিনা, তাই ওটা শঙ্খ-শামুক। আমার মা বলে দিয়েছেন।" তারপর বাচ্চাদের চোখে পড়ল, শামুকটা নড়ছে, আর তার মাথার কাছে দুটো লম্বা জিনিসও এদিক-ওদিক করে নড়ছে। বাচ্চারা ছুটে গিয়ে দিদিমণিকে ডেকে আনল—জানতে চাইল, ও দুটো কি জিনিস! দিদিমণি ওদের বুঝিয়ে বললেন, "ও দুটোর নাম শুঁড়। এ দুটো এদিক-ওদিক করে নেড়ে-চেড়ে শামুকটা দেখে নেয়, পথে কোন বিপদ আছে কি না।"

"গায়ের ওপর ওটা কি?"—ছোটদের এই প্রশ্নের উত্তরে দিদিমণি যখন বললেন, "ওটা শামুকের বাড়ি", ছোটরা তখন হেসেই আকুল।

"যাঃ, বাড়ি কি কেউ সঙ্গে নিয়ে যায়?"

তখন শিক্ষিকা ওদের বললেন, "বাড়ি আমরা কেউ সঙ্গে নিয়ে যাই না,—কিন্তু শামুকেরা নেয়।"

"কেন নেয় ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে আবার শিক্ষিকাকে শামুকের শরীরের ভেতরের অংশটি দেখিয়ে দিয়ে বলতে হল, "দেখেছ তো, ওদের শরীরটা কত নরম—একটু লাগলেই ওদের খুব বেশী ব্যথা লাগে, তাই ঐরকম শক্ত বাড়িটা ওরা সঙ্গে নিয়েই বেড়ায়। বিপদ দেখলেই বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। বাড়িটা তো সব সময়ই শামুকের সঙ্গে থাকে তাই খুব সুবিধে।"

ছোটরা মন্তব্য করল, "আমরা আমাদের বাড়িটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে খুব মজা হতো ; কিন্তু আমাদের বাড়িটা যে মস্ত বড় !" তারপর শামুকের বাড়িতে দরজা, জানালা আছে কিনা,—খাবার বা শোবার জায়গা, পায়খানা ইত্যাদি আছে কি না—এমনি অজস্র প্রশ্ন ! শামুকরা কি খায়—এ-প্রশ্নও আলোচিত হল। হঠাৎ ছোট্ট রবির দৃষ্টি পড়ল, কাছের একটি কলাগাছের পাতায় আর একটি শঙ্খ-শামুক আটকে আছে। রবি ঐদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ; তারা জানতে চাইল, "কি করে শামুকটা ওখানে গেল ?" "কেউ কি ওকে ওখানে উঠিয়ে দিয়েছে ?" উত্তরে শিক্ষিকা ওদের বলে দিলেন যে শামুকরা কি করে জলে ও মাটিতে চলতে পারে, আবার কি করে গাছ বা দেওয়াল বেয়ে বেয়ে উঠতে পারে।

এমনি ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ছোটরা কত জিনিস আনন্দের সঙ্গে শেখে। তারা প্রথমে কিছু শেখে দেখে—তারপর তাদের কৌতূহলী মন যখন আরও তথ্য জানতে চায়। তখন তারা প্রশ্ন করে বড়দের কাছে সাহায্য চায়। এমনি করেই শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বেড়ে চলে—এখানে জোর-জবরদস্তি, বই পুস্তক বা মুখস্থের কোন স্থান নেই।

"হেস্টিংস-হাউসের" অবারিত মাঠে, নানা ফুলবাগানে অজস্র প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। ছোটরা প্রজাপতির বর্ণ-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়—নিজেরা ঐসব প্রজাপতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদেরই মত পাখা নেড়ে নেড়ে বলে—

"আমরা ছোট্ট প্রজাপতি, নেইকো মোদের ডানা।
সারা দিন ঘুরি ফিরি, নেইকো কোন মানা ॥"

অথবা প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটে যায় আর বলে—

"প্রজাপতি, প্রজাপতি,
নেচে নেচে দ্রুত অতি,
যাচ্ছ ফুলে ফুলে।"

তারপর তাদের ছোট্ট মনে জিজ্ঞাসা জাগে, কোথেকে এই প্রজাপতি এল ? আমাদের নার্সারীর বাগানে কয়েকটি লেবুগাছ আছে। শিশুরা একদিন লেবু-গাছের কাছে খেলা করবার সময় কয়েকটা শুঁয়োপোকা দেখতে পেয়ে, ওদের কথাও জানতে চাইল। ঐ গাছেরই পাতায় কয়েকটি ডিম ছিল ; ছোটদের তা দেখানো হল। এরপর শিক্ষিকা দুটি শুঁয়োপোকাকে এনে একটা কাঁচের বৈয়ামে রেখে, ওপরটা জাল দিয়ে ঢেকে দিলেন। বৈয়ামের ভেতর লেবুগাছের একটা শুকনো ডাল রাখা হল। শিশুরা রোজ পোকা দুটোকে লেবুগাছের পাতা খেতে দিত, আর নোংরাগুলি পরিষ্কার করত। ক্রমে ক্রমে শিশুরা অবাক হলে দেখল যে, ঐ পোকারা আর খাচ্ছে না—এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে, আর তাদের শরীরগুলো বেঁকে গিয়েছে। তারও কিছুদিন পর যখন গুটিগুলি ফেটে গিয়ে প্রজাপতি হয়, তখন ছোটদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকে না। বাগানে ঐ প্রজাপতির রং-এর কোনও প্রজাপতি দেখলে—"আমার প্রজাপতি" বলে শিশুরা গর্ব অনুভব করে। প্রজাপতির জীবনে চারটি স্তর আছে, যথা—ডিম, শুঁয়োপোকা, পুত্তলী ও প্রজাপতি—এই ভাবে না জেনে মুখস্থ করালে, তা শিশুর ভাল লাগে না ; তাই সে সহজেই ঐ সব স্তরের কথা ভুলে যায়। কিন্তু যে শিশু নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজে কাজ করে প্রজাপতির এই রূপান্তর দেখেছে, সে অতি সহজেই এর সব খুঁটিনাটি মনে রাখতে পারে। এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই ছড়াটি এই সময় শিশুরা খুশী হয়ে শিখবে—

শুঁয়োপোকা পাতা খায়, গুটি গুটি পায়ে যায়।
শেষ কালে খাওয়া ভোলে, গুটি বেঁধে গাছে ঝোলে ॥
গুটির ভেতরে থেকে, ঘুম দিয়ে থাকে সুখে।
ক্রমে ক্রমে ক্রমে তার, কি আজব কারবার ॥
শরীরটি বদলায়, প্রজাপতি হয়ে যায়।
উড়ে যায় ঢের দূর, আনন্দে ভরপুর ॥

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও সহজ ও স্বাভাবিক।

আরও দৃষ্টান্ত আছে। একদিন নার্সারী বাগানে বড় গাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে বসে আছি, ছোটরা আশপাশে খেলা করছে। একটু দূরে পুরোনো ঝরা পাতা স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে, পরে পুড়িয়ে বাগানের সার করা

হবে। হঠাৎ একটা খ্যাপা বাতাস চপল নৃত্য-ভঙ্গীতে সব কিছুকে ওলটপালট করে শুকনো ঝরাপাতাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে পালিয়ে গেল। ছোটরা এই দেখে বলাবলি করছিল, "বাব্বা! কি বাতাস!" "সব কিছুকে উড়িয়ে নিচ্ছে!" "বাতাসটা এইদিকে গেল।" "কি করে বুঝলি ?" "কেন ?—বাতাসের সঙ্গে যে পাতাগুলোও গেল।"

ঘটনাটি ছোট কিন্তু দেখার চোখ থাকলে, এ ঘটনা শিশুকে বৈজ্ঞানিক করে তুলতে সহায়তা করে ; বাতাসের গতি কোন্ দিকে, অভিজ্ঞতার ফলে শিশু সহজেই তা বুঝতে পারে।

হেস্টিংস-হাউসের খোলা মাঠে সবুজের প্রাচুর্য। তাল, তমাল, অশ্বথ, কৃষ্ণচূড়া—এসব বনস্পতির সঙ্গে কত লতাগুল্মই না রয়েছে। নার্সারীর বাচ্চারা এসব দেখে—তাদের ছোট্ট মনে কত প্রশ্নের উদয় হয়—তারা কত কি শেখে। শীতের দিনে আবার তারা গরম জামা গায়ে দিয়ে, বিস্মিত হয়ে দেখে প্রকৃতির রিক্ত রূপ ; তাদের অতি পরিচিত আমড়া ও কৃষ্ণচুড়া গাছে একটিও পাতা নেই ; তখন তারা জানতে পারে, এটা **শীতকাল**। আবার যখন ঐ রিক্ত গাছগুলি পুঞ্জ পুঞ্জ কিশলয়ে অথবা অপর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে সজ্জিত হয়ে ওঠে, চারপাশে লাল সবুজ হলুদের অজস্র সমারোহ দেখা দেয়, শিশুরা বুঝতে পারে যে একটা পরিবর্তন এসেছে ; আর এই পরিবর্তিত সময়ের নাম **বসন্তকাল**। এমনিভাবে, যখন খুব গরম লাগে, ঘাম হয়, পাখা চালাতে হয়, তখন সেটা **গরমকাল**। আবার যখন আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে থাকে—দিনের আলো ম্লান হয়ে অবিরত বর্ষণ শুরু হয়, শিশুরা বুঝতে পারে যে এটা বৃষ্টি বা বর্ষণের সময়—**বর্ষাকাল**। মোটামুটিভাবে এই চারটি ঋতুর জ্ঞান কচি শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট এবং তারা অনায়াসেই পারিপার্শ্বিকের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

আমাদের নার্সারীর বেষ্টনীর তারে কিছু লতাগাছ ছিল ; এতে সুন্দর গোলাপী ফুল ফুটত। গ্রীষ্মকালে এই লতাগুলি শুকিয়ে গেলে শিশুরা নিম্নরূপ কথাবার্তা বলছিল, "গাছের লতাগুলো এরকম হল কেন ?" "শুকিয়ে গেছে।" "গাছে আর ফুল হবে না ?" "কি করে হবে ? গাছটি তো মরে গেছে।" "কেন মরে গেল ?" "বোধহয় জল দেয়নি।" এখানে শিশুরাই প্রশ্নকর্তা এবং শিশুরাই উত্তরদাতা। এদের কথাবার্তায় বুঝতে পারা যায় যে গাছের যে প্রাণ আছে,

তারাও যে **বেঁচে থাকে**, আর বেঁচে থাকার জন্য গাছেরও যে জল ইত্যাদির প্রয়োজন, এ প্রাথমিক জ্ঞান শিশুদের হয়েছে।

যেসব স্থলে এমন উদার পরিবেশের প্রাচুর্য নেই, সেখানে নিম্নরূপ বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা—

(১) শিশুদের মাঝে মাঝে ভ্রমণে নিয়ে যেতে হবে। তারা যদি তখন কোন বিশেষ পশু, পাখি, বা গাছপালা দেখে তাদের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়, তবে সেই বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করা যেতে পারে।

(২) শিশুরা পাখির পালক, শামুক, ঝিনুক, প্রজাপতি, গুটিপোকা বা অন্য জীবজন্তু সংগ্রহ করে আনলে, তা শ্রেণীকক্ষের এক কোণায় সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যায়। এইখানে কোনও ছোট পাত্রে চারাগাছও রাখা চলে। পরে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

(৩) বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা, ফুল বা পালক সংগ্রহ করে খেলার ছলে— কোন্‌টা কোন গাছের পাতা, ফুলের নাম কি অথবা কোন্ পাখির পালক—তা শিশু বুঝতে পারে কিনা দেখা। পরে এসব দিয়ে "পাতার বই" "ফুলের বই", "পালকের বই" ইত্যাদি আহরণী পুস্তক করা যায়।

(৪) একোয়েরিয়াম বা কাচের কৃত্রিম জলাশয়ে মাছ, ব্যাঙাচি ও শামুক রাখা যায়। ব্যাঙাচির রূপান্তর, মাছের চলাফেরা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জন কার্য—এসব শিশুরা স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে পায়।

(৫) নার্সারীতে কিছু জীবজন্তু বা পাখি পুষলে ছোটরা এদের ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি লক্ষ্য করতে পারে। ছোটরা মাঝে মাঝে ওদের খেতেও দিতে পারে। খরগোশ, গিনিপিগ, হাঁস, মুরগী, মুনিয়া, টিয়া প্রভৃতি রাখতে পারা যায়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এদের থাকার জায়গা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এদের দেখে কোন্ পাখি ডিম পাড়ে, কাদের বাচ্ছা হয়, এসব জানতে পারবে। জীবজন্তু বা পশু পাখিদেরও যে তাদেরই মত **প্রাণ** আছে, এটা বুঝলে ইতর প্রাণীর প্রতি শিশুদের অনুকম্পা ও মমত্ববোধ জাগবে।

(৬) পশুপাখি পোষার জন্য জায়গার অসুবিধে হলে, জানালার ধারে বা কোন খোলা জায়গায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে রুটির টুকরো, ধান, ছোলা ইত্যাদি এবং একটি পাত্রে জল রাখতে হবে। খাবার লোভে পাখিরা এলে—তখন

কোন্‌টা কোন্ পাখি, সে পাখি কি খায়, তার ডানা কেমন, রং কি, কেমন করে ওড়ে, কিভাবে ডাকে—এ সবই জানা যায়। পাখিরা যে শুধু খাবেই তা নয়,—পাত্রের জলে কোন কোন পাখি স্নানও করে। এইভাবে পাখি সম্বন্ধে নানা বাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুরা অনায়াসেই অর্জন করতে পারে।

বাগান করা

শিশুচিত্তের বিকাশের জন্য শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই বাগান করার ওপর জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মণ্টেসরী বলেছেন,—Through gardening—children "are initiated into foresight……into virtue of patience and into confident expectation which is a form of faith and of philosophy of life." অর্থাৎ বাগান করার মাধ্যমে জীবন দর্শনের মূল যে দূরদৃষ্টি, ধীরতা ও বিশ্বাস, তাতে শিশুরা দীক্ষিত হয়।

গান্ধীজি যে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন, তা ছিল জীবন-কেন্দ্রিক। জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত কাজগুলি করে শিশু আদর্শ সমাজের উপযুক্ত মানুষ হয়ে উঠবে—এই ছিল গান্ধীজির বাসনা। আমাদের জীবনের সঙ্গে 'অন্ন' উৎপাদনের প্রশ্নটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বাগান করার মাধ্যমে এর হাতেখড়ি হতে পারে।

বাগান করার জন্য প্রথমে দরকার মাটি তৈরী করা। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা একাজের উপযোগী নয়। মাটি তৈরী করিয়ে নিলে শিশুরা ঘাস বাছতে পারবে, খুরপী বা ছোট্ট মুগুর দিয়ে মাটিকে আরও ভেঙ্গে চাষের উপযোগী করতে পারবে, আর হাত দিয়ে মাটিকে সমান করতে পারবে। তারা ছোট ছোট ঝারিতে করে গাছে জলও দিতে পারবে। অন্যান্য কাজ—যেমন বীজ বোনা, গাছের গোড়া খুঁড়ে দেওয়া, পোকামাকড় বাছা—এসব কাজ একেবারে শিশুদের উপযোগী নয়। শিক্ষিকা এসব কাজ নিজে করবেন—কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি-একটি অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর সাহায্য নেবেন। দীর্ঘদিন পরে যে গাছে ফসল হবে, সেই ধরনের বাগানের কাজ নার্সারী শিশুদের পক্ষে ঠিক হবে না—কেননা, তারা তত দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে ফসলের প্রতীক্ষা করতে পারে না। শিশুদের জলখাবারে খাবার জন্য সরষে শাক, লেটুস জাতীয় শস্য চাষ ছোটদের উপযোগী। তবে ফসল তোলার কাজ একেবারে ছোটরাও করতে পারে।

আমাদের নার্সারীর বাগানের টম্যাটো, গাজর প্রভৃতি শিশুরাই অপার আনন্দের সঙ্গে সংগ্রহ করে—আর টিফিনের সময় সে সব খেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

অল্প আয়াসে, তাড়াতাড়ি যে সব ফুল হয়, তাও শিশুরা করতে সাহায্য করতে পারে। বাগানের কাজ আংশিকভাবে করলেও শিশু-মনে এই বিশ্বাস জাগে যে এটা তাদেরই বাগান, বাগানে কত সুন্দর ফুল হবে—চারিদিক কেমন ভাল দেখাবে—কাজেই আমরা কেউ ফুল ছিঁড়ব না।

আমরা জানি, শিশুর মধ্যে দুটি প্রবল বিরোধী-শক্তি কাজ করে—এর একটি সৃজন-প্রবৃত্তি, অন্যটি ধ্বংস প্রবৃত্তি। অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলি যাতে পথ পরিবর্তন করে কোন শুভকর পথে বিকশিত হয়, তার ব্যবস্থা শিক্ষিকাকে করতে হয়, আবার বাঞ্ছিত ও সৎ প্রবৃত্তিগুলিরও যাতে সুষম বিকাশ হয়, সেদিকেও শিক্ষিকার সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হয়। এই দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয় বাগান করার কাজে। চারাগাছগুলি ছোট্ট, অসহায়—তাই শিশু দরদ দিয়ে মমতা দিয়ে এদের পালন করবে—আবার এদেরই কল্যাণের জন্য কীট-পতঙ্গ ও আগাছাকে ধ্বংস করবে, মুগুর দিয়ে মাটি ভেঙ্গে দেবার সময় এই ধ্বংস প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

শিশুর মনে জীবন রহস্যের জন্য অফুরন্ত জিজ্ঞাসা জাগে। মানুষের জগতের এ রহস্যজাল সে ছিন্ন করতে পারে না। জীবজন্তুর পারিবারিক জীবনের কিছুটা আভাস পায়—আর উদ্ভিদ জগতে এসে এ রহস্য তার কাছে অনেক পরিষ্কার হয়ে যায়। ফুলেরও যে বাবা ও মা আছে, তাদেরও যে শিশু-পুষ্প হয়, সেই শিশু-কোরক কি করে ধীরে ধীরে বর্ণে গন্ধে বিকশিত হয়ে যৌবনে উপনীত হয় এবং ফুল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তা শিশুর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

নার্সারীর উৎপন্ন ফসল দিয়ে মাঝে মাঝে "চড়ুই ভাতি"র ব্যবস্থা করলে শিশুরা খুব আনন্দলাভ করবে। বাগান, পশুপাখি বা বিভিন্ন ঋতু সংক্রান্ত ছড়া, গান বা অভিনয়ের সাহায্যে এ আনন্দ আরও বাড়ানো যেতে পারে। বাগান করতে যাবার সময় ছোটরা প্রফুল্ল মনে গাইতে পারে—

> "আর রোদ কোথায়ও নাই,—চল বাগানেতে যাই।
> এই আমার কলসি, তোমার খুরপী কোথা ভাই?
> গাছগুলিকে যতন করে, জল ছিটাব ভাল করে—
> ছুটির পর সন্ধ্যেবেলা যত সময় পাই॥"

শিশুদের দিয়ে বাগানের **কাজ করাবার সময় কয়েকটি দিকে দৃষ্টি** দিতে হবে। যথা—

(১) উদ্যানের পরিবেশ যেন শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী হয়। ভিজে, স্যাঁতসেতে মাটিতে কাজ করা চলবে না।

(২) শিশুর কাজের সময়টি তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া দরকার। সকালের সূর্যের আলোকে তার স্বাস্থ্য ভাল হয়—তখন সে বাগানের কাজ করবে। গরমের দিনে প্রচণ্ড রৌদ্রে কাজ করা চলবে না—শীতকালে দুপুরে কাজ করা যেতে পারে।

(৩) শিশুরা একসঙ্গে বেশীক্ষণ কাজ করতে ক্লান্তিবোধ করে, সুতরাং কাজের সময় দীর্ঘ হলে চলবে না। ১৫—২০ মিনিটের বেশী সময় শিশুরা একটানা কাজ করবে না।

(৪) জল দেবার ঝারি, খুরপি ইত্যাদি হালকা হবে।

(৫) বয়স ও যোগ্যতা অনুপাতে শিশুরা কাজ করবে।

উপসংহারে আর একটি কথা বলতে চাই। বাগান করার মাধ্যমে ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে যেমন শিশুদের **মানসিক** বিকাশ হয়, তেমনি খোলামেলা বাতাসে থাকার দরুন ও সূর্যের আলোর আশীর্বাদে শিশুদের **দৈহিক** উন্নতিও হয় প্রচুর। তারা আরো কয়েকটি নৈতিক গুণেরও অধিকারী হয়। গাছের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি দেখে শিশুরা বুঝতে পারে যে গাছেরও তাদের মত প্রাণ আছে—আর সেই প্রাণধারণের জন্য গাছেরও খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন। তাই তো "গাছ কি খায়?" "গাছের তো মুখ নেই, তবে সে কোথা দিয়ে খায়?" —এমনি অজস্র প্রশ্ন শিশুরা করে। আমরা কত খেলা করি, ছুটোছুটি করি, গাছটি তো তা পারে না—তাই গাছের প্রতি তাদের **অনুকম্পা** জাগে। তাদের ছোট ভাইটিরই মত শিশু-তরুটির অসহায়তার কথা ভেবে ছোটদের মনে **মমতা-বোধ** জাগে। বীজ লাগিয়ে তার থেকে অঙ্কুর উদ্গমের জন্য অথবা কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার প্রত্যাশায় তাদের অল্প সময়ের জন্য হলেও **ধৈর্য ধরে** প্রতীক্ষা করতে হয়। আর তারা মনে-প্রাণেও **বিশ্বাস** করে যে, বীজের বা কুঁড়ির এই প্রত্যাশিত পরিণতি হবেই। ধৈর্য, মমতা, বিশ্বাস—এই সদ্‌গুণগুলির অধিকারী হওয়া ছোট শিশুর পক্ষে কম গৌরবের নয়।

শিশু-শিক্ষায় সংগীত

সংগীত বলতে সাধারণতঃ আমরা গানকেই বুঝি। প্রকৃতপক্ষে সংগীতের অর্থ অনেক ব্যাপক। কণ্ঠে ধ্বনির সাহায্যে, সুললিত সুরের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, তা হল গান ; এই গান সংগীতেরই একটি অংশ। বিখ্যাত Cecil Forsyth-এর মতে—"Music may be described as the convensional expression of human feeling by means of Rhythm (that is to say, idealised gesture) and Melody (that is to say idealised emotional cries)". অর্থাৎ মানুষের অন্তরের অনুভূতিগুলির রূপদান দুইভাবে করা যায়—একটি হল ছন্দ, অপরটি গান।

আধুনিক সংগীতজ্ঞগণ এই ছন্দকে আবার দুটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন ; ছন্দের একটি শাখা হল বিভিন্ন যন্ত্র সহযোগে বাদ্য বা বাজনা ; অপরটি দেহের বিচিত্র অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ নাচ বা নৃত্য। তা হলে মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে মানুষের সংগীতের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার প্রধানতঃ তিনটি উপায় আছে—প্রথমটি কণ্ঠস্বরের ওঠানামা বা গান ; দ্বিতীয়টি দুটো হাত দিয়ে বা কোনও বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনি তুলে তাল দেওয়া ; আর তৃতীয়টি হচ্ছে দেহের বিচিত্র অঙ্গ-সঞ্চালন অর্থাৎ নৃত্য। **গান, বাজনা ও নাচ**—এই তিনের সুষম সমন্বয় হয় আদর্শ সংগীতে।

সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্য

(১) সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যে রুচিবোধ, পরিমিতিবোধ ও সৌন্দর্য জ্ঞানের প্রয়োজন, সংগীত শিখলে শিশুর সে সকল চাহিদাগুলি মেটে।

(২) ছোট শিশুদের কতকগুলি সহজাত বৃত্তির অন্যতম হল আনন্দানুভূতি। সংগীত শিশুর এই আনন্দানুভূতির সহজ ও সাবলীল প্রকাশের সহায়ক।

(৩) সংগীতের সাহায্যে অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শারীরিক বিকাশও হয়। গানের সময় কণ্ঠের সূক্ষ্ম ও স্থূল মাংসপেশীর ওঠানামা, জিহ্বার সঞ্চালন, নিঃশ্বাসের সংযম ও সমন্বয় রক্ষা করার জন্য ফুসফুস ও বুকের পেশীর ভাল ব্যায়াম হয়। সংগীতের সুমধুর প্রভাবে দেহের ক্লান্তি দূর হয়। নৃত্যের সময় অঙ্গ-সঞ্চালনের দ্বারা শিশু সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

(৪) সংগীত শিশুর বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি বিকাশের সহায়ক।

(৫) সংগীতের মাধ্যমে শিশুর ধারণাশক্তির বৃদ্ধি পায়। কোন্‌টি বিষাদের সুর, কোন্‌টির পদভঙ্গী দৃপ্ত ও বীরত্বব্যঞ্জক, তা শিশু বুঝতে পারে।

(৬) সংগীত শিশুর মনোযোগ ও একাগ্রতাবোধ বৃদ্ধি করে। সুরে ঝংকারে বা নৃত্যের ছন্দের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে শিশু চুপ করে বসে থাকতে শেখে। এইভাবে সে আত্মসংযমেও অভ্যস্ত হয়।

(৭) সংগীতের মাধ্যমে শিশুর ধ্বংসাত্মক বৃত্তি কিয়দংশে চরিতার্থ হয়। এতে শিশু আত্মতৃপ্তি লাভ করে। খুব জোরে জোরে করতাল বাজাবার সময়, দুটো লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি করার সময়, এমনকি ঢোল বা তবলা বাজাবার সময়ও তার এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়।

(৮) সংগীতের মধ্য দিয়ে শিশুর সামাজিক বিকাশও ঘটে। শিশু বুঝতে পারে, গান গাইবার বিশেষ সুর ও নিয়ম আছে; নাচেরও তাল এবং ছন্দ আছে। এই নিয়ম, এই ছন্দ না মানলে গান বেসুরো হয়—নাচের তাল মেলে না। এইসব দেখে শিশু নিজে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখে। বুঝতে শেখে, সমাজে থাকতে হলে এসব গুণ অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

(৯) সমবেত সংগীত পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহমর্মিতার পথ প্রস্তুত করে।

(১০) সংগীতের সুরলহরীর মায়ামন্ত্রে অসামাজিক শিশু সামাজিক গুণসম্পন্ন হতে পারে। এতে লাজুক শিশুর সংকোচ দূর হয়, রুক্ষস্বভাব শিশুর অসন্তোষ-পূর্ণ ভ্রূকুটি মিলিয়ে যায়, বিষণ্ণ ও অসুখী শিশুর মুখে অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে।

(১১) শিশুর বিকাশধর্মের ও আত্মপ্রকাশের চাহিদা সংগীতের মধ্য দিয়ে সহজেই উন্মেষিত হয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে। গানের সুরের মাধুর্যে, বাজনার ঝংকারে, আর নৃত্যের তালে তালে ও অপরূপ ভঙ্গীতে ছোট শিশুরা ফুলের মত ফুটে উঠতে পারে—আর সকলকে মুগ্ধ করতে পারে বিচিত্র সুরে, তালে ও নাচে!

ইতিহাসের খাতা উলটে দেখলে আমরা জানতে পারি যে আদিম যুগে আদিম অধিবাসীরা ভাষার ব্যবহার জানত না; তাদের মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র উপায় ছিল 'ধ্বনি'। ভয় পেলে বা বিপদ এলে তাদের কণ্ঠ থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরুত—আবার শত্রু-জয় করলে বা আনন্দ প্রকাশের জন্য তাদের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হতো অন্য সুর। এই কণ্ঠধ্বনি ছাড়াও বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেত। তাই তো

লব্ধ শিকারকে মাটিতে ফেলে রেখে, তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে তারা উল্লাসে নৃত্য করত। আবার শত্রুকে পরাজিত করে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলে, কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে দেহভঙ্গীর প্রচণ্ড হিল্লোলের মাধ্যমে তারা নিজেদের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করত। সাঁওতালদের মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। আদিবাসীদের প্রকাশভঙ্গীর এই বিশেষ ধারাটি জাতি ও ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশের ধারাস্বরূপ সকল শিশুর মধ্যেই দেখা যায়।

কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি নিয়েই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানের জন্ম হয়। তাই অতি শিশু বয়সে সে ধ্বনি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মাতৃ-জঠরের উষ্ণ আবেষ্টনী থেকে যখন সে এই পৃথিবীতে আসে, তখন তার অস্থবিধার কথা জানায় ক্রন্দন ধ্বনিতে! তাকে লক্ষ্য করে কিছু বললে শিশু হেসে ওঠে,—অল্প জোরে শব্দ করলে সে সেদিকে আকৃষ্ট হয়,—বেশী জোরে শব্দ করলে চমকে ওঠে বা কাঁদে। মা যখন সুর করে ঘুমপাড়ানী গান করেন, শিশু ধীরে ধীরে কান্না থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; একেবারে ছোট শিশুও গানের তালে তালে মাথা বা হাত দোলাতে থাকে। এসব থেকে বোঝা যায় যে ধ্বনি শিশু-মনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইজন্যই বিচিত্র ধ্বনি-বিন্যাসের কলা-কুশলতার ফলে যে-সংগীতের উদ্ভব হয়েছে, তা শিশুদের অতি প্রিয়। আর একটি কথা—সংগীত মানুষের অনুভূতি তৃপ্তির সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক উপায়, তাই শিশুর অনুভূতির জগতেও সংগীতের প্রভাব অসীম, অপরিমেয়।

"জল পড়ে, পাতা নড়ে"—এই দুটি ছত্রের মিল একদা শিশুবয়সে কবিগুরুর চিত্তে দোলা দিয়েছিল। গানের ছন্দ ও ঝংকার, গানের ছত্রে ছত্রে অন্ত্যমিল—এ সবই শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে সে তাল, লয় এসব বুঝতে শেখে। ইচ্ছামত যা খুশী তাই করলে যে **ছন্দ পতন** হয়—এক সঙ্গে কাজ করার মধ্যে যে **ছন্দ-মাধুর্য** আছে, তা শিশু বুঝতে পারে। শিশুর **শোনার কানটি** তৈরী হয়ে গেলে, সে অনায়াসেই প্রথমে দুটি হাতে তালি দিয়ে তাল দেয়; পরে তাকে ঢোল, খোল, করতাল, ঘণ্টা, ঝুমঝুমি, দুটো কাঠি বা ট্যামবুরিন (tambourine) দিলে সে অনায়াসেই তাদের সাহায্যে তাল দিয়ে শব্দ উৎপাদন করতে পারে। শিক্ষিকার বা গ্রামোফোনের গীত-গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশুরা চমৎকার ঐক্যতান বাজনার সুরলহরী সৃষ্টি করতে পারে। এটাকেই বলা হয় "Percussion Band".

আমাদের নার্সারীতে শিশুদের জন্য এই Percussion Band-এর ব্যবস্থা

আছে। শিশুরা যখন প্রথম স্কুলে এসে ভর্তি হয়, তখনি এই Band বাজাতে দেওয়া হয় না ; এর জন্য খানিকটা প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমরা নিজেরা self-discipline বা আন্তর্শাসনের পক্ষপাতী ; তাই নার্সারীর বাচ্চারা যখন জল খেয়ে, বাথরুম সেরে, অনিয়ন্ত্রিত খেলার পর আলোচনা, কথাবার্তা ও প্রার্থনার জন্য গোল হয়ে বসে, তখন বসার সময়—"কথা বলো না",—"গোলমাল করো না"—এসব বলা হয় না। শিশুরা দুজন বা চারজন করে ঘরে এসে, তাদের দলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসতে শুরু করে—তখন শিক্ষিকা গ্রামোফোনে একটি গান বাজাতে থাকেন। ধীরে ধীরে সব শিশুরাই ঘরে আসে, ও চুপ করে বসে গান শোনে ; আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাতে তাল দেয়। রোজ অবশ্য একই গান বাজানো হয় না, কিন্তু একই গান তারা সপ্তাহ বা মাসের মধ্যে বেশ কয়েক বার শোনে। শিক্ষিকা যখন দেখেন যে শিশুরা প্রায় সকলেই সঠিকভাবে হাতে তালি দিতে পারছে, তখন তিনি তাদের বিভিন্ন শব্দোৎপাদক বাজনাগুলি দেন। ঝুমঝুমির শব্দ, দুটো কাঠির গায়ে গায়ে আঘাতের শব্দ, করতালের শব্দ—এমনি নানান ধরনের শব্দ একে অন্যের চেয়ে পৃথক ; তবু এই সব শব্দের বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবলমাত্র তালই এদের ঐক্য আনে। শিশুদের শুধু একটা কথা মানতে বলা হয়, আর সেটা হল—"গ্রামোফোনে যখন বাজনা বাজবে, তখন শুরু করবে না,—**গান আরম্ভ** হলে করবে।" শিশুরা বাজনা সামনে রেখে গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে থাকে। গ্রামোফোনে পরিচিত গানের বাজনা শুরু হয়—শিশুও মনে মনে প্রস্তুত হয়। তারপর যেই গানটি কথায় গীত হতে আরম্ভ হয়, শিশুদের উজ্জ্বল চোখগুলি আনন্দে চকচক করে ওঠে, তারা মনের সুখে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার তোলে। গান যখন শেষ হয়, তারা নিঃশব্দে প্রতিটি বাদ্য নিজের নিজের সামনে রেখে দেয়।

একেবারে ছোটদের অর্থাৎ তিন/চার বছরের বাচ্চাদের জন্য পুরা গানটির তাল-লয় একই ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাড়ে চার বছরের বেশী বয়সের শিশুরা চেষ্টা করলে দুই রকমের তাল-লয়ে গীত গানের সঙ্গেও বাজাতে পারে। আমাদের নার্সারীতে ঐ বয়সের শিশুরা "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" "মধু গন্ধে ভরা"—এই গান দুটির সঙ্গে সফলভাবে Percussion Band বাজাতে পারে ; দুটি গানেই দ্রুত ও ধীর গতির তাল-লয় আছে।

এরপর আসে **নাচের** কথা। প্রাক্ প্রাথমিক শিশুদের যা বয়েস, তাতে এস্তরে নাচ বলতে "কথাকলি", "মণিপুরী" প্রভৃতি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গিমাকে বোঝায় না।

এ স্তরে নাচ হবে সহজ, সরল, শিশুসুলভ দেহভঙ্গীর অভিব্যক্তি! দেড় বছরের ছোট শিশুও তার মানের (standard) উপযুক্ত নাচ দেখাতে পারে। "একটু নেচে দেখাও না!", "নাচ তো মা!"—বড়দের এইরূপ অনুরোধের প্রতিদানে দেড় বছরের শিশু হাত তুলিয়ে তুলিয়ে ভঙ্গী করতে পারে, অথবা একটি পা সামনে এনে তাল দেয়। নাচ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গীর অন্যতম মাধ্যম। কাজেই শিশুদের নাচ **শেখাতে** গেলে, তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত যে দেহ-সঞ্চালন, তাই-ই ছোটদের প্রকৃত নৃত্য।

শিশু ছোট্ট, কিন্তু এই পৃথিবীটা বিরাট। শিশু অসীম আগ্রহ নিয়ে এই বিচিত্র পৃথিবীর রূপ-রস গ্রহণ করতে চায়; জানতে চায় তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে! পাতার হিল্লোল, পাখির কূজন, ঝড়ের মাতামাতি, প্রজাপতির বর্ণসুষমা—সবই তার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে; তাই তো সে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে আশপাশের সবকিছুর গতি-প্রকৃতি নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করে। যারা প্রকৃতির অবারিত স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠছে, তাদের পক্ষে এ-কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ। গাছের পাতা কি করে দোলে, প্রজাপতি কেমন করে ওড়ে—ছোট্ট শিশুরা এ-সব খুবই স্বাভাবিক অথচ সুললিত ভঙ্গীতে দেখাতে পারে। শিক্ষিকা কোথায় কিভাবে পদক্ষেপ করলেন, ১, ২, ৩, ৪ বলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে আগু-পিছু হলেন, কেমন করেই বা দেহ-সঞ্চালন করে বিশেষ মুদ্রা দেখালেন—এসব শিশুদের ক্ষেত্রে **অচল**। গতানুগতিক action song **শেখানো**—প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের বিকাশের উপযোগী নয়। শিশু যদি গানের কথার অর্থ বুঝতে পারে,—তার আশপাশের লোকজন বা পরিচিত বস্তু সম্বন্ধে কোন কাজ তাকে করতে বলা হয়, তবে সে অনায়াসে তা করতে পারে—শিক্ষিকাকে গলদঘর্ম হয়ে **শেখাতে** হয় না। নৌকো কি করে বাইতে হয়, সাইকেল কি করে চালাতে হয়, ফসল কি করে কাটতে হয়—এমনি অসংখ্য দেহভঙ্গিমা শিশুরা করতে পারে; আর এই অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশেই তার নৃত্যছন্দ জেগে ওঠে।

সংগীত শিক্ষার বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

(১) প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের একেবারে ছোট শিশুদের জন্য একই ধরনের খুব

সহজ সুরের দ্রুত তালের গান বেছে নিতে হবে। পরে বয়সের ক্রম-অনুযায়ী সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিনের দিকে যাবে।

(২) সংগীতের বিষয়-বস্তু যাতে শিশুদের নিকট আকর্ষণের বস্তু হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিচিত গাছপালা, পশুপাখি, লোকজন, প্রকৃতি—এ সবই হবে শিশুদের সংগীতের বিষয়-বস্তু।

(৩) গানের শব্দচয়ন যেন ছোটদের উপযোগী হয়,—সেদিকে দৃষ্টি রেখে গান বাছতে হবে।

(৪) একসঙ্গে ১৫/২০ মিনিটের বেশী সময় সংগীত শিক্ষা দেওয়া চলবে না,— কারণ শিশুদের মনঃসংযোগ ক্ষমতা একটানা এর বেশী সময় থাকে না।

(৫) সমগ্র গানটি শিক্ষিকা প্রথমে একবার গেয়ে শোনাবেন। এতে গানটির অর্থবোধ ও সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সাহায্য হবে। পরে বয়স অনুযায়ী পংক্তি বা স্তবকের পুনরাবৃত্তি করা হবে।

(৬) গাইবার সময় শিক্ষিকাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—সকলেই গান গাইছে কি না। কোনও ত্রুটির জন্য শিশু গান না গাইলে যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে তা সংশোধন করে দিতে হবে। বেসুরো বা খুব বেশী চেঁচিয়ে বা উচ্চকণ্ঠে গান করলে তাদেরও সস্নেহে সংশোধন করে দিতে হবে।

(৭) শিশুর মা বা শিক্ষিকা শিশুকে সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে শোনাবেন। প্রয়োজন হলে গ্রামোফোন বা "রেকড-প্লেয়ার"ও ব্যবহার করতে পারেন। গান শুনতে শুনতে তাদের কান তৈরী হবে; শিশু সুর ও বেসুরের প্রভেদ বুঝতে শিখবে; পরে বাজনা শুনেই গানটি কি হবে, তা বলে দিতে পারবে। মণ্টেসরী এজন্যই কর্ণেন্দ্রিয় শিক্ষাকে সংগীত শিক্ষার অত্যাবশ্যক ভিত্তি বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

(৮) শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। কোকিলকে অনুকরণ করে "কুহু কুহু", বউ কথা কও পাখির অনুকরণে "বউ কথা কও"—বেশ সুর করে বলতে পারে। কাজেই সহজ সুর হলে, তা অনুকরণ করে শিশু সহজে কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

(৯) শিক্ষিকা সর্বদাই শিশুদের সঙ্গে গান, বাজনা বা নাচ করবেন না। শিশুদের স্বাধীনভাবে ঐসব কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে।

(১০) গানের সময় কোন রকম বাজনার ব্যবহার না করা ভাল। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে শিশুরা খালি গলায় গান গাইতে পারে না—সুর কেটে যায়।

(১১) ছোটদের গান শেখাবার সময় সমবেতভাবেই শেখাতে হবে। কিন্তু

প্রত্যেকে স্বর ও কথা ধরতে পেরেছে কিনা পরখ করার জন্য মাঝে মাঝে শিশুদের এককভাবে গান করতে দেওয়া ভাল ; এতে শিশুর মনে আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।

(১২) প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে যিনি সংগীত শেখাবেন, তাঁর অসীম ধৈর্য এবং শিশুদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি থাকা একান্তই আবশ্যক।

(১৩) গান শেখাবার জন্য এই স্তরে তাড়না করলে চলবে না। স্বরের ছন্দ, তাল ও প্রকাশের ভঙ্গিমাকে শিশুরা মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করবে। নাচ শেখাবার সময় একথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

(১৪) শিশুর আনন্দ প্রকাশের আদিমতম উপায় হল সংগীত। শিক্ষা দিতে গিয়ে, এ আনন্দ-স্রোত যাতে রুদ্ধ হয়ে না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

সংগীতের প্রকার-ভেদ

ছোটদের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে সংগীতকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

(১) প্রার্থনা সংগীত, (২) জাতীয় সংগীত, (৩) খোকাখুকুর সংগীত, (৪) যানবাহন-সংক্রাত সংগীত, (৫) প্রকৃতি বিষয়ক সংগীত, (৬) "আশেপাশে যারা"—তাদের সংগীত, (৭) খেলা-সংক্রান্ত সংগীত, (৮) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত-সংগীত, (৯) উৎসব সংক্রান্ত সংগীত, (১০) মজার গান, অসংলগ্ন গান ও (১১) গল্পের গান।

(১) **প্রার্থনা সংগীত ঃ** প্রতি বিদ্যালয়েই কোন না কোনও সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে। একেবারে ছোট শিশুদের জন্য গাওয়া চলে—

(১) ছোট শিশু মোরা তোমারি করুণা।
(২) তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
(৩) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে

(২) **জাতীয় সংগীত ঃ** ১৫ই আগস্ট পতাকা উত্তোলনের দিন ; এটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশুরা "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গানটির প্রথম স্তবক গান করবে।

(৩) **খোকাখুকুর সংগীত ঃ** খোকাখুকু মায়ের চোখের মণি ; তাদের সন্তুষ্টির জন্য কত ছড়া কত গানই না রচিত হয়েছে !

ক—খোকন খোকন করে মায়।
খোকন গেছে কাদের নায়॥
সাতটা কাকে ভাত খায়।
খোকন রে তুই ঘরে আয়॥

খ—খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে নেবে কি ?
বড় বড় ফুল-বাতাসা, কলস ভরা ঘি।
শিউলি-ফুলের মালা গেঁথে পরবে খোকা গলে,
লাল জুতো পায়ে দিয়ে, নাচবে তালে তালে।

প্রয়োজন-বোধে ছেলে-ভুলানো ছড়াতে সুর সংযোগ করে গান করা চলে ; আমাদের নার্সারীতে প্রায়ই তা করা হয়।

(৪) **যানবাহন সংক্রান্ত সংগীত ঃ** শিশু চিরচঞ্চল, তাই গতিশীল জিনিস শিশু ভালবাসে। রেলগাড়ি, পালকি, নৌকা, সাইকেল, এরোপ্লেন, রকেট—সবই তাই শিশুর প্রিয়।

পালকি— পালকি দোদুল দোলে—হেঁইও, হেঁইও।
সোয়ারি এস বলে—হেঁইও, হেঁইও।
বেয়ারা ভীষণ কালো, নেইকো পথে আলো।
তার চাইতে ভালো—
কমলা লেবু হাতে, খাসিয়া মেয়ের থাপা।

দূর থেকে পালকি আসছে, শব্দ ক্রমেই জোরে হবে। গানের শেষে হেঁইও, হেঁইও শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে।

রেলগাড়ি— রেলগাড়ি, রেলগাড়ি,
ছুটে চলে তাড়াতাড়ি।
মাঝে মাঝে শিস দেয়
ধোঁয়া ছাড়ে, দম নেয়॥

নৌকা— চল চল চলরে চল, নৌকা বেয়ে চল।
টলমল কালো জল ভালো লাগে মোর॥

সাইকেল— সাইকেলে সারাদিন ছুটে চলে ভজা।
ঠনঠন ঘণ্টায় লাগে ভারি মজা ॥
শনশন বনবন ঘোরে তার চাকা।
পার হয়ে চলে যায় পথমাঠ ফাঁকা ॥

রকেট— ভাবছি পূজোয় চাঁদে যাব, চালিয়ে রকেট খুব জোরে।
সঙ্গে নেব ভাবছি মাকে,—জাগিয়ে দেবে খুব ভোরে।

মোটর— চারটে চাকার গাড়িখানা,—নেবে খোকায় বাড়ি।
ঘোড়ায় একে টানে নাকো,—নামটি মোটর গাড়ি ॥
পিঁক পিঁক পিঁক গাড়ি চলে।
খোকন তাতে বসে দোলে ॥

এই সকল গানের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের বিভিন্ন গতিভঙ্গী শিশুরা দেহ-সঞ্চালনে প্রকাশ করবে।

(৫) **প্রকৃতিবিষয়ক সংগীত ঃ** প্রকৃতিতে রয়েছে পশু, পাখি, মৌমাছি—এদের নিয়ে রচিত হয়েছে শিশুদের উপযোগী কত কবিতা, কত গান।

পাখি—ক—চড়ুই পাখি বউ সেজেছে, বর হল তার টিয়ে।
ফুরুৎ করে পালিয়ে গেল, হল না তার বিয়ে ॥
খ—কুহু কুহু কোকিল ডাকে, আম গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
কাকের বাসায় ডিম পেড়ে, কোকিল পালায় দেশ ছেড়ে ॥

পশু—ক—আমরা খরগোশ দলে দলে বাস করি ঐ গাছের তলে।
কড়াইশুঁটি আর কপি ক্ষেতে, লুটোপুটি খাই সবাই মিলে।
খ—বনে থাকি হাতি, মোদের মস্ত শরীরখান।
মূলোর মত দাঁত দুখানি, কুলোর মত কান ॥

তারা— রাতের আকাশে ঝিকিমিকি তারা মোরা ;
মিটি মিটি চোখে চাই,—হেসে যাই আমরা ॥
আকাশের গায়ে যেন, মোরা সব চুমকি।
সারারাত জেগে থাকি, চোখে নাই ঘুমটি।
জোনাকির মত মোরা, আকাশেতে জ্বলছি।
শেষ রাতে মনে হয়, ঘুমে যেন টলছি ॥

মৌমাছি— মোরা—মৌমাছি দল।
আনি মধু ছড়িয়ে রেণু
ফুলে ফুলে বাজিয়ে বেণু,
রঙের বাহার, ফুলের বাহার
খেটে খুটে আনি আহার ॥
মোরা—মৌমাছি দল ॥

ভোমরা— ওই এসেছে ভোমরা কালো,
মারবে বুঝি—হুল ফোটালো ;
উড়ে পালাই চল চল,
প্রাণ করি শীতল ॥

(৬) **আশেপাশে যারা তাদের বিষয়ে সংগীত ঃ** আমরা প্রতিদিন এমন কত পরিচিত জনের মুখ দেখি, যাদের সাহায্য আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের জন্য প্রয়োজন। এদের নিয়ে রচিত হয়েছে কত ছড়া, যেগুলি সুর করে গাওয়া হয়।

পুলিশ— পুলিশ পাহারা দেয়, রাতে ধরে চোর।
আমাদের তরে তারা খাটে দিন ভোর ॥

পিয়ন— আপন জনের দূরের খবর কেমন করে পাই ?
চিঠি দিয়ে জানিয়ে গেল, মোদের পিয়ন ভাই।

অথবা— "পিয়নদাদা, পিয়নদাদা"—ছড়া অংশে দ্রষ্টব্য।
(এটি অপেক্ষাকৃত বড়দের জন্য)।

ঝি— আমি বামুন বাড়ির ঝি।
আমার কী যে খাটুনি, তোমরা জান কি ?
হেঁট হয়ে আর হাঁটু গেড়ে,
সারা বাড়ি দিচ্ছি ঝেড়ে—
(তবু) গিন্নি মায়ের মন ওঠে না,
কেবল বকে ছিঃ!

ধুনুরী— কে ধুনাবে তুলো বাবু, কে ধুনাবে তুলো।
নূতন করে বানান বাবু, তোষক, বালিশগুলো ॥

এমনি করে বসে আমি, বাগাই ধনুকখান।
আঘাত দিলে তাঁতের ওপর ওঠে মধুর তান ॥
ধাঁই ধাপড়ি—ধাপড় ধাই,
ধাঁই ধাপড়ি—ধাপড় ধাই,
ধুপ্ ধাপ্ ধুপ্ ধাপ্—গান শোন চুপ চাপ ॥

মালি— হেঁই, মোর ফুল বাগিচার ফুলের কারিগর।
টাক ডুমাডুম ডুডুম ডুডুম,—সাজাই ফুলের ঘর ॥
আম গাছে ভাই কাঁঠাল ফলাই,—কাঁঠাল গাছে লঙ্কা
গোলাপ ঝাড়ে বকুল ফলাই,—বকুল গাছে চম্পা ॥
শুকনো ডালে মন্ত্রবলে বহাই রং-এর ঝড় ॥
খট খটাখট চালাই কাঁচি, সাফ করে দি জংলা ঝাঁটি,—
ঘাস বিছিয়ে ফুল কেয়ারী সাজাই থরে থর ॥

ধোপা-বৌ—আমি ছোট্ট ধোপা বৌ,—খাই কাপড় ধুয়ে।
ভীষণ বোঝা বয়ে বয়ে শরীর গেছে নুয়ে ॥
ধুতি, শাড়ি কেচে করি অতি পরিষ্কার।
সদাই আমি ব্যস্ত থাকি কাজে আপনার ॥

তাঁতী— একটুখানি জমি নিয়ে করব তুলোর চাষ।
সেই তুলোতে চরকা মোদের চলবে বারো মাস ॥
বং বং বং ধনুক চলে,—
ঘর ঘর ঘর চরকা চলে,—
খট খটাখট মোদের তাঁতে হচ্ছে কাপড় ভাই ॥

চাষী— আয়রে আয় কাস্তে হাতে মাঠে কাটি ধান।
মাটি মোদের প্রাণ রে, মাটি মোদের প্রাণ ॥
সোনার বরণ ধান ফলেছে,—হাওয়ায় মাথা দোলে।
ধানের শীষের মাথার ওপর রোদ ঝলমল করে ॥
আয় রে কাটি ধান মোরা,—আয় রে কাটি ধান ॥

(৭) **খেলা-সংক্রান্ত সংগীত ঃ** খেলাধুলার বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয়েছে নানারকমের গান।

আজ আমরা খেলব খালি, ঘরে যাব না।
লুকাবো গাছের কোণে, খুঁজতে এলে মা ॥
লতার দোলায় আয় না দুলি—
না ভাই ডাল ধরে ঝুলি—
আগে ভাই আয় না ঘুরি,—কেমন ঘুরবে গা ॥

অথবা— আম পাতা জোড়া জোড়া।
মারব চাবুক, চড়ব ঘোড়া ॥
ওরে বিবি সরে দাঁড়া।
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া ॥
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে,
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে ॥

অথবা— এক যে ছিল ঘটোৎকচ—মেজেয় ঠুকত পা।
আর এক যে ছিল পরী, হাওয়ায় ভাসিয়ে দিত গা ॥
মাটির তলায় ইঁদুরগুলি, থাকত পরম সুখে।
ইয়া বড় বল ছিল এক, লাফিয়ে চলত সুখে ॥

এতে দৈত্য, পরী, বল, ইঁদুর—সকলের কাজগুলি অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা দেখিয়ে শিশু খেলা করে ও আনন্দ পায়।

(৮) **স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সংগীত ঃ** ছোট শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যাপক নিয়মগুলি বুঝতে পারা কঠিন। কিন্তু দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো, অথবা বেড়ানো যে ভালো, তা সে সহজে বোঝে। এইসব গানে তা বলা হয়েছে—

আঁচড়াও, আঁচড়াও, আঁচড়াও চুল।
দাঁতটি মাজিতে যেন হয় নাকো ভুল ॥
চটপট জামাখানি পরিয়া লও।
বোতামগুলি তার লাগাও লাগাও ॥
তার পরে জুতো জোড়া পায়ে পরে।
বোতাম বা ফিতে তার লাগিয়ে দেবে ॥
ব্যস্ ব্যস্ প্রস্তুত আমরা সবাই।
চল ভাই এইবার বেড়াইতে যাই ॥

অথবা— চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই।
ঝেড়ে অলস মেজাজ, হবে শরীর ঢালাই ॥
যত ব্যাধির বালাই, বলবে পালাই, পালাই।
পেটে ক্ষিধের জ্বালায়—খাব ক্ষীর আর মালাই ॥

(৯) **উৎসব-সংক্রান্ত সংগীত ঃ** আমাদের দেশে পাল-পার্বন উৎসবের শেষ নেই। এসব নিয়ে রচিত হয়েছে কত সংগীত।

"ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল,
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল ॥" ইত্যাদি।

অথবা— ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বাজে, ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বাজে,
দুর্গাপূজার হৈ হল্লায় আয় রে মাতি আয়।
টাক ডুমাডুম ঢাক বাজে আর সঙ্গে বাজে কাঁসি।
আমরা নাচি তাথৈ তাথৈ, বাজিয়ে পাতার বাঁশি।
রাশি রাশি লোকের ভিড়ে পথ চলা যে দায় ॥

(১০) **মজার গান ও অসংলগ্ন গান ঃ**

কুমড়ো পটাস খায় পেয়ারা কটাস মটাস করে কামড়ে।
দেখতে ফানুস তাই এমনি মানুষ—তার এমনি যে বিদকুটে নাম রে ॥

* * * * *

কুড়ি গজ ভুঁড়ি নিয়ে, হেলে দুলে ডাইনে ও বাঁয়েতে।
কুমড়ো পটাস চলে, চটাশ চটাশ চটি পায়েতে ॥

গানের অসংলগ্ন বিষয়-বস্তু শিশু-মনে প্রচুর হাসির খোরাক জোগায়।

(১১) **গল্পের গান ঃ** শিশুরা গল্পের কাঙাল। গল্প শুনে মুগ্ধ হয় না, এমন শিশু চোখে পড়েনি। কোন একটা গল্পের বিষয়বস্তু গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলে, তাতেও শিশুরা প্রচুর আনন্দ লাভ করে। যেমন—

এক যে ছিল শেয়াল, তার চাপল রাতে খেয়াল।
তাক করে তাই তালটি ঠুকে, টপকে গেল দেয়াল ॥
ঢুকল রাজার ঘরে, ভয়েই রাজা মরে,—
ঠকঠকিয়ে কাঁপতে থাকে তক্তপোষের 'পরে।

শেয়াল বলে "রাজা, আমি মাংস খাব তাজা।
পোলাও খাব, মণ্ডা খাব, খাব পাঁপড় ভাজা ॥"
রাজা বলে ভাই,—কিচ্ছু ঘরে নাই,
রাত দুপুরে এখন আমি খাবার কোথা পাই?

অথবা— নেমন্তন্ন খাবার লোভে কাপড়-চোপড় নিয়ে
বগুড়া জেলাতে গেলাম বরযাত্রী হয়ে।
গাড়ি হতে পা বাড়াতে দেখি কি ও বাপ!
সামনে দিয়ে হেঁটে গেল মস্ত বড় সাপ!
কালো কালো ডোরা ডোরা মস্ত বড় সাপ!

"ইন্দি বিন্দি সিন্ধি" গানটিতেও গল্পের ছবি আছে। গান গাইবার সময় গানের কথা যেন শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা হয়—সেদিকে নজর রাখতে হবে। "ইন্দি বিন্দি সিন্ধি" গানের "কাঁদিল সে"—অনেকের মুখে "মাদিল সে" হয়ে যায়। আবার "নেমন্তন্ন খাবার"—এই গানটির "বগুড়া জেলাতে গেলাম"—অনেককে "বগু রাজের লাটে গেলাম" অথবা "বহুলা বেলায় গেলাম"—গাইতে শুনেছি। শিক্ষিকাকে সযত্নে এসব ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হবে।

উপসংহারে বলতে পারি, উৎসাহী শিক্ষিকারা চেষ্টা ও যত্নসহকারে এইরূপ আরও অসংখ্য গান সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা নিজেরা রচনা করতে পারেন,—এমন কি, ছেলেভুলানো ছড়ায় সুর সংযোগ করে গাইতেও পারেন।

চিত্র ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকর গল্পটিতে **চার বছর** বয়সের শিশু চুনির ছবি আঁকার কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেছেন—

তাকে (চুনিকে) লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না,—খাতার পাতাগুলি অতিক্রম করে দেওয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে।

……সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ। যে সব জন্তুর মূর্তি হত, বিধাতা এখনও তাদের সৃষ্টি করেন নি—বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে—এমন কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত।

……সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে।…আজ চুনিবাবু নৌকো ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল,—হাঁ করে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে,—এমনিতর ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন ওপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে,—কিন্তু মকরগুলো সাধারণ মকর নয় আর মেঘগুলোকে "ধুমজ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিবেশ" বললে অত্যুক্তি করা হবে। একথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে এই রকম নৌকো যদি গড়া হয়, তা হলে ইনসিয়োরেন্স আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না। চলল রচনা,—আকাশের চিত্রীও যা খুশী তাই করছেন,—আর ঘরের ভেতর ওই মস্ত চোখমেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

চুনির এইসব অদ্ভুত ছবি দেখে তাঁর আত্মীয় বিখ্যাত চিত্রকর রঙ্গলাল বলেছিলেন– 'এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টিমূর্তি তাজা বেরিয়েছে,—এর মধ্যে দাগাবুলোনোর কোন লক্ষণ নেই; যে বিধাতা রূপসৃষ্টি করেন, তার বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে।'

সৃজনাকাঙ্ক্ষা শিশুর জীবনের বহু সম্ভাবনাপূর্ণ একটি মৌল প্রয়োজন। এই সৃজনাকাঙ্ক্ষা শিশু চরিতার্থ করে খেলার মধ্য দিয়ে। ছবি আঁকা,—হাতের কাজ করা,—এসব শিশুর কাছে খেলারই রূপান্তর। সমস্ত শিল্পসৃষ্টি আর সমস্ত খেলার প্রাণধর্ম হচ্ছে আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ততা। শিশুর প্রকাশভঙ্গী অপটু হতে

পারে,—বস্তুর আকার, রং, আয়তন প্রভৃতির প্রচলিত ধ্যান-ধারণা শিশুর কল্পনার চোখে অনেকখানিই ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই প্রচেষ্টার, এই সৃজন-স্পৃহার মধ্য দিয়েই একই তাজা শিল্পী-মন গড়ে উঠছে, আর শিশু লাভ করছে অবাধ আনন্দ। **দাগা বুলিয়ে আর অনুকরণ করে** কেউ কোনদিন বড় শিল্পী হননি।

প্রকৃত পক্ষে শিল্পকর্ম ভাষার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। এই শিল্প-কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ সহজে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়। নানা ধরনের আকার—যেমন গোল, চৌকো, লম্বা প্রভৃতি—বোঝাতে ভাষার ব্যবহারের চেয়ে ছবি এঁকে বোঝালে বেশী পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়। তাই তো আমরা দেখি, আদিম যুগে মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করে গিয়েছে ছবি এঁকে। সেসব ছবি কাগজে আঁকা নয়,—হয়তো আঁকা হয়েছে পোড়ামাটির ওপর বা পাথরের ওপর। যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করে তারা আজও অবিকৃত রয়েছে, আর এই ছবির ওপর ভিত্তি করে সেই অতীত যুগের ইতিহাস রচনার প্রয়াস চলছে। শিশুর কাছে ভাষা শিক্ষার প্রণালী বেশ জটিল,—ভাষা লেখাও সহজ নয়; কিন্তু ছবির ভাষা দেশকাল নির্বিশেষে সকল শিশুই সহজে বুঝতে পারে,—অবশ্য ছবির বস্তুটি যদি শিশুর পূর্ব পরিচিত হয়।

শিশুর চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজের মূল্যায়ন করা সহজ নয়। অনেকেই শিশুর আঁকা ছবি বা হস্তশিল্প দেখে, অবজ্ঞাভরে সেগুলোকে 'নেহাত ছেলেমানুষি' মনে করে মূল্যই দেন না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই চিত্রাঙ্কন, পেইন্টিং বা অন্যান্য শিল্পকাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সৃজনাত্মকাজ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভা বিকাশের সহায়তা হয়; সেটি হল—এর মধ্য দিয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত প্রক্ষোভগুলি মুক্তিলাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি, আমরা ছোটবেলায় যে ভাবে আঁকতে শিখেছি, তাতে এই দ্বৈত লক্ষ্য পূর্ণ হতো না। আমার মনে আছে, ড্রয়িং-এর ক্লাসে আমাদের খাতায় দুটি বিন্দু দিয়ে একটি সরল রেখা টানতে বলা হত; এটি নাকি ড্রয়িং শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ; বলা বাহুল্য, আমার মত শ্রেণীর আর সকলেও অকৃতকার্য হতো। এতে সৃষ্টির আনন্দ, প্রক্ষোভের মুক্তি কিছুরই সন্ধান আমরা পাইনি;—তাই ড্রয়িং ক্লাস কোনদিনই আমাদের ভাল লাগত না। আমরা ঠিকমত আঁকতে পারছি কিনা, আমাদের অঙ্কন ভাল হল

কিনা, এসবই শিক্ষিকা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন; ফলে আঁকার স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যেত। রং করার জন্য অনবরত ছবির বই দিলে, অথবা প্যাটার্ন (Pattern) জোর করে করাতে থাকলেও শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়,—তারা আঁকার মধ্য দিয়ে আর নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। এই কারণেই বিশেষ করে প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের শিল্পকর্মের মূল্যায়নের সময় মনে রাখতে হবে—"The Process rather than the Product is important"। শিশু আঁকার পর কাগজে কি ফুটে বেরুল, তা না দেখে, শিশু কিভাবে রং তুলি কাগজ বা শিল্পের অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করল, সেটা লক্ষ্য করার উপযোগিতা অনেক বেশী।

আমরা যদি চাই যে শিশুর অঙ্কন সহজ, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হোক, তবে আমরা কখনই তাকে ছবি দেখে অনুকরণ করতে বলব না। "এইভাবে কর", "ঐভাবে কর" বলে তাকে উত্যক্তও করব না। শিশু যখন রং-এর পাত্র থেকে তুলি দিয়ে রং তুলে কাগজে লাগায়, তখন অনেকের হাতেই তুলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রং কাগজে পড়তে থাকে। আবার অনেক শিশু খুব সাবধানী; তুলি থেকে অতিরিক্ত রং মুছে নিয়ে, যাতে কোন রং না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে, ছবি আঁকতে থাকে। আবার কোন কোন শিশু ইচ্ছে করেই তুলিটা কাগজের থেকে কিছুটা ওপর ধরে রেখে, কি করে টুপ্ টুপ্ করে রং-এর ফোঁটা পড়ে তা দেখে, এবং ইচ্ছে হলে সে কয়েকটি ফোঁটা দাগ টেনে জোড়া দিয়ে দেয়। কাজেই বিভিন্ন শিশু রং নিয়ে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখে,—সকলের দৃষ্টিভঙ্গী সমান থাকে না।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুরা কিভাবে ছবি আঁকার উপকরণগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে,—তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের নার্সারীর ২½ বৎসরের মিতা তুলিতে সবুজ রং নিয়ে প্রথমে কাগজে একটা বড় ছোপ লাগাল। তারপর সে পর পর নীল আর লাল রং-এর বড় বড় ছোপ ছোপ দাগ করতে লাগল—এর মধ্যে লাল রংটিই সে বেশী জায়গায় ব্যবহার করল। তারপর আবার তুলিতে হলুদ রং নিয়ে লালের মধ্যে মধ্যে লাগাতে লাগল—আর অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল, ঐ দুটো রং একত্র হয়ে কেমন অন্য একটা আলাদা রং তৈরী হচ্ছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় বড়রা যেমন নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করে, মিতার ভাবভঙ্গীও সেইরূপ।

তিন বৎসরের টিংকু লাল রং তুলে কাগজে একটি বড় গোলাকার আঁকল। সেই গোলের মধ্যে সে আবার লাল রং দিয়ে লম্বা লম্বা দাগ টানল, আর তুলি ছুঁইয়ে দিয়ে গোল দাগ করল। তারপর সবুজ রং নিয়ে আরও দুই জায়গায় ঘষে ঘষে লাগাতে লাগল। পরে হলুদ রং নিয়ে কাগজের ওপরের দিকে বেশ বড় বড় লম্বা লম্বা দাগ টানল। তারপর তুলি রেখে বলল—"আমার আঁকা হয়ে গিয়েছে।"

৩½ বৎসরের পিণ্টু রং-তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে খুব ভালবাসে। সে যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়, তখন থেকেই সে উজ্জ্বল রং-এর প্রতি আকৃষ্ট, তা লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম দিন রং-তুলি পেয়ে সে মহা খুশী হয়ে, Easel-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ছবি আঁকতে শুরু করল। সে তার তুলি দিয়ে বড় বড় দাগ কেটে প্রায় সব রকম রং-এর পরীক্ষা কাগজের ওপর করল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে, তুলির আগাটা জিবে ঠেকাল, আর একটু একটু করে জিব ও মুখ নেড়ে তার আস্বাদ গ্রহণ করল। খানিক পরে পিণ্টু তুলিটা নাকের কাছে এনে তার গন্ধ শুঁকে নিল। আবার খানিকক্ষণ কাগজে দাগ কেটে চলল। পরে পিণ্টু খুব মন দিয়ে নিজের হাতের তালুতে রং করে বুঝতে চাইল, রং-এর অনুভূতিটা কেমন। এইভাবে পিণ্টু রং-তুলি নিয়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল। এই একই জিজ্ঞাসার বশবর্তী হয়ে শিশুরা চকের টুকরো চেখে দেখে, চক বা রং দিয়ে নিজের হাতে মুখে চিত্র-বিচিত্র দাগ কাটে। নার্সারী স্তরের শিশুরা উপকরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের বাসনাতেই এ কাজ করে,—এগুলোকে দুষ্টামির পর্যায়ে ফেলা ভুল।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের একেবারে ছোট শিশুরা যখন আঁকে, তখন তারা কোন কিছু লক্ষ্য করে আঁকে না। তারা আঁকার মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে চায়, আর রং ইত্যাদি করার মাধ্যমে উপকরণগুলির নানা সম্ভাব্যতা নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। তিন বৎসর হয়ে গেলে, শিশু কি এঁকেছে জিজ্ঞেস করলে, সে অনেক সময়ই সঠিক বলে দিতে পারে। তবে শিশু কি এঁকেছে বলতে অনিচ্ছুক হলে, তার জন্য জোর-জবরদস্তি করা উচিত নয়।

ছোটদের ছবি আঁকার মধ্যে অসীম সাহসিকতা ও নূতন পথের সন্ধানের পরিচয় থাকে। তারা সাহস করে সব কিছুই আঁকতে চেষ্টা করে। তাদের আঁকার ভঙ্গীও নূতন,—যে জিনিস তারা আঁকল, তার সঙ্গে আসল জিনিসের মিলও

অনেক সময় থাকে না, তবু শিশুর কাছে—বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা অপটু ও অসম্ভব বলে বর্ণিত—ঐ ছবিগুলি একান্তই সত্য। শিশুরা তাদের স্মৃতিতে বস্তুর যে কাঠামো বা Schema এঁকে নেয়, সেই অনুসারেই ছবি আঁকে। কার্ল বুলার (Buhler)-এর মতে*—ছোট শিশু যখন কিছু আঁকে, তখন কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ছবি সে আঁকে না ; তার মনের মধ্যে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্রব্যটির যে কাঠামো সে কল্পনা করেছে, তাই অনুসরণ করে সে ছবিটিকে রূপ দেয়। সেজন্য বিভিন্ন শিশু একই জিনিস আঁকলেও তাদের মনের বিভিন্ন Schema-র প্রভাবে পৃথক পৃথক ছবি ফুটে বেরোয়। চার-পাঁচ বৎসরের শিশুর আঁকা মানুষের ছবি দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যায়। ধরে নিচ্ছি, শিশু একটা মানুষের ছবি এঁকেছে। মাথাটা বোঝাতে সে একটা বড় গোল এঁকেছে – তার মধ্যে ছোট ছোট দুটো বৃত্ত দিয়ে এঁকেছে তার চোখ। দুই চোখের নীচে একটি ছোট দাগ কেটে 'মুখ' এঁকেছে। মাথা থেকেই পা বেরিয়েছে ; ধড় বা দেহ, নাক বা কানের কোন চিহ্ন শিশুর আঁকায় প্রায়ই দেখা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায়, একটি শিশু যত মানুষের ছবি আঁকছে, তার কাঠামোটি একই ধরনের থাকছে,—অর্থাৎ এই শিশুর মনে মানুষের ধারণা একটিমাত্র বিশেষ Schema-এর থেকেই উদ্ভুত হচ্ছে। যখন একই Schema বার বার আঁকতে আঁকতে শিশু অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে আঁকা কাজে সফলতা লাভ করে ; আর এই সাফল্যই তাকে ঐ একই জিনিস পুনঃপুনঃ আঁকতে প্রেরণা যোগায়। শিশু যদি কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকে, তাতেও একই কাঠামোর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। অবশ্য অধিকাংশ বুদ্ধিমান শিশু কিছুকাল পরেই পুরানো কাঠামো পরিবর্তন করে নূতন কাঠামো গ্রহণ করে ; এতে বোঝা যায় যে শিশুর বুদ্ধির ও চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটেছে। যেখানে পুরানো কাঠামোর গণ্ডি শিশু পার হতে পারে না, সেখানে শিশুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে শিক্ষিকা সাহায্য করবেন। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে ডঃ গুডেনাফ মানুষ আঁকার মাধ্যমে শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। বুলারের মত হল—সত্যিকার যে জাত শিল্পী, যে যান্ত্রিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয় না।

ছোট শিশুদের আঁকা ছবিতে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই

*K. Buhler—Mental Development of the Child—Ch. VI

যা চোখে পড়ে সেটি হল—'আপেক্ষিক আয়তন জ্ঞানের অভাব'। যে জিনিসটি সম্বন্ধে শিশুর আগ্রহ বেশী, তাকেই সে বড় করে আঁকে। "কাক ও সাপ" গল্পে বাচ্ছাদের অনেকের তুলিতে বা ক্রেয়নে সাপটা প্রায় বটগাছেরই সমান হয়ে যায়। শরীরের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আপেক্ষিক সম্বন্ধ-জ্ঞানও শিশুর নেই। তাই তো কোন ছবিতে দেখা যায়, মা হয়ত কাপড় কাচছেন, জলের বালতিটা একটু দূরেই আঁকা হয়েছে; কিন্তু তাতে শিশুর কোন দুশ্চিন্তাই নেই; মায়ের হাত দুটো বেশ বড় করে এঁকে বাঁকিয়ে নিয়ে, অনায়াসেই শিশু বালতির জলে ডুবিয়ে দেয়।

শিশুদের সময় ও কালের জ্ঞান অপরিণত। তাই তাদের আঁকা ছবিতে একই সময় সূর্য ও চন্দ্র দেখা যায়। ঘরের মধ্যেই এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে,—এমন ছবিও তারা আঁকে।

শিশুদের ছবিতে নিকট ও দূরের প্রভেদ-বোধের (perspective) অভাব স্পষ্টতই ধরা যায়। 'রথের মেলা' যারা এঁকেছে,—তাদের ছবিতে মেলার সব মানুষই এক লাইনে রয়েছে,—আর সব মানুষই সমান করে আঁকা হয়েছে। কাছের জিনিস বড় ও দূরের জিনিস ছোট করে আঁকতে হয়, এ-জ্ঞান শিশুদের নেই।

এদের আঁকা ছবির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—স্বচ্ছতা (transparency)। বাবার গায়ে কোট পরা আছে,—কিন্তু কোটের ভিতর দিয়ে বাবার হাত দুটো দেখা যাচ্ছে, অথবা ঘোমটার ভেতর দিয়ে মায়ের মাথা ও চুলগুলো সব দেখা যাচ্ছে। "লালিমার গল্প" শিশুরা এঁকেছে—দিদিমা খাটে শুয়ে আছেন; তাঁর গায়ে চাদর ঢাকা দেওয়া; কিন্তু ঐ চাদর ভেদ করে দিদিমার দেহ, খাটের পায়া—এসব কিছুই স্বচ্ছ ভাবে দেখা যাচ্ছে।

পরে অবশ্য বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, এবং ক্রমে ক্রমে ছবিতে বাস্তব-বোধের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খেলার মাধ্যমে যেমন শিশুদের প্রক্ষোভজনিত নানা অশান্তি দূর হয়, তেমনি চিত্রাঙ্কনও শিশুদের আনুভূতিক সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাই আজকাল শিক্ষাবিদগণ ও শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশারদগণ শিশুদের চিত্রাঙ্কনের বিশেষ মূল্য দিচ্ছেন। এই প্রকাশ-ধর্মী মাধ্যমের সাহায্যে শিশুরা নিজেদের মনের সুপ্ত প্রক্ষোভগুলি অনায়াসেই ফুটিয়ে তোলে এবং তা করে নিয়ে বাস্তব জীবনে

সমাহিত হবার প্রয়াসী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি লণ্ডনে ছিলাম। সেই যুদ্ধের তাণ্ডবের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত চার্লসী নার্সারী স্কুলের শিশুদের আঁকা কয়েকটি ছবির কথা উল্লেখ করছি। রবিন—৩½ বৎসর বয়স; তাকে ছবি আঁকতে কাগজ তুলি রং দিলে, সে দিনের পর দিন খালি কালো রং বুলিয়ে প্রায় সব কাগজটাকে ঢেকে দিত; বলত—"বোমা পড়ছে।" যুদ্ধের সময় রবিন লণ্ডনেই ছিল। তার বাড়ির আশেপাশে বোমা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়াকেই সে কালো রং দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল।

'হেস্টিংস হাউসে'র নার্সারীর কাছেই একদিন রাত্রে একটা বাড়িতে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে দমকলকে বেশ কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। নার্সারীর বাচ্চারা তার আশেপাশেই থাকে; এই ঘটনায় তারা স্বভাবতঃই বেশ ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিল; তারপর কয়েকদিন ধরেই চলল বাড়ি ও আগুন আঁকা। একটা বাড়ি ও খানিকটা লাল রং আঁকা, অথবা খানিকটা কালো রং এবং তার ওপর অনেকখানি লাল রং এঁকে দেওয়া। এইভাবে আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুর মন থেকে ভয়, উদ্বেগ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলিকে দূর করতে পারে।

আর একটি ঘটনা। আমরা তখন 'হেস্টিংস হাউসে'র বি. এড. বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবের প্রস্তুতি কার্যে ব্যস্ত; স্বভাবতঃই ফিরতে ফিরতে আমাদের রাত্রি হয়ে যেত। আমার এক সহকর্মীর চার বৎসরের শিশু প্রবাল একটি সুন্দর ছবি এঁকে এসময় তার মনের ব্যথা ব্যক্ত করছিল। প্রবাল এঁকেছিল একটি পাখির বাসা; তাতে কয়েকটা পাখির ছানা হাঁ করে আছে; আর আকাশে একটা বড় চাঁদ। ছবিটা দেখিয়ে ছোট্ট প্রবাল তার দিদিমাকে বলেছিল—"সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, পাখির ছানাদের মা তো এখনও বাড়ি ফিরল না, তাই তো তারা বলছে,—"মা কৈ?" "মা কৈ?" আর চাঁদ মামা বলছে,—"সবুর কর—মা এখনি আসবে।" মায়ের অনুপস্থিতিতে বঞ্চিত শিশু প্রবালের দুঃখ, ক্ষোভ ও আকুতি এই চিত্রে কেমন সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে রূপায়িত হয়েছিল।

কার্যব্যপদেশে আমাকে আমেরিকাস্থ নানাবিধ নার্সারী দেখতে হয়েছে,—এবং কিছু কিছু নার্সারীতে কাজ করার সুযোগও হয়েছে। ওয়াশিংটনের "Little Red School" নামক নার্সারীর সাড়ে চার বৎসরের ডেভিডের ছবি আঁকার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। ডেভিড ছবিতে সবুজ রং দিয়ে হিজিবিজি কাটত,—আর তারপর কয়েকটা গোল অথচ দৃঢ়ভাবে দাগ কাটত। সে বলত—"I am making

a jungle. Look at my jungle. There is a lion. There is a river that the lion cannot cross." এই ছবিতে ডেভিড ভয়ংকর সিংহের জন্য ভয় এবং কি করে এই ভয়কে দূর করা যায়, তার উপায় খুঁজছে। সিংহ হিংস্র প্রাণী, কিন্তু নদীর সীমানা টেনে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে শিশুর ভয়, উদ্বেগের অবসান ও নিরাপত্তার বাসনা অধিকাংশেই পূর্ণতা লাভ করছে।

ছোটদের কাজে যদি হস্তক্ষেপ না করা যায়, তাহলে তারা ছবি এঁকে বা অন্যান্য শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে তাদের সৃজনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে এবং প্রচুর আনন্দ লাভ করে; বিভিন্ন উপাদানকে মাধ্যম করার দরুন শিশুদের ইন্দ্রিয়জ ক্ষমতার প্রসার হয় এবং অভিজ্ঞতা বাড়ে। আর এই শিল্পকর্ম ও অঙ্কনের মধ্য দিয়ে শিশুদের প্রক্ষোভগুলি মুক্তিলাভ করে; শিশু সহজ আনন্দে সমাহিত হয়ে বিকাশের পথে এগিয়ে চলে।

ছবি আঁকার কথা বলতে গিয়ে **Finger Paint**-এর কথাও বলা প্রয়োজন। এতে তুলির প্রয়োজন হয় না। একটা বড় কাগজে রং ঘন করে গুলে লাগিয়ে দিতে হয়;—তার ওপর ছোটরা আঙ্গুল দিয়ে খুশীমত ছবি আঁকে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে, বিশেষ করে সভ্য জগতে এর প্রয়োজন অতীব। সভ্য জগতে শিশুদের ফুলের মত সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটা তীব্র প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু শিশু-মন জল কাদা ঘেঁটে "messy" হতেই ভালবাসে। Finger Paint এই messy বা অপরিষ্কার হতে সহায়তা করে। এতে কাদা ঘেঁটে নোংরা হতে হয় না,—হাত দুটোই শুধু রং-এ রং-এ রঙ্গীন হয়;—তাতেও শিশুর আত্মতুষ্টি ঘটে। কোন শিশু রং লাগলে আঙ্গুলগুলিকে নিয়ে কি করে, আর ধীরে ধীরে কি করে শিশুর ব্যবহারের ক্রমপরিণতি হয়,—এটি লক্ষ্য করলে শিশুর ব্যবহারিক জীবনের বিকাশের ধারাটি অতি সহজেই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে।

ক্রেয়ন বা রং-পেন্সিলের ব্যবহার এবং তুলি ও রং-এর ব্যবহার—এ দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টি ছোটদের পক্ষে বেশী উপযোগী। অনেক স্থলে ছোটদের রং-তুলি ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না, কারণ ওতে ঘরদোর নোংরা হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু মেঝেতে খবরের কাগজ বা প্লাস্টিকের টুকরো পেতে নিলে ঘর অপরিষ্কার হবার ভয় থাকে না। তুলিতে যে জাতীয় পেশী সঞ্চালন হয়, ক্রেয়নে

তা হতে পারে না ; ক্রেয়নের কাজে অনেক বেশী সূক্ষ্ম পেশী সঞ্চালনের দরকার। কাজেই একেবারে শিশুদের প্রথমেই ক্রেয়ন না দিয়ে,—নার্সারী স্তরের শেষের দিকে, বিভিন্ন উপাদান হিসাবে মাঝে মাঝে দেওয়া যেতে পারে।

ছবি আঁকার কাগজ যেন বেশ বড় হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। "প্যাকিং পেপার" অথবা খবরের কাগজ হলেও ক্ষতি নেই। গুঁড়ো রং-Poster Paint অথবা Tempera Paint আদর্শস্থানীয়। এতে অল্প আঠা ও জল মিশিয়ে নিতে হয়। তুলি যেন বেশী সূক্ষ্ম না হয়, এবং তার হাতল যাতে বেশ লম্বা হয়, তা দেখা উচিত।

Prof. Nunn বলেছেন—"There is a close affiliation of 'art' to 'play', since the soul of art, like that of play is the joyous exercise of spontaneity."* কাজেই ছবি আঁকা বা অন্যান্য শিল্পকাজ শিশু খেলাচ্ছলেই স্বতঃস্ফুর্ততা ও আনন্দের মাধ্যমে করবে। তাই তো আধুনিক শিক্ষাবিদরা কোন কিছুর ছবি দেখে অনুকরণ করার অথবা দাগা বুলানোর বিরোধী, কারণ এতে শিশুর সৃজন-প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয় না।

হাতের কাজ

শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষানীতিতে "making inner out" অর্থাৎ "অন্তরকে বাহির করা"—এই উপায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গিয়েছেন। অর্থাৎ **শিশুর ভেতরে যে সুপ্ত সম্ভাবনা** আছে, তাকে **প্রকাশ করাই** হল প্রকৃত শিক্ষা। তাই তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে নাচ, গান, অভিনয়, গল্প ও হাতের কাজের এত প্রাচুর্য। শিক্ষার উপায় হিসাবে হাতের কাজ শ্রেষ্ঠ, কারণ এতে উপাদানগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াও, মনোযোগ, একাগ্রতা, সমস্যা সাধনের ইচ্ছা অর্থাৎ অল্প কথায় শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণগুলিই বর্তমান আছে। শিশু যখন কাজে আগ্রহান্বিত হয়, তখন তার মনে আরও নূতন নূতন ধারণা স্বাভাবিকভাবে জন্মায়,—আর এই ভাবেই শিশু তার ক্রম-বর্ধমান জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলে।

হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুরা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখে ;—কোন কাজই যে হেয় নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়। শ্রমের মধ্য দিয়ে

*Nunn : Education Ch. VI.

সহযোগিতার দ্বারা তারা সহজেই অন্যের সঙ্গে মিশতে শেখে। হাতের কাজে শিশুর **সৌন্দর্য-জ্ঞান** ও **রুচিবোধ** স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হতে পারে। এই কাজের সময় শিশুরা **আত্মসংযমও** শেখে; প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করে যে কোন কিছু গঠন করা চলে না,—এই শিক্ষাও তারা হাতের কাজের মধ্যেই পায়। **আত্মসংযম, ধৈর্য, সহযোগিতা, একাগ্রতা**—এইসব গুণের চর্চা হস্তশিল্পের মাধ্যমে হয়, আর এতে শিশুর **চরিত্রও** দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়ে ওঠে। হাতের কাজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল—এতে শিশু তার নিজস্ব আনন্দময় শিল্পীসত্তার সন্ধান পায়; তাই তৃপ্তিদায়ক হাতের কাজ পেলে শিশুর বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

শিক্ষার ব্যাপারে হাতের ক্রিয়া ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। ডঃ কাজ (Dr. Katz) এই নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন এবং মণ্টেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতিকে সমর্থন করে, হাতের কাজকে শিশু-শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। মণ্টেসরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Discovery of the child*-এ লিখেছেন—"The education of the hand is specially important, because the hand is the expressive instrument of human intelligence; it is the organ of mind." অর্থাৎ হাতকে শিক্ষিত করে তোলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ হাতই হচ্ছে মানুষের বুদ্ধির পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ যন্ত্র; হাত হল মনেরই অঙ্গ। গান্ধীজীও তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে হাতের কাজকেই গ্রহণ করেছেন—পুস্তককে গৌণ স্থান দিয়েছেন। তাই 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন—"আমি মনে করি হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রগুলির প্রকৃত ব্যবহার ও শিক্ষার দ্বারাই মনের শিক্ষা আসিতে পারে।"

নার্সারী স্তরে হাতের কাজ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

এই স্তরে সমস্ত রকম হাতের কাজ শিক্ষা হবে খেলা হিসাবে; যাতে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা ও আনন্দ বজায় থাকে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিশুকে নানা ধরনের পৃথক ও বিচিত্র উপকরণ দিতে হবে। তাতে শিশুর মনে উপকরণের সম্ভাব্যতা এবং বহুল অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য হবে। এতে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও বহু বিচিত্র বিকাশ ঘটা সম্ভব হবে।

শিশু প্রথমে ইচ্ছামত নিজেই তার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাবে। সে যে জিনিস তৈরী করবে, তার বিচার বয়স্কদের দৃষ্টিকোণ থেকে হবে না। তার তৈরী জিনিসে তার সৃজন-প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যগুলিরই মূল্যায়ন হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুরা প্রথম প্রথম নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকবে। শিশুর বয়স ও অন্যান্য পরিণতির ক্রম অনুযায়ী তাকে ক্রমশঃ সহজ হতে জটিলতর উপাদান ও পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করতে হবে।

শিশুকে শিল্পকার্যে উৎসাহ দিতে হবে বৈকি! কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, অতিরিক্ত প্রশংসায় শিশুর অযথা আত্মতুষ্টি ঘটেছে—ফলে তার নূতন কিছু করার প্রেরণার অবসান ঘটেছে। এ অবস্থা কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। **অতিরিক্ত প্রশংসা বা অতিরিক্ত সমালোচনা—দুটিই শিশুর পক্ষে সমান ক্ষতিকর।**

শিশুরা যে উপাদান নিয়ে কাজ করছে, সেই একই উপাদান দিয়ে আর কি কি গড়া যায়, তা শিক্ষিকা নিজে হাতে দেখিয়ে দিতে পারেন। তবে তা করার আগে শিক্ষিকাকে ছোটদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে,—তিনি যে তাদেরই একজন, এই ভাব নিয়ে তাঁকে এগুতে হবে। মোট কথা, শিক্ষিকা suggest করতে পারেন, কিন্তু জোর করে কিছু ছোটদের ওপর চাপানো চলবে না।

যে কাজ শিশুরা করবে, তাতে যাতে দীর্ঘ সময় না লাগে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। অতি সূক্ষ্ম হাতের কাজ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের অনুপযোগী। কারণ এই সময় তাদের চোখের সূক্ষ্ম পেশীগুলি যথেষ্ট সবল হয় না এবং সূক্ষ্ম কাজ করলে দৃষ্টিশক্তিরও বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে একেবারে ছোটদের জন্য অনিয়ন্ত্রিত কাজই উপযোগী। ওপরের দিকের শিশুরা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে একক কাজ ও শিক্ষিকার নির্দেশে দলগতভাবে নিয়ন্ত্রিত কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়—এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেনেছি। শিশুর হাতের কাজ সর্বদাই শিক্ষিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে শিশুর সৃজন-প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ করবে যে উপকরণ দিয়ে, তা খুব দামী হবার প্রয়োজন নেই। তবে যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে এগুলো যেন খুব ধারাল, জটিল বা অতিরিক্ত ভারি না হয়। সংসারের নানা তুচ্ছ ও

পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে ছোটরা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করে আনন্দ পেতে পারে। নানা রকমের কাগজ, ঠোঙা, কাগজের বাক্স, রং, তুলি, আঠা, পাট, উলের টুকরো, পুঁতি, রাংতা, জরি—এসব দিয়ে শিশুরা ঘর-বাড়ি, মানুষ, ফুল, জন্তু-জানোয়ার, পুতুল, নৌকো, এরোপ্লেন, শেকল প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস তৈরী করতে পারে। একেবারে ছোটরা কাগজ ছোট করে ছিঁড়ে গোল করে পাকিয়ে নিয়ে (paper crumpling) ফুল, পাখি, মাছ—এসব তৈরী করতে পারে। কাঁচি দিয়ে কাটতে শিখলে, তখন তারা বিভিন্ন জিনিসের আকার অনুযায়ী চকচকে কাগজে কেটে আঠা দিয়ে লাগাতে পারে ; ঠোঙাতে দুটো বড় চোখ এবং মুখ ও কান এঁকে অনায়াসে সুন্দর মুখোশ তৈরী করতে পারে।

ফেলে দেওয়া "Vim"-এর কৌটো, পাউডারের কৌটো, বা নানা ধরনের টিনের কৌটো দিয়েও অনেক মজার মজার মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বানানো চলে।

রঙ্গীন কাঠের টুকরো পর পর জুড়ে নিয়ে শিশুরা রেলগাড়ি, বাড়ি. এরোপ্লেন ইত্যাদি বানাতে পারে। সুতো ফুরিয়ে গেলে কাঠের খালি রিল দিয়ে মানুষ, ঘোড়া, শুঁয়োপোকা প্রভৃতি মজার মজার খেলনা তৈরী হতে পারে। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের ভোঁতা করাত ও পেরেক দিলে, তারা কাঠ কেটে ও জোড়া দিয়ে এরোপ্লেন বা ঘর-বাড়ি বানাবে ; তবে ঐ জিনিসগুলি শিক্ষিকার কাছেই থাকা প্রয়োজন, যাতে করাত বা পেরেক দিয়ে কোন অঘটন না ঘটে নানা রকম কাপড়ের টুকুরো, পুতি, জরি ইত্যাদি দিয়ে সহজেই পুতুল, খরগোশ ও অন্যান্য খেলনা তৈরী হতে পারে। পুতুলের বাড়ির বিছানার চাদর, শয্যা আচ্ছাদনী প্রভৃতির জন্য ছোট কাপড়ের টুকরোতে ঢ্যাড়স বা আলুর ছাপ দিয়ে সুন্দর সুন্দর নকশা করা চলে। পুতুলের কাপড়ে রাংতা নানা আকারে কেটে লাগিয়ে, বিয়ের বেনারসী শাড়ি প্রভৃতি তৈরী হতে পারে।

মাটির কাজেও শিশুদের অসীম আগ্রহ। ভেঙে ভেঙে—আবার গড়ে তুলে শিশুরা অপূর্ব আনন্দ পায়। এই মাটি অনেকক্ষণ ধরে ঘাঁটতে থাকলেও শিশুরা খুশী হয়—এতে তাদের স্পর্শেন্দ্রিয়েরও অনেক উন্নতি হয়। মাটি দিয়ে ছোটরা সন্দেশ, রসগোল্লা, সাপ, পাখি, খরগোশ, মানুষ ইত্যাদি অনেক জিনিসই বানাতে পারে, ও পরে শুকিয়ে গেলে রং করে নেয়। যে গল্প তারা শোনে, তাদের চরিত্রগুলিকে হাতের কাজের মাধ্যমে রূপ দিতে চেষ্টা করে।

এই রকম কাজের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে ; সব দিয়ে অযথা বই-এর পাতা ভরাতে চাই না। তবে "সেলাই" যখন হাতের কাজের অন্তর্গত, তখন সেলাই সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যে-কোন সূক্ষ্ম কাজ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের করতে দেওয়া উচিত নয়। এই সূত্রেই বলা যায় যে সেলাই কাজটি প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের অনুপযোগী। সূক্ষ্ম সূচ ধরা, সূচে সুতো পরানো ও সেলাই করা শিশুদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। পুতুলের জন্য জামা সেলাই করা একান্ত আবশ্যক হলে শিক্ষিকা বা মায়েরা তা করে দেবেন। পুতুলের জামা ছোটরা করলে, জামার দুটো পাশ আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেও, তাতে জামার কাজ হবে। যদি কোন শিশু সেলাই করতে একান্ত আগ্রহী হয়, তবে তাকে সেলাই-এর উপকরণ দিতে হবে অন্যভাবে। একটা বড় গাছের কাণ্ড, যার দুদিকে দুটো ডাল থাকবে,—সেই কাণ্ডটিকে ঘরের এককোণে রেখে, তার জন্য খুব বড় মাপের জামা চট দিয়ে তৈরী করা চলে ; এটা হবে "দৈত্যের জামা"। খুব বড় সূচ দিয়ে, বেশ মোটা সুতোয়, সোজা ফোঁড়ে তার সেলাই হবে। এই সেলাই করা আবশ্যিক হবে না,—যে সব শিশুরা বিশেষ আগ্রহ দেখাবে কেবলমাত্র তারাই ঐ সেলাই করবে।

সাঙ্গীকরণ (Integration)

পূর্বে আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষা শুরু হতো **পাঁচ** বৎসর বয়সে। এখন এই শিক্ষা শুরু হয় **ছয়** বৎসর থেকে। কাজেই পরিবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, নার্সারীর একেবারের শেষের দিকে, কয়েক মাস ধরে শিশুরা বিচ্ছিন্নভাবে যা শিখেছে, তার **সাঙ্গীকরণ বা Integration-এর ব্যবস্থা করা** ভাল ; এতে শিশুরা প্রাথমিক স্তরে গিয়ে বিধিবদ্ধভাবে লেখাপড়া শুরু করার সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে না।

আমরা বার বারই বলেছি যে **শিশুর কৌতুহল ও আগ্রহকে** কেন্দ্র করে **অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে** যদি শিশু কোন কিছু শিখতে পারে, তবেই সে শিক্ষা যথার্থ ও সার্থক হয়। শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে, তখন তাকে যে পাঠ্যপুস্তক পড়তে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে শিশুর জীবনের অথবা অভিজ্ঞতার সম্পর্ক না থাকায় শিশু সে সম্বন্ধে আগ্রহী হয় না,—ফলে **পড়ানো** বা **লেখানো** খুবই কঠিন কাজ হয়ে ওঠে। ঐ পাঠ্যপুস্তকের **বিষয়বস্তু** শিশুর ভাল লাগে না—হয়তো ছাপার অক্ষরগুলি বেশ **ছোট ছোট,** আর তা পড়তে গিয়ে শিশুর কচি চোখে বেশ কষ্ট হয়,—বইটিতে হয়তো **শিশুর পক্ষে চিত্তাকর্ষক** রংচং-এ **ছবিরও অভাব** আছে। কাজেই ঐ বই পড়তে শিশুর সব সময় **ভাল লাগে না,**—এবং যা তার ভাল লাগে না, সেই বিষয়ে **অমনোযোগী** হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর অমনোযোগীতাই **তার অসাফল্যের** কারণ হয়ে দাঁড়ায়। **শুরুতেই** এই **অসফলতা** পড়াশোনার প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা এনে দেয়,—পরে অনেক চেষ্টা করেও শিশুর মন থেকে এই বিরাগ দূর করা অতীব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

এইসব অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (Activity Principle) ও প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, এবং যথেষ্ট সুফলও পেয়েছি। আমাদের অনুসৃত পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে লেখাপড়া ও গণনা শিক্ষা দিতে কোনও **ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয় না।** শিশুরা নিজেদের কাজ ও প্রকল্পের ভিত্তিতে নিজেরাই পুস্তক রচনা করে,—অবশ্য শিক্ষিকা তাদের সাহায্য করেন ; এবং ঐ স্বরচিত হস্তলিখিত খাতাগুলিই শিশুদের প্রথম পাঠ্যপুস্তক। এই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু

শিশুর পরিচিত তার জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এবং স্বভাবতঃই তার আগ্রহ থেকে সৃষ্ট।

"পড়ার জন্য প্রস্তুতি"—এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি, কি করে নানা ধরনের খেলা ও কাজের ভেতর দিয়ে শিশুর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, অনুভূতি বৃত্তি, বোঝার কৌশল (Interpretative skill), ভাষার ক্ষমতা ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে। এইসবের সম্যক অনুশীলন হয়ে গেলে তারপর নিম্নলিখিত কাজে শিশুদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

শিশুরা সকলেই দোকান দেখেছে ; দোকানের বেচাকেনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তাদের আছে। তবুও প্রয়োজন মনে করলে, শিশুদের নিকটবর্তী কোনও দোকানে নিয়ে গিয়ে, কিছু কিছু জিনিস কিনে, দাম দিয়ে ফিরে এসে দোকান সংক্রান্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপর তাদের ইচ্ছানুযায়ী, তাদেরই সহযোগিতায়—কি দোকান করা হবে, তা স্থির করা হবে। যেমন ধরা যাক, শিশুরা স্থির করল তারা একটি খেলনার দোকান করবে। খেলনার দোকানে কি কি খেলনা থাকবে, তার আলোচনা হবে। প্রথম অবস্থায় শিশুরা বাড়ি থেকে নিজে নিজে দু'একটি খেলনা এনে দোকান সাজাতে পারে ; তারপর তারা নিজেরাই মাটি দিয়ে পুতুল, পাখি ইত্যাদি তৈরি করে, রং করে বিক্রির জন্য দোকানে রাখতে পারে। শিক্ষিকার সঙ্গে একটি শিশু দোকানদার হবে ও জিনিসপত্র বিক্রি করবে। দোকানে প্রতিটি জিনিসের নাম ও তার দ্রব্যমূল্য দেওয়া থাকবে ; সম্ভব হলে প্রথম প্রথম **জিনিসের নামের পাশে তার ছবি দেওয়া থাকবে—তার মূল্যের পাশে সেই সংখ্যক বিন্দু বা দাঁড়ি থাকবে।** তালিকা নিম্নরূপ হবে—

বল—	৫ পয়সা	ooooo
পুতুল—	৩ পয়সা	ooo
পাখি—	২ পয়সা	oo
বাড়ি—	৪ পয়সা	oooo
নিশান—	১ পয়সা	o
রথ—	৬ পয়সা	oooooo
মাছ—	৮ পয়সা	oooooooo
গাড়ি—	১০ পয়সা	oooooooooo

শিশুরা দলে দলে ভাগ হয়ে, একএক দল দোকানে আসবে এবং পরপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করবে। যে জিনিসটি শিশুর পছন্দ হবে, সেই খেলনাটির কথা শিশু দোকানীকে বলবে ও দোকানী তাকে সেই খেলনাটি দিয়ে দেবে। প্রতিদানে শিশু মূল্য-তালিকা দেখে, বা দোকানীকে জিজ্ঞেস করে, উক্ত জিনিসের দাম জেনে নিয়ে তা দিয়ে দেবে। এরপর শিশুর কাজ জায়গায় ফিরে এসে যে খেলনাটি কিনেছে, তার **নাম** লেখা ও পাশে **দাম** লেখা। শিশু নিজে তার **ইচ্ছামত** জিনিস কিনেছে,—কাজেই ঐ জিনিসের নাম লিখতে সে স্বভাবতই আগ্রহী হবে। তালিকাতে জিনিসের ছবি ও নাম লেখা আছে—শিশু তা থেকে অনায়াসেই দেখে দেখে অনুকরণ করে খেলনার নামটি লিখে ফেলবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষিকার কাছে এসে খেলনাটি দেখিয়ে বলে, **এর নাম লিখে দাও**। তখন শিক্ষিকা হাসিমুখে শিশুর শ্লেটে শিশুর আনা "**বল**" বা "**মাছ**" কথা লিখে দেন; শিশু তা দেখে দেখে লিখে ফেলে, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, দেখ দেখ, আমি কেমন লিখেছি। এইভাবে motivised করে অর্থাৎ আগ্রহভিত্তিক করে শিক্ষা দিতে পারলে, শিশুর পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ সহজ হয়। খেলনার নাম লেখার পর তার কত দাম দিয়েছে, তাও তখন সে লিখতে চেষ্টা করে।

সে লেখে : বল—০০০০০৫।

একবার খেলনা কেনা হয়ে গেলে, শিশু তা নিজের কাছে রাখতে পারবে। শ্লেটে খেলনার **নাম** ও **দাম** লেখা হয়ে গেলে, সে আবার দোকানে গিয়ে তার পছন্দ মত অন্য কিছু কিনে আনবে ও জায়গায় ফিরে গিয়ে, অথবা প্রয়োজন হলে, তালিকার লেখাটি দেখে নিজের শ্লেটে অনুরূপভাবে যোগ করবে—

পাখি—০০২।

এইভাবে যতক্ষণ তার হাতে পয়সা থাকবে, তার বেচা-কেনা চলবে। তবে প্রথম অবস্থায় ১০ পয়সা দিয়ে আরম্ভ করলে ভাল হয়,—তারপরে ক্রমে ক্রমে তা বাড়াতে বাড়াতে ২০ বা ২৫ পয়সা করা চলে।

কিছুদিন এই খেলা করার পর—যে পয়সা নিয়ে শিশু বাজার করল, তার হিসেব লেখার কাজও তাকে করতে হয়। শিশু এ-কাজ মৌখিকভাবে আগেই করেছে,—এখন শ্লেটে লিখে করতে অভ্যস্ত হয়। এবারে তার লেখার ধরণ হবে অন্যরকম।

জমা—	খরচ—	
১০ পয়সা	পাখি—০০	২ পয়সা
	বাড়ি—০০০০	৪ পয়সা
	পুতুল—০০০	৩ পয়সা
	মোট—	৯ পয়সা

হাতে ১ পয়সা আছে।

অথবা

জমা—	খরচ—	
২৫ পয়সা	গাড়ি—০০০০০০০০০০	১০ পয়সা
	বল—০০০০০	৫ পয়সা
	পুতুল—০০০	৩ পয়সা
	পাখি—০০	২ পয়সা
	বাড়ি—০০০০	৪ পয়সা
	নিশান—০	১ পয়সা
	মোট—	২৫ পয়সা

হাতে কিছু নেই।

এইভাবে খেলনার দোকান দিয়ে শুরু করলে শিশু সহজেই **লেখা, পড়া ও গণনা** শিখতে পারে। এই প্রসঙ্গে **দুটি** কথা মনে রাখতে হবে—**প্রথমতঃ** শিশুকে একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য মাঝে মাঝে **দোকানে নূতন লেখনার আমদানি** করতে হবে—তাতে শিশু নূতন নূতন কথা **লিখতে ও পড়তে উৎসাহী** হবে।

দ্বিতীয়তঃ, সপ্তাহের শেষে **মূল্য-তালিকার পরিবর্তন** করা প্রয়োজন। তাতে তারা খেলনার নূতন দামের আভাস পাবে,—আগের দামের তুলনায় দাম বাড়ল কি কমল, তারও আলোচনা করতে পারবে।

এরপর Project বা **প্রকল্প পদ্ধতির** উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলতে হয় যে, নার্সারী-স্তরে **দীর্ঘস্থায়ী** বা কোনও **দুরূহ বিষয়বস্তু** নিয়ে Project **করা উচিত নয়**, যে বিষয়ে শিশুদের **আগ্রহ ও উৎসাহ** আছে, এমন বিষয়বস্তু অবলম্বন করে **অল্পদিনের** মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, এমন Project-ই নার্সারী-স্তরের উপযুক্ত। এই সময়ের উপযোগী একটি প্রকল্পের কথা এখানে বিস্তারিতভাবে

উল্লেখ করা হচ্ছে। এ-প্রকল্পটি হেস্টিংস হাউসের শিশুরা সাফল্যের সঙ্গে করেছিল ; প্রকল্পের নাম ছিল **রমার জন্মদিন**।

কিছুদিন আগে নার্সারী বিদ্যালয়ের মিতার জন্মদিনের উৎসব বেশ ঘটা করেই হয়েছিল—মিতার মা সবার জন্য মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন ; মিতা খুব সুন্দর একটা ফ্রক পরে এসেছিল,—আর তার বন্ধুদের নানা উপহার দেখিয়ে আনন্দের ভাগ দিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে স্কুলে খালি জন্মদিনেরই গল্প—তারপর শিশুর দল ও শিক্ষিকা, সকলে মিলে কত আলোচনা হল। ঠিক হল যে "পুতুলের জন্মদিন" খেলা হবে। অনেক অনেক পুতুল আনল, দিদিমণিও একটা পুতুল দিলেন ; সে পুতুলটা সকলের খুব পছন্দ হল ; আর সেই পুতুলের নাম রাখা হল "রমা"। তাই প্রকল্পের নাম হল—**রমার জন্মদিন**।

তারপর কাজের ইউনিট (unit) ঠিক করা হল ; জন্মদিনে কি কি দরকার, কে কি কাজ করবে—এ সবেরও আলোচনা হল। ঠিক হল একদল চিঠি দিয়ে **নিমন্ত্রণ করার** ও বাড়ি সাজাবার ভার নেবে, আর একদল **খেলনার দোকান** দেবে, তৃতীয় দল **খাবারের দোকান** দেবে আর চতুর্থ দল **লেস ফিতে ইত্যাদির দোকান** করবে। চারটি ইউনিটের চার ধরনের কাজের জন্য শিশুদেরও তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভাগ করা হল। এবারে শিক্ষিকা ভিন্ন ভিন্ন দলের সঙ্গে পৃথক-ভাবে তাদের কার্যসূচী কি ধরনের হবে, কি কি কাজ তাদের করতে হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। শিশুদের মত নিয়ে, যারা লেখাপড়ার ব্যাপারে খানিকটা এগিয়েছে, এমনি দুটি শিশুকে দলপতি করা হবে। এরা শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে সবগুলির ইউনিটের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করবে। এরপর শুরু হবে আলাদা আলাদা ইউনিটের বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্ম। যাদের উপর নিমন্ত্রণের চিঠি লেখার ভার, তারা নানা ধরনের চিঠির কাগজ জোগাড় করে আনবে,—প্রয়োজন হলে শিক্ষিকাও পুরোনো বিয়ের চিঠি বা অন্য কোনও সুদৃশ্য 'কার্ড' এনে দিতে পারেন। শিশুরা সেগুলি দেখে প্রথমে চিঠির **কাগজের আকার** কি ধরনের হবে, তা স্থির করবে—সেই কাগজকে কি করে সাজাবে, তা ঠিক করবে এবং সেই কাগজে যা লেখা হবে, তারও আলোচনা করবে। আলোচনার পর শিক্ষিকার সহায়তায় নিমন্ত্রণ-পত্রটি লিখিত হবে, এবং দলের প্রত্যেকে তা লেখার চেষ্টা করবে। এই দল **নিশান ও শিকল তৈরী** করে পুতুলের বাড়ি সাজাবে ;—কাগজ কাটা, নিশান ইত্যাদির হিসাব রাখার কাজ এরা করবে।

দ্বিতীয় দল খেলনার দোকান করবে। এতে একেবারে প্রথম স্তরে যে খেলনার দোকান করার কথা লিখিত হয়েছে, সেই পদ্ধতিতেই এই দোকান চলবে—তবে এখানে জিনিসের নাম ও দাম লেখা ছাড়াও, দোকান-সংক্রান্ত নানারূপ 'নোটিশ' লিখতে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিটি শিশু উপহারের জন্য যা যা কিনেছে, তার ব্যক্তিগত হিসাব রাখবে; আর **দোকানদার সকল জিনিস বিক্রির** হিসাব রাখবে।

তৃতীয় দল করবে খাবারের দোকান। প্রথমে শিশুরা আলোচনা করে দোকানের একটা নাম ঠিক করবে। এ দলের শিশুরা **জলযোগ** নামটি বেছে নিয়েছিল। জলযোগে কি কি খাবার থাকবে, তাও শিশুরাই ঠিক করবে এবং প্রত্যেকটি খাবারের কি দাম হবে, তা লিখে রাখবে। দোকানের বিভিন্ন খাবার শিশুরাই মাটি দিয়ে তৈরী করবে ও রং লাগাবে; ইচ্ছে করলে ছাঁচ দিয়ে শিশুরা সন্দেশও তৈরী করতে পারে। এই দল 'জলযোগ'-সংক্রান্ত একটি বই তো লিখবেই, তা ছাড়া তাদের দোকানের কাটতির জন্য নানা রকমের sign board-ও তৈরী করবে।

চতুর্থ দল লেস, ফিতে, জরি ইত্যাদির দোকান দেবে ও অনুরূপভাবে কাজে অগ্রসর হবে। এই দলের শিশুদের কাঁচি ব্যবহার করতে শেখাতে হবে,—এরা কাগজ লম্বা করে কেটে, তার ধারগুলিতে নানা নকশা করবে; যারা নকশা করতে পারবে না, তারা সোজা করে পুরানো খবরের কাগজ বা brown paper কেটে তাতে রং করে নেবে; তারপর মিটার হিসাবে তা বিক্রি করবে। যে সব শিশুরা কিনবে, তারা কে কি কিনল ও কত দিয়ে কিনল তা ব্যক্তিগত শ্লেটে বা কাগজে লিখে রাখবে;—দোকানদার মোট বিক্রির হিসাব রাখবে।

এসব ইউনিটের কাজ পরিচালনা করবার সময় **শিক্ষিকার** লক্ষ্য রাখতে হবে মূল প্রকল্পটি **ঠিকমত অগ্রসর হচ্ছে** কিনা এবং সব **শিশু কাজে ব্যস্ত আছে** কিনা। প্রয়োজন বোধ করলে, একটি শিশুকে এক দল থেকে অন্য দলে বদল করা যেতে পারে—অর্থাৎ, যে শিশু কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে লেস বা ফিতে করতে চায় না, সে যদি ঐ জিনিসের রং করতে চায়, তবে সেই বিশেষ শিশুকে সে দল থেকে বদল করে 'জলযোগে'র দলে নিতে পারা যায়;—সেখানে সে হয়তো আগ্রহের সঙ্গে মাটি দিয়ে নানা খাবার তৈরী করবে।

এই প্রকল্প পদ্ধতিটি সার্থকভাবে পরিচালনা করতে পারলে, শিশুরা লেখাপড়া

ও গণনা অতি সহজে ও আগ্রহের সঙ্গেই করতে ও শিখতে পারে। এই চারটি দলের শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কাজের ভিত্তিতে নিজেরাই চারটি বিভিন্ন বই তৈয়ার করেছে,—কাজেই এই বই পড়তে তাদের আগ্রহ হাওয়া স্বাভাবিক। তারপর কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এক দল অন্য দলের কাজ-কর্ম দেখে ও তাদের লেখাগুলি পড়তে চেষ্টা করে ; এমনিভাবে পড়ার কাজ সহজেই এগিয়ে চলে। এইগুলিই শিশুদের **প্রথম পড়ার বই**। "রমার জন্মদিন" প্রকল্পের বিভিন্ন দলের **লেখা বই-এর নমুনা** এখানে দেওয়া হল।

১। রমার জন্মদিন

কাল মিতার জন্মদিন হয়ে গেল। মিতার মা আমাদের মিঠাই পাঠিয়েছিলেন। মিতা একটা খুব ভাল লাল জামা পরেছিল। মিতা অনেক উপহার পেয়েছিল, সেগুলি সে আমাদের দেখিয়েছে।

আমরা ঠিক করলাম, আমরাও 'জন্মদিন' 'জন্মদিন' খেলা করব। আমরা অনেক পুতুল আনলাম। দিদিমণিও আমাদের একটা বড় পুতুল দিলেন। আমরা সেই পুতুলের নাম রাখলাম 'রমা'। এখন আমরা 'রমার জন্মদিন' খেলা খেলব।

মিতা আর বুলু হবে আমাদের দলপতি। উপহার, খাওয়া—এসবের জন্য অনেক দোকান লাগবে। আমরা সবাই চারটি দল হয়ে গেলাম। এক দল বাড়ি সাজাবে আর নেমন্তন্ন করবে। আর দলগুলি খেলনার দোকান, লেস ফিতার দোকান ও খাবারের **দোকান করবে। এবার আমাদের কাজ** শুরু হবে।

২। জলযোগ

আমাদের পুতুল রমার জন্মদিন হবে। অনেক দোকান লাগবে। আমরা ঠিক করলাম, আমরা একটা খাবারের দোকান করব। এই দোকানের আমরা নাম রাখলাম **জলযোগ**।

মাটি দিয়ে আমরা অনেক খাবার করলাম—'তাতে রংও দিলাম। তারপর সেগুলি দোকানে সাজিয়ে রাখলাম। কোন্ জিনিসের কত দাম, তাও লিখে রাখলাম।

দোকান কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়, তাও আমরা কাগজে লিখে দিলাম। আর সকলকে জলযোগের ভাল মিঠাই খাবার জন্যে বললাম।

জলযোগে কি কি আছে		কত দাম
জিলিপি	—	৪ পয়সা
সন্দেশ	—	৮ পয়সা
পানতুয়া	—	৮ পয়সা
রসগোল্লা	—	৬ পয়সা
নিমকি	—	৩ পয়সা
দানাদার	—	৭ পয়সা
রাজভোগ	—	১০ পয়সা
চমচম	—	৪ পয়সা
কচুরি	—	৪ পয়সা
শোনপাপড়ি	—	৫ পয়সা

জলযোগের দোকানের জন্য আমরা **এই নোটিশ** লিখেছি—

জলযোগের টাটকা খাবার খেতে ভুলবেন না।
আসুন ! আসুন ! টাটকা ছানা,—টাটকা খান
দোকান খোলা।
দোকান বন্ধ—
ধার চাইবেন না।
খুচরো পয়সা আনবেন
গেলাসে হাত ধোবেন না।

৩। রকমারি

আমাদের পুতুল রমার জন্মদিনের জন্য আমরা একটা দোকান দিলাম। এটা খেলনার দোকান। অনেক ভেবে ভেবে আমরা এই দোকানের নাম রাখলাম **রকমারি**। এই দোকানে রকম রকম জিনিস পাওয়া যাবে। পুতুল, পাখি, বাড়ি, মোটর গাড়ি,—আরও কত রকম জিনিস থাকবে।

আমরা বাড়ি থেকে কিছু কিছু খেলনা আনলাম। সেসব দিয়ে দোকান সাজালাম। পরে আমরা মাটি দিয়ে অনেক খেলনা বানালাম, আর তাতে রং দিলাম। কাগজ ও লেই দিয়ে বাড়ি ও পাখি বানালাম। কাঠের গুঁড়ো ও লেই দিয়ে খরগোশ ও পুতুল বানালাম। দিদিমণি আমাদের খেলনা বানাতে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কোন্ খেলনার কত দাম তা কাগজে লিখে দোকানে টাঙিয়ে দিয়েছি। যখন খেলনা কিনবে, দাম দেখতে ভুলবে না।

রকমারিতে পাবেন		কত দাম
বড় পুতুল	—	১৫ পয়সা
ছোট পুতুল	—	৮ "
পাখি	—	১০ "
বাড়ি	—	৮ "
মোটর গাড়ি	—	১৩ "
খরগোশ	—	৬ "
বাঁশি	—	৫ "
রথ	—	৭ "
ফুল	—	২ "
লাঠি	—	৩ "
এরোপ্লেন	—	৯ "
থালা	—	৬ "
বাটি	—	৪ "
গেলাস	—	২ "
বল	—	১২ "
চামচে	—	১ "

দোকানের নোটিশ এইরকম—

রকমারিতে রকম রকম জিনিস

নতুন নতুন খেলনা

চক্‌চকে চক্‌চকে—ঝক্‌ঝকে ঝক্‌ঝকে

দাম দেখে দেবেন

ধার দেওয়া হয় না

লেস, ফিতা, জরি ইত্যাদির নাম শিশুরা রেখেছিল **ঝক্‌মকে**। এই দোকানে মিটার হিসাবে লেস, ফিতে ইত্যাদি বিক্রি করা হতো। এগুলি নানা ধরনের কাগজ দিয়ে শিশুরাই তৈরী করত তা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া কার্ডবোর্ড

দিয়ে বোতাম তৈরী করে, আধ ডজন অর্থাৎ ৬টি বা ১ ডজন (১২টি) একসঙ্গে বিক্রি করা হতো ; এই বোতামগুলিকে কার্ডে আটকিয়ে রাখা হতো। এদের তৈরী বই-এর লেখা অন্যান্য দোকানের অনুরূপ। স্থানাভাবে এর বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না।

যে দল নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠাবে ও ঘর সাজাবে, তাদের অনেক কাজ করতে হয়েছে। নিমন্ত্রণের চিঠির কাগজ ঠিক করা, কথা বেছে নিয়ে চিঠি লেখা, সেই চিঠির ওপরে আলু বা ঢ্যাঁড়সের ছাপ দিয়ে চিত্রবিচিত্র করা, কয়টা চিঠি দেওয়া হল তার হিসাব রাখা—এ সবই ছিল। তা ছাড়া ঘরবাড়ি সাজাবার জন্য নিশান ও শিকল তৈরী করার ভারও এ দলের ওপরই ন্যস্ত ছিল। বড় এক দিস্তা রঙীন কাগজে কয়টি নিশান হয়, শিশুরা শিক্ষিকার সহায়তায় প্রথমে তা ঠিক করে নেয়। তারপর নিশান তৈরী হলে—কে **কোন্ রংয়ের** নিশান করেছে, **কে মোট** কয়টা নিশান করেছে, **দলের সকলের** কয়টা নিশান হয়েছে—এসব বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়, গোনা হয় এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ হয়। কার তৈরী শিকল কতটা **লম্বা** হল, ফিতে দিয়ে মেপে দেখা হয়—কারণটা সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে ছোট, এও ছোটরা অনায়াসেই বলে দিতে পারে। অন্যান্য দলের ন্যায় এদের সমস্ত কাজ ও **অভিজ্ঞতার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়** এবং শিশুরা তা পড়ে প্রচুর আনন্দলাভ করে।

প্রকল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশুদের দিয়ে আমরা "রথের মেলা", "ডাকঘর", "পুতুলের বিয়ে", "চাঁদের দেশে খোকন", "চড়ুই ভাতি" ইত্যাদি কাজ ও খেলা আনন্দ ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছি।

তবে এই প্রকল্প বা Project অনুযায়ী করা সকল শিক্ষিকার পক্ষে **সমানভাবে ফলপ্রদ হয় না**। অভিজ্ঞা ও বুদ্ধিমতী শিক্ষিকা না হলে, **শিশুরা অযথা গোলমাল করবে, শ্রেণীতে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব হবে,** নয়তো কোন কোন শিশু তার উপযুক্ত **কাজ না পেয়ে অলসভাবে বসে** থাকবে। Project পরিচালনা-কালে শিক্ষিকাকে প্রথমদিকে অনেক বেশী খাটতে হবে ; তাকে প্রতিটি ইউনিটের শিশুদের কাজকর্মের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে—যেখানে শিশুরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা তারা নিজেরাই

সমাধান করে নিতে পারছে কিনা, তিনি তা দেখবেন **একান্ত প্রয়োজন** হলে, সমাধানের সূত্রটি ধরিয়ে দেবেন। সংখ্যা ও গণনা, লেখা ও পড়া এসব ঠিক ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে কিনা, শিশু **উলটো করে সংখ্যা বা অক্ষর** লিখছে কিনা, ভুল হচ্ছে কিনা—এসব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ অথচ সহানুভূতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি থাকবে। শিশুর কোন ভুল হলে **স্নেহের সঙ্গে শিক্ষিকা** সে-ভুল সংশোধন করার পথটি দেখিয়ে দিয়ে, শিশুকে দিয়ে তা সংশোধন করাবেন, অনর্থক তাড়না বা পীড়ন করবেন না। প্রয়োজন হলে দোকানের জিনিসের নামগুলি তিনি মোটা মোটা অক্ষরে আলাদা কার্ডে (flash card) লিখে রাখবেন এবং **অনগ্রসর শিশুকে** সেই কার্ড দেখে লিখতে উৎসাহিত করবেন; প্রথম প্রথম তিনি শিশুটিকে অন্যান্য কার্ড থেকে সেই বিশেষ জিনিসের নামটি বেছে নিতে বলবেন। দোকানের তালিকায় যে জিনিসের **ছবি ও নাম** লেখা আছে; তার দৃশ্যরূপের সঙ্গে পরিচিত হলে, বেশ কয়েকটি কার্ডের মধ্যে থেকে সেই বিশেষ কার্ডটি বেছে নেওয়া শিশুর পক্ষে কঠিন হয় না। এইসব শিশুরা ইচ্ছা করলে কাটা অক্ষর দিয়েও সেই নামটি তৈয়ার করতে পারে। এখানে জোরজবরদস্তির কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কেননা, যে খেলনাটি শিশু কিনেছে, সেই **বিশেষ নামটি** লিখতে আগ্রহ হওয়া তার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

পরিবেশে বলা চলে যে, ধৈর্য, চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকলে, যে কোনও শিক্ষিক প্রকল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের আনন্দের সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সার্থকভাবে লেখা, পড়া ও গণনা-কার্যে বা শিক্ষাদানে সহায়তা করতে পারেন।

বুদ্ধির অভিজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধির অভিজ্ঞা কি ও কেন ?

দুই-তিনটি সমবয়স্ক শিশু যখন একত্রে খেলতে থাকে, তখন আমরা তাদের সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করি। শিশুদের একজনকে অন্যের চেয়ে বেশী পাকা, চঞ্চল, ভীরু অথবা লাজুক বলে থাকি। আমাদের অভিজ্ঞতাই আমাদের বলে দেয় যে, প্রত্যেকটি শিশুই অন্য শিশুর চেয়ে পৃথক। শিক্ষার অর্থ যখন জীবনের সুষম বিকাশ, তখন প্রতিটি শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর শারীরিক গঠনের জন্য যেমন শরীরের বিকাশের স্তরগুলির কথা জেনে তার খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ দরকার, তেমনি শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য তার মনটির গঠন কি ধরনের, তার স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি—তার বুদ্ধি, তার প্রবণতা ইত্যাদির কথা জেনে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাকে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে অগ্রসর হতে হবে।

সন্তান মাতাপিতার চোখের মণি, অনেক আশা ভরসার স্থল ; তাই তাদের সম্বন্ধে মা-বাবার আকাঙ্ক্ষার আর অন্ত থাকে না। কিন্তু শিশুর বুদ্ধির নির্ভরযোগ্য পরিমাণ কতটা জানতে পারলে, তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কতটা তা সহজেই নির্ধারণ করা যায় ; ফলে মা-বাবাকে **অযথা** আশাহত হতে হয় না, এবং শিশুকেও **অযথা** তার শক্তির বহির্ভূত কাজ করতে না পারার জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় না। বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞা দ্বারা individual difference অর্থাৎ শিশুতে শিশুতে পার্থক্য সহজেই বোঝা যায় ; তারপর তাদের ভাল, মাঝারি ও মন্দ—এই কয় ভাগে ভাগ করে নিয়ে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হলে, বহু মনস্তাপ ও পরিশ্রমের অপচয় হয় না। জন্মগতভাবে কোন শিশু বুদ্ধির কতটা মূলধন নিয়ে এসেছে, তার উন্নতির সম্ভাবনা কতটা, অথবা কারা পিছিয়ে আছে, আলাদা করে তাদের কোন্ বিশেষ দিকটিতে দৃষ্টি দিতে হবে—এ সবই বুদ্ধির অভিজ্ঞার ফলে জানা যায়। তাছাড়াও শিশুর নিজস্ব রুচি ও প্রবণতা বা বিশেষ প্রবণতা কোন্ দিকে জানতে পারলে, ভবিষ্যতে কোন্ লাইনে গেলে সে ভাল করবে, তার আভাস আগে থেকেই পাওয়া যায়। কোন শিশুর যদি কোন বিশেষ ত্রুটি থাকে,

অভিজ্ঞায় তাও ধরা যায়, এবং সময়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। যেসব শিশু ক্ষীণ-বুদ্ধি তারা স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণতার দিকে অগ্রসর হতে চায়; গোড়াতেই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ঐসব প্রবণতার আশঙ্কা সহজেই অবদমিত হতে পারে।

বুদ্ধির অভিজ্ঞা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, অভিজ্ঞাগুলির সবই হয়তো নিভু'ল নয়, তবে মোটামুটিভাবে এগুলি **বিজ্ঞানসম্মত, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগের প্রভাবমুক্ত, বস্তুগতভাবে সত্য, আদর্শী-কৃত ও নির্ভরযোগ্য**। এই অভিজ্ঞাগুলির নিয়মাবলী যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে বিভিন্ন পরীক্ষকের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে গৃহীত হলেও, একই ফল লাভ করা যাবে। অভিজ্ঞা দ্বারা তাই reliable norms বা নির্ভরযোগ্য মান নির্ণয় করা চলে।

বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞার সূত্রপাত ও ক্রমপরিণতি

বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞার নানা নির্ভরযোগ্য উপায় আবিষ্কার হতে শুরু হয়। পরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে, সংশোধনের স্তর-পরম্পরা অতিক্রম করে আজ বুদ্ধি পরিমাপের ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

ফরাসী মনোবৈজ্ঞানিক **বিনে** (Binet) ১৯০৪ সালে বিদ্যালয়ের শিশুদের বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করার মানসে **সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু ও ক্ষীণমেধা শিশুদের পৃথকীকরণের** ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই বুদ্ধির অভিজ্ঞাগুলি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সহকর্মী **সাইমন** তাঁকে এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁদের আবিষ্কৃত অভিজ্ঞাগুলি **বিনে-সাইমন স্কেল** নামে পরিচিত। এতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিন কাজ (performance) ও প্রশ্ন (verbal) নির্বাচন করে তিন থেকে পনেরো বৎসরের বুদ্ধি-নির্ধারক মান তৈরী করলেন।

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'বিনে সাইমন স্কেল'-কে ঐ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে তৈরী করার সংকল্প করে লুইস টারম্যান (Lewis Terman)-কে সংস্কার করার ভার দেন। তিনি এ-কাজের ভার নিয়ে বিনের বুদ্ধির অভিজ্ঞায় মানসিক বয়সের সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা যোগ

করেন। মানসিক বয়স দিয়ে শিশুর মানসিক পরিণতি কতটা, তা মোটামুটি-ভাবে পরিমাপ করতে পারলেও, সে বাস্তবিক পক্ষে কতখানি বোকা, অথবা কতদূর বুদ্ধিমান, তা বোঝা যায় না। টারম্যান আবিষ্কার করলেন যে মানসিক বয়সের সঙ্গে ব্যক্তির বয়স যুক্ত করে তবেই বুঝতে পারা যায়। শিশুটি সমবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের তুলনায় বেশী অথবা কম বুদ্ধিমান। যে ছেলের মানসিক বয়স পাঁচ বৎসর, এবং যার সত্যিকার বয়সও পাঁচ বৎসর, সে **ছেলে স্বাভাবিক**। মানসিক বয়সকে বাস্তব বয়স দিয়ে ভাগ করে, যে ভাগফল হয়, তা দিয়ে নির্দেশ করা যায়। একে বলা হয় বুদ্ধ্যঙ্ক বা Intelligence Quotient (সংক্ষেপে I. Q.)। দশমিক চিহ্ন বাদ দেওয়ার জন্য ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরা যাক, শিশুর বয়স (জন্মগত) পাঁচ, আর তার মানসিক বয়সও পাঁচ। তাহলে—

$$\frac{\text{Mental Age}}{\text{Chronological Age}} \quad \frac{৫}{৫} \times ১০০ = ১০০$$

অর্থাৎ সমস্ত স্বাভাবিক বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০। এই উপায়ে সহজেই প্রত্যেক শিশুর বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক পরিমাপ পাওয়া যায়। যে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র যত নীচে, সে তত বোকা, আর যে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র যত ওপরে, সে তত বুদ্ধিমান—একথা সহজেই বোঝা যায়।

বিনের স্কেলের প্রথম পরিবর্তন শুরু হয় আমেরিকায় ১৯১৫ সালে। তারপর টারম্যান ও মেরিলের সহযোগিতায় এই অভিজ্ঞার একাধিকবার সংস্কার সাধন করা হয়। ১৩৩৭ সালে যে সংশোধন করা হয় তা "টারম্যান মেরিল স্কেল" নামে খ্যাতিলাভ করে। প্রত্যেক শিশুকে পৃথক পৃথক ভাবে কতগুলি প্রশ্ন করে এবং কাজের মধ্য দিয়ে তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়। টারম্যানের পরীক্ষাগুলি বিনের অভিজ্ঞার তুলনায় অনেক বেশী জটিল, অথচ নির্ভরযোগ্য। টারম্যান প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের তিন বৎসরের থেকে শুরু করে প্রতিটি বৎসরের ছেলেমেয়ের জন্য **ছয়টি** করে অভিজ্ঞার ব্যবস্থা করেছেন।

ছোটদের অভিজ্ঞায় সব সময় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি খুব উপযোগী নয় বলে আরনল্ড গেসেল (Arnold Gesell), বিভিন্ন উদ্দীপকের সাহায্যে শিশুদের দৈহিক ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা করেছেন। অনেকে একে "বুদ্ধির অভিজ্ঞা" না বলে, "শিশুর ক্রমবিকাশের ছন্দের প্রতিকৃতি" বলেন।

চার্লস বুলার অবশ্য গেসেলের কার্যকলাপকে সমর্থন করে বলেছেন যে, এতে করে পরীক্ষকরা শুধু বুদ্ধির ওপর জোর না দিয়ে, শিশুর সামগ্রিক ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ, they have tended to "shift from emphasis on the intellectual level to one of total behaviour".*

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের বহু শিশুকে পরীক্ষা করে আরনল্ড গেসেল ১৯২৫—১৯২৮-এ শিশুর ক্রমবিকাশের ছন্দের প্রতিকৃতির প্রকাশ করেন। এই শিশুদের বয়স একমাস থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত। শিশুর (১) **অঙ্গসঞ্চালন** (Motor development), (২) **ভাষা** (Language), (৩) **খাপখাওয়ানো ব্যবহার** (Adaptive behaviour), (৪) **ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহার** (Personal Social Behaviour)—এই সবগুলিকেই গেসেল শিশুর পরীক্ষার কাজে লাগিয়েছেন।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের পরীক্ষার জন্য অন্য বিখ্যাত অভিজ্ঞার নাম—**"মেরিল পামার স্কেল"** (Merrill Palmer Scale)। এতে **দুই থেকে সাড়ে ছয়** বৎসরের শিশুদের পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আদর্শীকরণ হয়, এবং রাশেল স্টাটসম্যান (Ruchel Stutsman) *Mental Measurement of Pre.School Children* বই-এ একে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই মেরিল পামার অভিজ্ঞায় পরীক্ষকের সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয় বলে শিশু কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের কাজ করতে পারে, তা পরীক্ষক খুব ভালভাবে নির্ণয় করতে পারেন—তাই একে বলা হয়, "more than a mere mental assessment"। দেড় বৎসর বয়স থেকে এই অভিজ্ঞার শুরু ; শিশুর বিকাশের প্রতি ছয় মাসের ব্যবধানে অভিজ্ঞাগুলি সাজানো। এই অভিজ্ঞাগুলি করাতে ও করতে পরীক্ষক ও শিশুর সমান আনন্দ, কারণ এই অভিজ্ঞাগুলির বেশীর ভাগই performance test অর্থাৎ কোন কাজ করা। পরীক্ষার অধিকাংশ সময়ই শিশু উজ্জ্বল রঙীন কাঠের টুকরো বা অন্য কিছু দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেলছে ; গর্তের মধ্যে খুঁটি বসাতে, ধাঁধার উত্তর খুঁজে বার করতে, ছবির জুড়ি মেলাতে, দুর্গ বা বাড়ী তৈরী করতে স্বভাবতঃই শিশুরা ভালবাসে, আর আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন

*C Buhler & H. Hetzer—*Testing Children's Development from birth to School Age.*

করে। এই সব কাজ করতে শিশুরা ক্লান্ত হয় না—তাদের একঘেয়েমিও লাগে না। তাছাড়া এই অভিজ্ঞাগুলি যেভাবে সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিলতর কাজের বা ভাষার দিকে এগিয়ে গেছে, তাতে শিশুর অসুবিধে কম হয়,—পরীক্ষকও শিশুর সফলতায় আনন্দলাভ করেন।

গুডেনাফ (Goodenough) শিশুদের মানুষের ছবি আঁকতে দিয়ে তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য ফলও পেয়েছেন। কোন শিশুকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়। যদি সে শুধু মানুষের মাথাটাই আঁকে, তবে তাকে বলতে হবে "সমস্ত মানুষের ছবিটি আঁক।" তিন বৎসরের শিশুরা একটি বড় অসমান গোলাকার এঁকে, তাতে ছোট ছোট বৃত্ত এঁকে তার দ্বারা মাথা ও চোখ বোঝাতে চেষ্টা করে ; তারপর সেই মাথা থেকেই অনেক সময় সমান টানে পা এঁকে ফেলে। ধড় বা দেহের কোন বালাই ছবিতে দেখা যায় না। পরে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আঁকা ছবিতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ. অর্থাৎ হাত পা চোখ চুল ইত্যাদি দেখা দেয় ; আরও বুদ্ধিমান শিশুর আঁকায় জামা, জামার বোতাম, জুতো ইত্যাদিও দেখা দেয়। এই ছবি আঁকার অভিজ্ঞায় শিশুর শিল্প-জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না—শিশুর সম্বন্ধ-বোধের ক্ষমতার ও পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রখরতার দিকটি বিচার করে তার বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়।

এইসব অভিজ্ঞা **কুহলম্যান** দুই থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপে উপযোগী বিনে স্কেলের অনুরূপ একটি স্কেল ১৯১২ সালে প্রকাশ করেন ; ১৯২১ এবং ১৯৩৯ সালে এই স্কেলের নানা পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য একটি বুদ্ধির অভিজ্ঞা প্রকাশিত হয় ; এর নাম **মিনেসোটা প্রি-স্কুল-স্কেল**। দেড় বৎসর থেকে শুরু করে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই অভিজ্ঞা দ্বারা পরীক্ষা করা হতো। এই স্কেলের অধিকাংশ ধারণাই পূর্ববর্তী মনোবৈজ্ঞানিকদের অভিজ্ঞা থেকে সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হয়েছিল। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **ভেলেনটাইন** দেড় বৎসর থেকে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত, এবং বৎসরে একবার করে পাঁচ থেকে পনেরো বৎসর পর্যন্ত যে অভিজ্ঞার ব্যবস্থা করেন, তা এখনও খুব জনপ্রিয় ; দিল্লীর National Council of Education, Research & Training-ও **এদেশের প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের** শিশুদের উপযোগী বুদ্ধির পরীক্ষার নানা পরিমার্জন ও মূল্যায়ণ করেছেন।

বুদ্ধির পরীক্ষাকে নানাভাবে ভাগ করা যায় ; যেমন—**বাচনিক, অবাচনিক** (non-verbal), **ব্যক্তিগত পরীক্ষা, দলগত পরীক্ষা** ইত্যাদি। বিনে পদ্ধতিতে বাচনিক ক্ষমতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল ; পরবর্তী কালে এজন্য Performance Test বা **কাজের পরীক্ষার** প্রবর্তন করা হয়। Performance Test কি, তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, **পিণ্টনার** (Pintner) ও **প্যাটারসন** (Patterson)-এর Performance Test, **গুডেনাক**-এর Drawing Test এবং **পোটিয়াম**-এর বিভিন্ন বয়সের উপযোগী ধাঁধা পথ রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দলগত পরীক্ষা এই স্তরে অচল।

প্রাক্-প্রাথমিকস্তরে এই সব অভিক্ষা ব্যতিরেকে ছবি আঁকা ও খেলাধুলার মাধ্যমেও শিশুদের বুদ্ধি পরীক্ষা হয়। ছবি আঁকার কালে শিশুর রং-এর পার্থক্য-বোধ, নিকট-দূরের প্রভেদ-বোধ, পরিমিতি-বোধ—ইত্যাদি ব্যাপার সহজেই ধরা পড়ে এবং তা থেকে শিশুর বুদ্ধির পরিণতি কোন স্তরে পৌঁছেছে, তা অনায়াসেই বোঝা যায়। অনুরূপভাবে খেলার সময় শিশু সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারে কিনা, খেলনা সম্বন্ধে শিশুর সাধারণ মনোভাব, খেলনা নিয়ে তার কথাবার্তা, খেলার সময় অন্যদের সঙ্গে তার ব্যবহার—এ সবই লক্ষ্য করা যেতে পারে ; খেলা দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিষয়ও জানা সহজ হয়।

শিশুদের বুদ্ধির মাপের বেলায় ভাষাজ্ঞানের ব্যবহার (যা বিনে ও টারম্যান-মেরিল অভিজ্ঞার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) কম থাকলে ভাল। হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধির পরীক্ষা করা সহজতর। এই জাতীয় অভিজ্ঞার নাম **Performance Tests**। তাছাড়া শিশুর কোন্ দিকে প্রবণতা, তা নির্ণয় করার জন্য Aptitude Test আছে। Projective Test বা Thematic Apperception Test-এ শিশুদের ছবি দেখিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, ছবিটি দেখে তাদের কি মনে হয়। এর মধ্য দিয়ে অনেক সময় মনোবৈজ্ঞানিকরা শিশুর আবেগ জীবনের গোপন প্রক্ষোভের সন্ধান পান।

কিন্তু বুদ্ধির থেকে ব্যক্তিত্ব অনেক বড় জিনিস। কেননা, বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র। শিশুর দেহ ও মন, তার বুদ্ধি ও কুশলতা, তার মেজাজমরজি, সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতি, তার নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী—এ সবের সমন্বয়ে-ই তার ব্যক্তিত্ব। সমান বুদ্ধি ও সমান জ্ঞানসম্পন্ন দুজন ব্যক্তির মধ্যে

একই অবস্থায়, একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়,—এর মূলে আছে দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য। যে সব উপায়ের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যক্তিত্বের বিচার করা হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—(ক) জীবনেতিহাস অনুসরণ (Case history); (খ) বিভিন্ন প্রাথমিক গুণানুযায়ী স্থান নির্দেশ (Rating scale); (গ) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে (Questionnaire method); (ঘ) সাক্ষাৎকার ও আলোচনায় (Interview); (ঙ) হাতের কাজের মাধ্যমে (Performance tests); (চ) ছবি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে (Projective procedures) এবং (ছ) মনঃসমীক্ষণ ও স্বপ্ন বিচার দ্বারা (Psycho-Analysis)।

ব্যক্তিত্ব অতি জটিল জিনিস। বৈজ্ঞানিক নানা অভিজ্ঞা দ্বারা আমরা কোন কোন শিশুর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিমাণ করতে অনেক সময়ই সফলকাম হই না বটে, তবু বলা যায় যে এসব অভিজ্ঞা দ্বারা ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, প্রবণতা, তার প্রাক্ষোভিক জীবনের অনেক কথাই জানতে পারি।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের অভিজ্ঞা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা

(১) শিশু শারীরিক সুস্থ থাকবে; সে ক্লান্ত, নিদ্রালু বা ক্ষুধার্ত হলে চলবে না। গুরুতর রোগভোগের পর কিছুদিন পর্যন্ত শিশুর অভিজ্ঞা স্থগিত রাখতে হবে।

(২) বয়সের ক্রম-অনুযায়ী প্রতিটি শিশুকে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র পরীক্ষা করা হবে। পাঁচ বৎসরের একটি শিশুকে কুড়ি মিনিট পরীক্ষা করাই যথেষ্ট, আরও অল্প বয়সের শিশুদের জন্য আরও কম সময় দেওয়া উচিত। পরীক্ষা করতে করতে শিশু যদি ক্লান্তি বোধ করে, তবে অভিজ্ঞা স্থগিত রেখে কিছু সময়ের জন্য শিশুকে তার ইচ্ছামত খেলতে দিয়ে, আবার অভিজ্ঞা শুরু করা হবে; অথবা আবার অন্যদিন পরীক্ষা নিতে হবে। অভিজ্ঞাগুলিকে শিশুর কাছে "খেলা" বলে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) যিনি শিশুর অভিজ্ঞাগুলির পরিচালনা করবেন, তিনি যদি শিশুর পরিচিত ও প্রিয় হন, তবে সেটাই হবে আদর্শস্থানীয়। অন্যথায়, তিনি প্রথমে শিশুর সঙ্গে খেলা করে শিশুকে খুশী রাখার চেষ্টা করবেন। শিশু যদি একান্তই

ছোট হয়, তবে তাকে খেলনা দিয়ে খানিকক্ষণ আপন মনেই খেলতে দেবেন,—তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবেন না।

(৪) যে শিশুদের আত্মবিশ্বাস আছে, যারা বেশী কথা বলে—এমনি ধরনের ছেলেদেরই প্রথমে পরীক্ষা করতে হবে ; এদের নির্ভীকভাবে খেলতে দেখে অন্য ভীরু ও দুর্বল (Nervous) শিশুরা সাহস পাবে।

(৫) পরীক্ষক শিশুকে একটি আলাদা ঘরে নিয়ে পরীক্ষা করবেন ; তবে পরীক্ষক যদি শিশুর অপরিচিত হন, তবে দুই থেকে তিন বৎসরের ছোট্ট শিশুদের পরীক্ষার সময় তাদের মা অথবা প্রিয় ও পরিচিত শিক্ষিকার উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু তাদের পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে, তারা যেন শিশুদের সাহায্য করতে চেষ্টা না করেন।

(৬) শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তার বয়সের অনুপাতে অধিকতর সহজ অভিজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে হবে। যেমন তিন বৎসরের শিশুকে প্রথমে আড়াই বৎসরের শিশুর উপযুক্ত পরীক্ষাগুলি দিয়ে আরম্ভ করে, পরে তিন, সাড়ে তিন, চার প্রভৃতি বয়সের উপযুক্ত পরীক্ষা একে একে করে যেতে হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশু অপারগ হয়। যে শিশু খুবই ভীরু এবং আত্ম-শক্তিতে আস্থাহীন, তাকে প্রথমে তার বয়স থেকে অন্ততঃ দুই বা তিন বৎসরের কম বয়সের উপযোগী খুবই সহজ অভিজ্ঞা দিয়ে শুরু করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

(৭) শিশু যখন এক-একটি পরীক্ষা শেষ করবে ; তখন ভুল অথবা শুদ্ধ হলেও পরীক্ষক "ভাল" বলবেন, অথবা হেসে শিশুকে উৎসাহিত করবেন। তবে যেখানে সংখ্যা বা শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে হবে, সেখানে প্রথমেই শিশু ভুল করলে বলতে হবে—"বেশ, কিন্তু একেবারে ঠিক হয়নি ; এটা আর একবার চেষ্টা করে দেখ।"

(৮) শিশু যখন Form board বা Mage Test ধরনের কোন পরীক্ষার মাঝখানে কাজ করতে ইতস্ততঃ করে বা দ্বিধা করে, তখন পরীক্ষকের মনে রাখা **একান্ত দরকার** যে তিনি পরীক্ষার **মাঝখানে** শিশুকে কোন ইঙ্গিত বা ইশারা করবেন না। অনেক সময় শিশু পরীক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে চেষ্টা করে যে সে "খেলা"টি ঠিকভাবে করছে কিনা !

(৯) পরীক্ষা গ্রহণকালে, শিশু ভুল করলেও তাকে সংশোধিত করা হবে

না, অথবা মৌখিক পরীক্ষায় তাকে সঠিক উত্তর কোন্‌টি, তারও কোন নির্দেশ দেওয়া হবে না।

(১০) এক থেকে দুই বৎসরের শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষার সময় অভিজ্ঞাগুলি দুই বা আড়াই সপ্তাহ পর পর পুনরাবৃত্তি করানো প্রয়োজন। তিন ও চার বৎসরের শিশুদের জন্য এই অভিজ্ঞাগুলির পুনরাবৃত্তি দুই বা তিন মাস পরপরও হতে পারে। একবার মাত্র পরীক্ষা না করে, প্রাক্‌-প্রাথমিক স্তরে যদি কয়েকবার পরীক্ষা করা যায়—এই পরীক্ষার কাল যদি ছয় মাস থেকে এক বৎসরব্যাপী হয়—তবে পরীক্ষার ফল অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হয়।

(১১) যদি পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক খুবই নীচে, তবে কিছুদিন পরে শিশুকে আবার পরীক্ষা করা দরকার। কারণ যে সময়ে তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন হয়তো শিশুটি অমনোযোগী, ক্লান্ত বা অন্য কিছু খেলতে উৎসুক ছিল, তাই অভিজ্ঞার "খেলা"গুলো ঠিক করে করেনি।

(১২) বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষা করার নিয়মাবলী এবং মোট অঙ্ক (points) পাওয়ার যে সকল শর্ত আছে, পরীক্ষকের তা সতর্কতার সঙ্গে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি সহানুভূতি দেখিয়ে কখনই বলবেন না, "আহা ছেলেটা যদি বুঝত কি করতে হবে, তবে সে ঠিকই পারত।" কারণ অভিজ্ঞাতে কি করতে বলা হয়েছে, তার **নির্দেশ বুঝতে পারা** অভিজ্ঞার একটি প্রয়োজনীয় অংশ।

(১৩) শিশু আংশিক বধির কিনা, আগেই কথাবার্তায় জেনে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞার নির্দেশগুলির পুনরাবৃত্তি করা চলতে পারে। নির্দেশ দেবার সময়ে কথা বেশ ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলতে হবে।

বিভিন্ন বয়সের অভিজ্ঞার নমুনা

বয়স : ১ বৎসর ৬ মাস

(ক) ক্রেয়ন ও কাগজে হিজিবিজি কাটা।

(খ) লজেন্স বা টফির মোড়কের কাগজ খোলা।

(গ) নিজের শরীরের কোন অংশ দেখানো—প্রশ্ন : তোমার মুখ/পায়ের আঙুল/মাথা দেখাও।

বয়স ঃ ২ বৎসর

(ক) ১ ইঞ্চি বর্গবিশিষ্ট অন্ততঃ চারটি কাঠের ব্লক দিয়ে tower বা উঁচু বাড়ি তৈরী করা। বাড়িটা যেন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) শিশুর পরিচিত কয়েকটি দ্রব্য সামনে রেখে আদেশ দিলে করতে পারে কিনা দেখা ; যেমন—চামচেটা আমাকে দাও ; বলটা পেয়ালার মধ্যে রাখ ইত্যাদি।

(গ) একবার কাগজ ভাঁজ করা ; বড় খাতার মাপের একটি কাগজ নিয়ে দু-ভাঁজ করে শিশুকে দেখিয়ে দিয়ে বলতে হবে—"এবার তুমি এরকম কর।"

বয়স ঃ ২ বৎসর ৬ মাস

(ক) কাঠের form board দিয়ে তাতে ঠিকমত গর্তে টুকরো বসাতে দেওয়া।

(খ) কি কাজে লাগে, তা দেখাতে পারা ; যেমন—পাঁচটি জিনিস ট্রে-তে থাকবে—একটি গ্লাস, জুতো, পয়সা, ছবি, চিরুনি ; আর কাছেই থাকবে একটি চেয়ার।

প্রশ্ন করা হবে—(i) আমরা কিসে করে জল খাই দেখাও। (ii) আমরা কি দিয়ে জিনিস কিনি ? (iii) আমরা কিসে বসি ? ইত্যাদি।

শুধু নাম বললে হবে না—জিনিসটি দেখানো অবশ্যই দরকার।

(গ) অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা—

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশু তার কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে কিনা দেখা ; সম্পূর্ণ বাক্য না বলতে পারলেও সে পাশ নম্বর পাবে।

বয়স ঃ ৩ বৎসর

(ক) মুখমণ্ডল বা শরীরের অংশ বিশেষ আঙুল দিয়ে দেখানো। তোমার নাক, চোখ, চুল, হাঁটু—দেখাও।

(খ) অঙ্কিত একটি বৃত্ত দেখে আঁকতে পারে কিনা দেখা। শিশুর সামনে বৃত্তটি আঁকা চলবে না।

(গ) সংখ্যা বললে পুনরাবৃত্তি করতে পারে কিনা—শোন এবং আমার বলার পর বল—৩, ৭, ৪।

Intelligence Test for Children—C. W. Valentine.

কার্ডটিকে এর পর সমান করে কেটে দুটো triangle তৈরী করতে হবে। টেবিলের ওপর চতুষ্কোণ কার্ডটি ও দুটো triangle রেখে (কালো দিকটি নীচে রাখতে হবে)। শিশুকে ঐ টুকরো দুটো দিয়ে চতুষ্কোণটির সমান করে রাখতে বলতে হবে। সর্বদাই দেখতে হবে, শিশুটি যাতে কালো রং-এর দিকটি উল্টো করে রাখে। না রাখলে শিশুকে সেই অনুসারে নির্দেশ দিতে হবে।

(চ) বাক্যকে সম্পূর্ণ করা—

বলতে হবে—"আজ একটি ছোট ছেলে যখন বাইরে যাচ্ছিল, তখন আমি একজন লোককে বলতে শুনলাম—।

(i) "কমল, এখন খুব বৃষ্টি পড়ছে, কাজেই——। বাকিটা আমি শুনতে পাইনি ; বলতো সে লোকটি কমলকে আর কি বলেছিল ?

(ii) একটি মেয়ে দৌড়ে বাগান থেকে এসে মাকে বলল, "আমার হাত নোংরা, কারণ——।

(iii) একটি ছোট ছেলে চা খেতে খেতে মাকে বলল, "মা, চাটা খুবই গরম, কাজেই——।

প্রয়োজন হলে প্রতিটি বাক্যাংশ **তিনবার** বলা চলবে।

শিশুদের সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

ছোট শিশুদের ব্যবহারে অনেক সময় কিছু কিছু বিরক্তিকর এবং অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায়। যেসব তরুণী মায়েরা কেবলমাত্র নিজেদের সন্তানকেই মানুষ করে তুলছেন এবং যাদের মনোবিজ্ঞানের কোন জ্ঞান নেই, তারা সহজেই শিশুদের এ সকল সমস্যামূলক ব্যবহারে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

সুজান আইজ্যাকস শিশুদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন। সেটি হচ্ছে—"There are no problem children ; only there are children with problems." কথাটি সর্বাংশে সত্য। শিশুটিই সমস্যা নয় ;—শিশুর সম্মুখে হয়তো কোন সমস্যার উদয় হয়েছে, আর সে তার সমাধানে অপারগ, তাই তার ব্যবহারে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন—"There are no problem children, but only problem parents." এ কথাও আংশিকভাবে সত্য। কেননা, পিতামাতার খামখেয়ালী, মরজি বা সমস্যাগুলি শিশুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে নানা অশান্তির ঢেউ তোলে ; ফলে শিশুর ব্যবহারিক জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মধ্যে কি ধরনের সমস্যা সাধারণতঃ দেখা দেয়, কি উপায়েই বা সেই সকল সমস্যার প্রতিকার করা যায়, তার কিছু কিছু আলোচনা এখানে করা হল।

শিশুর মেজাজ ও মরজি

সাধারণতঃ দুই বৎসরের পর থেকেই শিশুর মেজাজ-মরজি বেশী করে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ এ সময়টা তার দেহ ও মনের বিকাশের দিক থেকে **অস্থিরতার কাল**। তার দেহ এ সময় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, মন সেই অনুপাতে বাড়ে না,—পেশীর ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু তার সুসংগঠনের ক্ষমতা তখনো আয়ত্তে আসে না। তার নানা অভাব, নানা তাড়নার প্রতিবাদের মাধ্যম হল জেদ, কান্নাকাটি ও মেজাজ-মরজি। বয়স্কদের সঙ্গে মতবিরোধ, প্রাত্যহিক রুটিনের পরিবর্তন, খুব বেশী আঁটসাঁট জামা-কাপড় পরা, স্বাধীন কার্যে হস্তক্ষেপ—এ সবেতেই প্রধানতঃ শিশুর মেজাজ বিগড়ায়। নার্সারী বিদ্যালয়ে এসে এই সমস্ত কারণেই কান্নাকাটি ছাড়াও অন্যভাবে শিশুদের মেজাজ প্রকাশিত হয়। শিশু অনেক সময় শক্ত ও অনড় হয়ে বসে থাকে—

নড়াচড়া করে না—কথাও বলে না। আরও পরের স্তরে শিশু বয়স্কদের অবাধ্য হয়ে এই মেজাজ দেখায়। অনেক সময় মেজাজ-মরজির আতিশয্যের ফলে শিশু দেওয়ালে বা টেবিলে মাথা ঠোকে, অন্যকে আঘাত করে, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বা কাঁদে, কামড়ায় বা লাথি মারে। এইরকম সময়ে শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে শিক্ষিকা বা পিতামাতা যদি উত্তেজিত হয়ে বা রাগ করে শিশুকে প্রহার করেন, তবে ফল আরও খারাপ হয়। শিশুর এই প্রবল উত্তেজনার সময় সে যাতে নিজের শারীরিক কোন ক্ষতি না করে সেই উদ্দেশ্যে তাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে, এবং অন্য শিশুদের সান্নিধ্যে যেতে দেওয়া হবে না। শিক্ষিকার শান্ত, অনুত্তেজিত ও সহানুভূতিমূলক আচরণের ফলে শিশু শিগ্‌গিরই তার আত্মবোধ ও আত্মসংযম ফিরে পায়। রাগের ফলে শিশুর চোখ-মুখ অতিরিক্ত লাল হয়ে উঠলে, ঠাণ্ডা জল দিয়ে তা ধুইয়ে দিতে হবে। কোন প্রকারেই যদি শিশুকে শান্ত করা না যায়, তবে কিছুক্ষণ তাকে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে দেওয়া ভাল; এতে তার উদ্বেগের উপশম হয় এবং সে শান্ত হয়। বড়দের মনে রাখতে হবে যে মেজাজ-মর্জি দেখিয়ে কোন জিনিসের বায়না করলে, তা শিশুকে দেওয়া কখনই উচিত হবে না; কারণ তা করলে শিশু তার চাহিদা মেটাবার জন্য বার বার ঐ একই অবাঞ্ছিত পন্থার আশ্রয় নেবে।

নেতিমূলক আচরণ ও একগুঁয়েমি

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের একেবারে গোড়ার দিকে শিশুদের মধ্যে নেতিমূলক আচরণ ও একগুঁয়েমি বেশ বেশী করেই দেখা দেয়। এর কারণ, দুই-আড়াই বৎসরের পরই শিশুর স্বাধীন সত্তার উপলব্ধি হয়, আর তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সে সহ্য করতে পারে না বলেই নেতিমূলক আচরণ করে, বা একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। মা-বাবা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি ছোটদের ক্রমবিকাশের পরম্পরার কথা জানেন এবং কোন বয়সের শিশুর কাছে কি ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা যায় তা জেনে নেন, তবে শিশুর এই ধরনের ব্যবহারে তারা উতলা হবেন। একে "Passing Phase" বলেই মেনে নেবেন; তারা তখন জানতে পারবেন যে কোন্ বিশেষ বয়সে শিশুর স্বাধীনসত্তা জাগবে, তার আত্মবোধ জাগবে—কখন বয়স্কদের অযথা আচরণের প্রতিবাদ শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে শিশু বুঝতে পারে বড়রা তার স্বাধীন সত্তাকে মর্যাদা দিচ্ছেন কিনা—তাকে সহানুভূতির সঙ্গে **অনুরোধ করছেন**

কিনা—কেবলমাত্র বয়সে বড় বলে জিদ **করে আদেশ** দিচ্ছেন কিনা। যখন শিশুরা বুঝতে পারে যে, তাকে দাবিয়ে রাখার জন্যই বড়রা বিশেষ ধরনের ব্যবহার করছেন, কেবলমাত্র সেইক্ষেত্রেই নেতিমূলক আচরণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

আন্নুভূতিক সমস্যাজাত শারীরিক লক্ষণ

আঙ্গুল চোষা, নখ কামড়ানো, জননেন্দ্রিয় ঘর্ষণ—এসবই শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ। অল্পসল্প পরিমাণে এগুলো প্রায় সব শিশুর মধ্যেই দেখা যায়, এবং এগুলো এমন কিছু ক্ষতিকারকও নয়। 'চোষা' মানব-শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি—মাতৃস্তন্য চোষার বিকল্প হিসাবে শিশুর আঙ্গুল চোষে। ঘুমাবার সময় আঙ্গুল চুষতে পারলে অনেক সহজে শিশুর ঘুম আসে। কিন্তু এই অভ্যাসটি দীর্ঘদিন চলতে থাকলে বুঝতে হবে যে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের কোথাও অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছে। যে সব শিশু সম-বয়স্কদের সঙ্গ পায় না, যারা অবাধ খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যারা একঘেয়ে ও গতানুগতিক জীবনযাপন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যে শিশু মা-বাবার স্নেহসুধা পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না, যে একলা একলা থাকে অথবা যার মধ্যে হিংসা ও উদ্বেগের ভাব প্রবল—এ সব শিশুর মধ্যেই আঙ্গুল চোষা, জনজেন্দ্রিয় ঘর্ষণ, নখ কামড়ানো প্রবৃত্তিগুলি বেশী দেখা যায়। আঙ্গুল চোষা থেকে নখ কামড়ানোর ব্যাপারে শিশুর প্রাক্ষোভিক উদ্বেগ অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুরা যদি মাঝে মাঝে লিঙ্গ স্পর্শ করে, অথবা সে বিষয়ে কৌতূহল দেখায়, তবে সে বিষয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়—কেননা, শিশুদের এ বিষয়ে কৌতূহল হাওয়া স্বাভাবিক। তবে শিশু যদি বার বারই এ কাজ করে, অথবা ঘুমের মধ্যে বা গোপনে একলা ঘরে—এ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তবে বুঝতে হবে যে এ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে কোনও মানসিক অশান্তির প্রতিকারের উপায় খুঁজছে। স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্বাভাবিক খেলাধুলার মধ্য দিয়ে—সস্নেহ ও সহানুভূতিসূচক পরিচালনায় শিশুর আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে পারলে এ কুঅভ্যাস সহজেই দূর হয়। শিশুরা যেন কুসঙ্গীর প্রভাবে না পড়ে,—সে দিকে বয়স্কদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুর এসব ব্যাপারের জন্য তাকে প্রহার করা অথবা ভীতিপ্রদর্শন করা উচিত নয়। এইভাবে অবদমিত হলে শিশুরা ক্রমেই হতাশ ও আত্মমুখী হয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। এসব কুঅভ্যাস সারানোর

জন্য **সরাসরি চেষ্টা না করা** অথবা এসবে **অত্যধিক মনোযোগ না দেওয়াই** ভাল। শিশুকে উপযুক্ত খেলাধুলার মাধ্যমে, বিস্তৃত পরিবেশে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে সুখী ও তৃপ্ত করতে পারলে এই অপসংহতির অবসান সহজেই হয়। দীর্ঘদিন যদি এ অভ্যাস চলতে থাকে, তবে মনোচিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।

ধ্বংসাত্মক মনোভাব

প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরে কোন কোন শিশুর মধ্যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। এসব শিশু জিনিসপত্র ওলটপালট বা বিক্ষিপ্ত করে, খেলনাপত্র ভেঙে ফেলে, অনেক সময় আসবাবপত্র অথবা বাড়ির অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসও নষ্ট করে ফেলে। ছোট শিশু যখন তার খেলার গাড়ির চাকাগুলো খুলে ফেলে ও গাড়ির অন্যান্য অংশ টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে, তখন সে যে খালি দুষ্টুমি করেই ভাঙে তা নয়—তার কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই সে ভেঙে দেখতে চায়—গাড়িটি কি ভাবে তৈরী করা হয়েছে জানতে চায়। গাড়ি কি করে তৈরী হয়, বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে সেটা তার কাছে স্পষ্ট হয় না,—সে হাতেকলমে করে দেখতে চায়। খুব ছোটদের এই মনোভাব এবং এরূপ কাজ স্বভাব-জাত; এ নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হয়ে, দরকারী জিনিস শিশুর নাগালের বাইরে রাখতে পারলে অপচয় কম হয়। কিন্তু কোন কোনও সময় দেখা যায়, কিছুটা সাবধানতা সত্ত্বেও শিশু জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করছে। এতে বুঝতে হবে, শিশু তার **বাড়তি শক্তিকে** অন্য কোন সমাজ-সঙ্গত উপায়ে কাজে লাগাতে না পেরে, ধ্বংসাত্মক কাজকে বেছে নিয়ে নানাপ্রকারের দৌরাত্ম্য করছে। এসব ক্ষেত্রে শিশুর অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে যাতে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায়, তার চেষ্টা করা দরকার। অবারিত মাঠে ছোটাছুটি করা, ছোট করাত দিয়ে কাঠ কাটা, বড় বড় ড্রাম বা পিপে ইত্যাদি টেনে বা ঠেলে নিয়ে যাওয়া, বালি ভর্তি বস্তা নিয়ে কুস্তি করা বা ঘুঁষোঘুঁষি করা, বড় বড় খবরের কাগজের পাতা ছিঁড়ে কুচি কুচি করা, hammering log-এর দ্বারা জোরে জোরে হাতুড়ি ঠোকা। Percussion band-এর কাঠি, ঢোল বা ঘণ্টার শব্দ করা, বাগানের কাজে ছোট কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো বা কাঠের মুগুর দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো করা—এসব কাজে শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ঘটে। করাত দিয়ে টুকরো করে যে কাঠ শিশুরা কটলো, তা দিয়ে

কাঠের বাড়ি, পুল অথবা অন্য কোন জিনিস তৈরী করা, ছেঁড়া কাগজের টুকরোতে রং লাগিয়ে ছবি বা নক্‌শা বানানো, বাগানে শাক-সবজি বা ফুল উৎপাদন করার মাধ্যমে শিশুর এই হিংসাত্মক প্রবৃত্তিকে উর্ধ্বগামী করে, গঠনের কাজে লাগানো যায়।

তোতলামি

শিশু যখন প্রায় তিন বৎসরের হয়, তখন অনেক শিশুর মধ্যে তোতলামি দেখা দেয়। শিশুর কথার ভাণ্ডার বৃদ্ধি পেলেও তার প্রকাশের উপযুক্ত শব্দটি খুঁজে পেলে, শিশুর তোতলামি স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। ২, ২½ বৎসরের শিশুর মনে যে ভাব জাগে, অনেক সময় শিশু ভাষার মাধ্যমে তার রূপ দিতে অপারগ হয়—ফলে তোতলামি দেখা দেয়। শিশু কি বলতে চায় তা মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করে, তার প্রকাশের উপযুক্ত কথাটি সহানুভূতির সঙ্গে তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক সময়ই শিশুর তোতলামি সেরে যায়। হাসাহাসি করলে বা ব্যঙ্গ করলে শিশুর তোতলামি সারে না। সকলের সামনে শিশুকে অপদস্থ করে, তার দোষটিকে অনুকরণ করলে মারাত্মক ফল হয়।

তবে অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে শিশু যে তোতলামি করে, তার অন্য কারণও থাকতে পারে। বড়দের কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেলে, মায়ের বা অতি প্রিয়জনের মৃত্যুতে, নূতন ভাই বা বোনের জন্মের ফলে শিশুর নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হলে অথবা বয়স্কদের সামনে কোন ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ অসফলকাম হলে অনেক সময় শিশুর তোতলামি শুরু হয়। এসব ক্ষেত্রে হঠাৎ স্বাভাবিক শিশুর কেন এই অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করে, সেই ভাবে প্রতিকার করতে হবে। শারীরিক কারণে, জিহ্বার জড়তার জন্য হলে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে হবে। কিন্তু তোতলামি যদি বেশী দিন ধরে চলে, তবে তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে, সেইভাবে চিকিৎসা করাতে হবে—কেননা, এই পর্যায়ে তোতলামি মনোচিকিৎসকের—পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিশুর খাওয়ার সমস্যা

নার্সারী স্তরের শিশুদের মায়েরা প্রায়ই অনুযোগ করেন যে তাদের শিশু খাবার সময় নানা বায়না করে—"এটা খাব না, ওটা খাব না" বলে। খেতে খুব বেশী সময় লাগায়—অর্থাৎ সোজা কথায় মাকে খুব জ্বালায়। বিশেষ বিশেষ শিশুর বিশিষ্ট খাদ্যে স্পৃহা না থাকাই স্বাভাবিক। যে খাদ্য খেতে শিশুর অনিচ্ছা, তাকে

সেই বিশেষ খাদ্য খাবার জন্য অন্ততঃ কয়েকদিন **জোর না করাই উচিত।** খুব তলতলে বা পিচ্ছল খাবার অনেক শিশুই পছন্দ করে না ; কিন্তু খাবার যদি সুন্দর রং-এর হয় এবং মনের মত করে সাজিয়ে সেই খাদ্য পরিবেশন করা হয়, তবে তা সহজেই শিশু খেতে চাইবে। শিশুকে খাওয়াবার সময় মনে রাখা একান্তই প্রয়োজন যে, তাকে **জোর করে খাওয়ানো অথবা অনুনয়-বিনয় বা খোসামোদি করে খাওয়ানো**—কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। শিশু খাচ্ছে না দেখে মা উদ্বিগ্ন হন—মায়ের সেই উদ্বিগ্নভাব শিশুতে প্রতিফলিত হয়, তাই শিশুর খাবার বিতৃষ্ণা জন্মে। মা হয়তো অনেক আদর করে শিশুকে খাওয়াতে বসেন, তারপর যখন দেখেন তার অনেক কষ্টের ও যত্নের তৈরী করা খাবার শিশু ভাল করে খাচ্ছে না, তখন অনেক সময় চড়-চাপড় লাগান বা জোর করে খাওয়ান। ফলে শিশু বমি করে ফেলে, নয়তো কান্নাকাটি করে একেবারেই খেতে পারে না। উদ্বিগ্ন মায়েদের কাছ ছাড়া হলেই বরং শিশুরা স্বাভাবিকভাবে খায়। নার্সারিতে অন্য শিশুদের খেতে দেখে, নূতন আগন্তুকও খুশী হয়ে তাদের অনুকরণ করে—আর নূতন খাবারের আস্বাদ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। মায়েরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, নার্সারীতে এসে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেতে খেতে তাঁর শিশুর খিদে বেড়েছে,—সে তার বিশেষ অপছন্দের গাজরের টুকরোটি অন্য শিশুদের মত স্বাভাবিক ভাবে চিবুচ্ছে, সে নিজে নিজেই খেতে পারছে, আর তৃপ্তি করে সব খাবার চেটেপুটে খেয়ে ফেলছে। অনেক সময় দেখা যায়, শিশু একলা একলা খেলে ভাল করে খায় না,—পরিবারের অন্য পাঁচজনের সঙ্গে খেলে স্বাভাবিকভাবে খায়।

শয্যামূত্র বা বিছানা ভেজানো

সাধারণতঃ দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যেই শিশুরা মূত্রত্যাগ সম্বন্ধে কিছুটা সংযত হতে পারে বলে আর বিছানা ভেজায় না। বিছানা ভিজে থাকলে শোবার আরাম নষ্ট হয়ে যায়, ঠাণ্ডা লাগে ও মা বিরক্ত হতে থাকেন—একথা অস্পষ্ট হলেও শিশু বোঝে ; যেসব মা-বাবারা একটু কষ্ট করে শিশুকে ছোট বয়স থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বিছানার বাইরে মূত্র ত্যাগের অভ্যাস করান, তাদের শিশুরা এ অপকর্ম সহজে করে না। কিন্তু আড়াই বৎসরের পরও যদি এই বদ-অভ্যাস কোন শিশুর মধ্যে

থেকে যায়, তবে তার শারীরিক কোন ত্রুটি আছে কিনা অর্থাৎ মূত্রাশয়ের পেশীর দৌর্বল্য আছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয্যামূত্রের কারণ হিসাবে মানসিক অশান্তি বর্তমান থাকে। ভীতু, অভিমানী বা দুর্বল স্নায়ুবিশিষ্ট শিশুর মধ্যেই এ কু-অভ্যাস বেশী দেখা যায়। নূতন ভাই বা বোনের জন্মের পর, এবং মা অথবা মাতৃ-কল্পা স্নেহময়ীর মৃত্যুর পর শিশুর নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়। শিশু তখন তার নিজের দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, আর বয়স্কদের ওপর রাগ প্রকাশ করে,—তাই সে বিছানা ভেজায়। মোট কথা, শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে কোনও অশান্তির ঢেউ উঠলেও, শয্যামূত্র দেখা যেতে পারে। বকুনি দিয়ে, শিশুকে ধরে-ঝাঁকুনি দিলে, রাগ করলে অথবা উত্তেজিত হলে, তাকে শাস্তি দিলে—শিশুর এই কু-অভ্যাস দূর তো হয়ই না, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। তাকে বরং বুঝিয়ে দিতে হবে যে অল্পমাত্রায়ও প্রস্রাব পেলে সে যেন উঠে গিয়ে তা করে আসে; তা হলেই সে সংযত হতে পারবে,—অপকীর্তি আর হঠাৎ হয়ে যাবে না। প্রবল চেষ্টা ও সংযমের ফলে শিশু যেদিন বিছানা না ভিজাবে, সেদিন তাকে প্রশংসা করতে হবে। হঠাৎ যদি ভিজিয়ে ফেলে, তবে সে যাতে নিজেই জামা-কাপড় বদলাতে পারে, ন্যাকড়া দিয়ে মেজেটা মুছে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। রাত্রের খাবারের কিছুটা পরিবর্তন—যেমন অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাদ্যের বর্জন, খুব বেশী মিষ্ট দ্রব্য না খাওয়া, খাদ্যে জলীয় ভাগ যেন কম থাকে তা লক্ষ্য করা, পানীয় কম করে খাওয়া—এসব বাঞ্ছনীয়। ঘুমের আগে শিশু উত্তেজিত হতে পারে, এমন কিছু করা উচিত নয়; ঘুমের আগে সে যাতে শান্ত হয়ে কিছুক্ষণ কাটাতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মিথ্যা কথা বলা

ছোটদের নিয়ে যাঁরাই কারবার করছেন, তাঁরাই জানেন যে ছোটরা কখনো কখনো মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা বলাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শিশু অজান্তে মিথ্যা কথা বলে এবং (২) শিশু জ্ঞানতঃ মিথ্যা বলে।

শিশু অজান্তে যে মিথ্যা বলে তার কতগুলো কারণ থাকে।

প্রথমতঃ, তার দৃষ্টিভঙ্গী বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। সে নিজে ছোট বলে শক্তিশালী জন্তু বা বয়স্ক মানুষদের সে খুবই বেশী "বলশালী" বা বড় মনে করে। তাই

তো সে বলে—"তালগাছের মত বড় মানুষ দেখেছি" ; "বড় বড় সিংহ আর বাঘ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল"—ইত্যাদি। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সে যখন আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন এ-জাতীয় মিথ্যা বলা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ শিশুর স্মরণশক্তি ছোটবেলায় খানিকটা অপরিণত থাকে, এবং বড়দের সাহায্য ছাড়া অনেক সময় অতীত অভিজ্ঞতার কথা শিশু স্মরণ করতে পারে না। নার্সারীতে সারাদিন কাঠের ব্লক, পুতুল, রং-তুলি ইত্যাদি দিয়ে খেলা করেও, অনেক সময় বাড়িতে ফিরে মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে শিশু বলে—"স্কুলে কিছুই করিনি।" তা ছাড়া শিশুর সময় ও কালের ধারণা অস্পষ্ট থাকে, এজন্য গতকাল, আগামীকাল, পরশু, এসব শিশু গোলমাল করে ফেলে,—মিথ্যা কথা বলার জন্যই ভুল করে বলে না।

তৃতীয়তঃ, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্যেও শিশু মিথ্যা বলে। যে শিশুরা অতি দরিদ্র, এবং যাদের খেলার কোনও সামগ্রী নেই, তারা মিছামিছি বলে বেড়ায়—"বাবা আমাকে একটা বড় পুতুল অথবা লাল মোটর গাড়ি কিনে দিয়েছেন।" নিজের অবচেতন মনে যা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই মিথ্যা বলার মধ্যে শিশু-মন তার তৃপ্তি খোঁজে। শুধু গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা নয়, অনেক ধনী ঘরের শিশুদের মধ্যেও এই মিথ্যা কথনের অভ্যাস দেখা যায়। ধনী ঘরের যে ছেলেমেয়েরা অতিরিক্ত কঠোর শাসনে বড় হতে থাকে, যেখানে বয়স্করা সর্বদাই শিশুকে আগলিয়ে রাখেন, যেখানে খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর সৃজনস্পৃহা চরিতার্থ হয় না, এবং যেখানে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে অশান্তি বর্তমান থাকে, সে সব ক্ষেত্রে শিশুদের মিথ্যা বলা স্বাভাবিক।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে প্রথম দুটি বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অন্তর্হিত হতে দেখা যায়। তৃতীয় কারণটির বেলায় পিতামাতাকে সাবধান হয়ে, শিশুর মনে প্রক্ষোভজনিত সমতা আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। খুব ছোটদের "মিথ্যা কথা বলছ" এই বলে দোষী করা উচিত নয়,—কেননা, এতে ছোটরা যে কথা দিয়ে অন্যদের প্রতারণা করতে পারে, তার আভাস পায়। শিশু যখন জ্ঞানতঃ মিথ্যা বলে, তখনই সেটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জেনেশুনে মিথ্যা বলার অনেক কারণ থাকে ; তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

১। **ভয়** ঃ শিশু যখন ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলে, তখন তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সে ভয় পেয়েই ঐ রকম বলছে। কাঁচের গ্লাস

ভাঙার সঙ্গে প্রহারের ভয় বর্তমান, কাজেই গ্লাস ভেঙে ফেলে শিশু মারের ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য বলে, "আমি ভাঙিনি।" ভয়ের কারণ দূর হলে, স্বাভাবিক ভাবেই মিথ্যা বলা বন্ধ হয়ে যাবে।

২। **অহংবোধের প্রাধান্য :** যে সব শিশু অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, অথবা যে সব শিশু অবহেলিত—এই দুই ধরনের শিশুই মিথ্যা বলে প্রাধান্য নিতে চায়। বেশী আদুরে শিশুরা সর্বদাই অন্যদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে, কাজেই তারা মিথ্যা বলে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় ; পক্ষান্তরে যারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত তারাও নানা রংচঙে গল্প বলে,—বীরত্বের মিথ্যে বড়াই করে অথবা অতিমূল্যবান খেলনা বা সঞ্চয়ের অধিকারী বলে নিজেদের জাহির করতে চায়। যাদের জীবনে বৈচিত্র্য কম, একঘেয়েমি বেশী—এ ধরনের শিশুই মিথ্যাকথা বলে মনের সাধ মেটায়।

৩। **স্বার্থপরতা ও অলসতা :** অলস ও স্বার্থপর শিশু নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির মানসে মিথ্যা বলে। অলসতার পশ্চাতে অনেক সময় শারীরিক অবসাদও থাকে। অথবা জন্মাবধি যদি শিশু সবই তৈরী অবস্থায় হাতের কাছে পেতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে স্বভাবতঃই অলস ও স্বার্থপর হয়ে বড় হতে থাকে, এবং এই আলস্যের জন্যই কাজ করে না এবং মিথ্যা বলে।

৪। **অনুকরণ :** বড়দের অনুকরণেও শিশু মিথ্যা বলতে শেখে। বড়রা অনেক সময় বলেন—"অপিস থেকে ফেরার সময় তোমাদের জন্য চকোলেট নিয়ে আসব।" শিশু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে ; তারপর বিকেলে হয়তো শোনে—"কই আমি চকোলেট আনার কথা বলিনি তো!" এতে শিশু মিথ্যা বলতে শেখে। তা ছাড়া পাওনাদারের উৎপাত এড়াবার জন্য বাবা হয়তো বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠান—"বলো, বাবা বাড়ি নেই।" এইসব পরিবারের শিশুরা সহজেই মিথ্যা বলতে শিখে।

যেখানে বাড়ির আবহাওয়া নির্মল ও বিশুদ্ধ, পিতামাতা যেখানে ছোটদের বন্ধু স্বরূপ, যে বাড়িতে শিশুর নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না, আর যেখানে বয়স্করা নিজেদের আচার-আচরণে আদর্শ স্থানীয়,—সেইসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা সচরাচর মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু তবুও যদি কোন শিশু মিথ্যা বলে, তবে তার প্রকৃত কারণ কি, অনুসন্ধান করে দেখে তার মুল দূর করে, প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। শাস্তি দিলে বা অযথা ভয় দেখালে মিথ্যা কথা বলা কোনদিনই বন্ধ হবে না।

শিশুর অমনোযোগ

অনেক সময় শিশুদের সম্বন্ধে অনুযোগ শোনা যায়—"অমুক শিশু বড়ই অমনোযোগী ; কোন কিছুতেই মন দেয় না। কাজেই তাকে লেখাপড়া শেখানো একটা সমস্যা।"

শিশুর পরিবেশ প্রাচুর্যপূর্ণ হলে, আর শিশু উৎসুক মনে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারলেই শিক্ষা সার্থক হয়। সত্যিকার শিক্ষা যেখানে হয়, অর্থাৎ যেখানে শিশু নিজে আগ্রহী হয়ে শিখতে চায়, সেখানে শিশুর মনোযোগের অভাব হয় না। সুশিক্ষক যখন লক্ষ্য করবেন যে কোনও শিশু অমনোযোগী হচ্ছে, তখন তিনি জানবেন যে শিক্ষাদান কার্যটি সফল হচ্ছে না—শিক্ষক এবং ছাত্র, এই উভয়ের দিক থেকেই শোচনীয় অপচয় ঘটছে। শিক্ষকের তখন উচিত,— নিজের ত্রুটি কোথায়, তা অনুসন্ধান করা। কারণ তিনি যে-পদ্ধতিতে ছাত্রকে শেখাতে চাচ্ছেন, তা কার্যকরী হচ্ছে না—ছেলের মনকে আকর্ষণ করতে পারছেন না। এরূপ স্থলে শিক্ষককে ভেবে দেখতে হবে যে শিশুটি সব বিষয়েই অমনোযোগী, না, যে বিশেষ বিষয়টি শিক্ষক তার সামনে উপস্থিত করেছেন, তাতে সে মনসংযোগ করতে পারছে না? এজন্যই আজকাল শিক্ষাবিজ্ঞানে motivation বা শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এতটা জোর দেওয়া হচ্ছে। কেননা "Attention is interest in action"।

একেবারে ছোট শিশুদের জন্য রঙ্গীন ছবি, নাচ, গান, অভিনয়ের অবদানের কথা, শিক্ষায় যাঁরা পথিকৃৎ, তাঁরা সবাই স্বীকার করেছেন। এ সব দিয়ে সহজেই শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে, পরে সুশিক্ষা দেওয়া সহজ হয়।

বকুনি দিলে বা অমনোযোগী বলে শিশুকে অবহেলা করলে এই সমস্যার সমাধান হয় না। শিশুর মনে কোন দ্বন্দ্ব অশান্তি বা উদ্বেগ আছে কিনা— তা শিক্ষক সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে জেনে নেবেন। মায়ের কোলে নূতন ভাই বা বোনের আগমনে, ঠাকুরমার অল্পদিনের জন্য কাকার বাড়ি যাওয়ার ফলে, শিশুর কোনও প্রিয়জন মারা গেলে শিশুর অমনোযোগ স্বাভাবিক। তা ছাড়া দৃষ্টিশক্তির অথবা শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, দৈহিক অবসাদ, রোগভোগ, খাদ্যের অপুষ্টি, নিয়মিত ব্যায়াম বা খেলাধুলার অভাব—এগুলিও শিশুর অমনোযোগের কারণ হতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুর অমনোযোগের মুল

কারণ অনুসন্ধান করে, তা দূর করার চেষ্টা করলে ও শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে ভিত্তি করে শিক্ষা দিলে সুফল পাওয়া যায়।

প্রথম স্কুলে আসার সমস্যা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে অনেক সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে শিশু প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়ে, নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সে হয় অযথা কান্নাকাটি করে, নয়তো বাড়ির লোকদের আঁকড়িয়ে ধরে রাখে, সঙ্গী-সাথীর সাথে মেশে না অথবা খেলাও করে না। এদের নিয়ে শিক্ষিকা, সাহায্যকারিণী এবং বাড়ির লোক—সবাই বিব্রত হয়ে ওঠেন।

শিশু প্রথম স্কুলে এসে যে অসহায় বোধ করে বা ভীত হয়ে কান্নাকাটি করে, তার অনেক কারণ থাকে। সময় সময় দেখা যায় বড়রা ছোটদের ভয় দেখান, "এখন এত দুষ্টুমি করছ! যাও-না স্কুলে ; দেখবে কেমন শাস্তি পাও।" অথবা "স্কুলে গেলে মার খেতে হবে।" এ সব শুনে শুনে ছোটদের মনে স্কুল সম্বন্ধে একটা ভীতির সঞ্চার হয় ; তাই নূতন পরিস্থিতিতে এসে মার খাবার বা শাস্তি পাওয়ার ভয়ে সে আগেই কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। এভাবে ছোটদের ভয় দেখানো একান্তই অনুচিত।

যে পরিবারে বড়রা ছোটদের সব সময়ই অতিরিক্তভাবে আগলিয়ে রাখেন, সেই সব শিশুরা নূতন পারিপার্শ্বিকের সাথে সহজে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না ; নিজেরা অসহায় বোধ করে, এবং কান্নাকাটি করে।

যে সব শিশু মাতৃহীন, এবং স্নেহবঞ্চিত,—তাদেরও অনেক সময় নূতন পরিস্থিতিতে অসুবিধে হয়। নিরাপত্তাহীনতার বোধটি আবার তাদের মনে নূতন করে জেগে ওঠে। স্কুলে এসে প্রথম প্রথম তাই তারা খুশী হয় না।

স্কুল সম্বন্ধে ছোটদের মনে আগে থেকে যাতে কোন ভয়ের ভাব না জন্মে প্রীতিপ্রদ ভাব জাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্কুলে গেলে কত খেলতে পারা যাবে, সেখানে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা, কত বন্ধু-বান্ধব পাওয়া যায়, কেমন রঙ্গীন দোলনা চড়া যায়, স্লিপ খাওয়া যায়, প্রকাণ্ড মাঠে কত ছুটো-ছুটি করা যায়,—এ সব বলে শিশু মনকে স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করা যেতে পারে। এই স্কুলে 'মা' থাকবেন না বটে, কিন্তু ভাল দিদিমণি থাকবেন, তিনিই দেখা-শোনা করবেন, খেতে দেবেন আর কত ভালবাসবেন এই সব বলে বোঝাতে হবে। মা-বাবারা যদি স্কুল সম্বন্ধে ছোটদের এই মনোভাব তৈরী করতে পারেন,

তবে সাধারণতঃ স্কুলে গিয়ে ছোটরা কাঁদবে না। কোন কোন নার্সারী স্কুলে প্রথম থেকেই পরিচালিকা ও সাহায্যকারিণীরা শক্ত হন, এবং তাঁদের মতে—গোঁড়াতেই শক্ত হলে, প্রথম প্রথম শিশু কাঁদলেও, সে সহজেই নিয়মটাকে মেনে নিয়ে নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। আবার অনেক নার্সারীতে গোড়াতেই পরিচালিকারা এতটা শক্ত ও কঠোর হন না। এসব স্কুলে শিশুর সঙ্গে মা, ঠাকুমা, দাদু বা পুরানো ঝি বা চাকরকে কিছুদিনের জন্য স্কুলে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম শিশু তার প্রিয়জনের সঙ্গ ছাড়তে চায় না, অথবা খেলতে গেলেও, বারবারই ঘুরেফিরে ঐ বিশিষ্ট প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসে ও কথা বলে। খুব বেশী কান্নাকাটি করলে এক-একদিন শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তা না হলে ধীরে ধীরে শিশুর প্রিয়জনকে তার দৃষ্টির আড়াল থেকে সরিয়ে কাছাকাছি কোথায়ও অপেক্ষা করতে বলা হয়। ছেলে মাকে না দেখে খুঁজতে থাকলে বলা হয়—"ঐ তো মা মাঠে বসে আছেন। তুমি খেলা কর, খেলা হয়ে গেলেই মা তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন।" শিশু যখন দেখে, সত্যসত্যই তার মা মাঠে গাছের তলায় বসে আছেন, তখন সে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে খেলতে ফিরে আসে। ধীরে ধীরে তার সঙ্গী-সাথী বাড়ে—নূতন পরিবেশে সে আর দিশেহারা হয় না। শিক্ষিকা, পরিচালিকা বা সাহায্যকারিণীর সহজ সহযোগিতায় শিশু সহজে স্বাভাবিক হয়। তবে একটা **নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও** যদি শিশুর কান্না না থামে, তবে সে ক্ষেত্রে নার্সারীর কর্তৃপক্ষকে খানিকটা কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে; মা, দাদু, ঠাকুমাকে আর আসতে দেওয়া হবে না; শিশুরা মেনে নেবে যে স্কুলে মা বা দাদু থাকেন না—এটাই নিয়ম। অনেক সময় দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি বা পুজোর ছুটির পর বা রোগভোগের দরুন দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর শিশুদের মধ্যে এই নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দেয়। সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে বাড়ির লোকদের ৪।৫ দিন অল্প সময়ের জন্য নার্সারীতে থাকার অনুমতি দিলে ফল ভালই হবে—এটিই আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

অমিশুক একক শিশু

নার্সারীতে অনেক সময় এমন কিছু কিছু শিশু দেখা যায় যারা introvert অর্থাৎ অন্তর্মুখী। এ-সব শিশুরা অন্যদের সঙ্গে মিশতে বা খেলাধুলা করতে চায় না,

গোলমাল করে না, নড়াচড়া কম করে—কেমন যেন নির্জীব, বিষণ্ণ ও বৈশিষ্ট্য-বিহীন। এরা জীবনের সমস্ত উত্তেজনাকে পরিহার করে, একলা একলা সময় কাটাতে ভালবাসে। এইসব শিশুরা শিক্ষিকাদের দারুণ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে ; কারণ এদের ব্যবহার প্রাণচঞ্চল, দুরন্ত শিশুদের বিপরীত, তাই এরূপ ব্যবহারকে **অ-স্বাভাবিক** আখ্যা দেওয়া হয়।

যে শিশু বাবা বা মা—এই দুই অতি প্রিয়জনের কাউকে হারিয়েছে, অথবা গৃহে যেখানে প্রকৃত স্নেহের অভাব, যে শিশু পরিত্যক্ত বা বিধ্বস্ত গৃহের সন্তান, যে শিশু নাম-গোত্রহীন বা যে অনাথ আশ্রমে মানুষ—এইসব শিশুর মধ্যেই এ ধরনের অন্তর্মুখী ব্যবহার বেশী দেখা যায়। এরা সহজেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে,—অন্যের স্নেহ-ভালবাসায় বিশ্বাস করতে চায় না ; নিজেরাই মনে মনে স্বপ্নের জাল বোনে এবং কল্পনার জগতে বাস করতে চায়। এই ধরনের শিশুর সঙ্গে ব্যবহার, কথার সময় নার্সারীর শিক্ষিকাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ; এদের 'জড় ভরত', 'হাদা গোবিন্দ' নামে আখ্যা দিয়ে লজ্জা দিলে ফল আরও খারাপই হবে। সহানুভূতির সঙ্গে, অপরিমেয় স্নেহধারায় সিঞ্চিত করে, শিক্ষিকা শিশুর মনে অশান্তির মূল কোথায় তা জানার চেষ্টা করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মনোবৈজ্ঞানিকের সহায়তা নেবেন। অনেক সময় পরিবেশের পরিবর্তন, সমবয়স্ক শিশুসঙ্গ, নানা ধরনের কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেলে শিশুদের ঐ অস্বাভাবিক প্রকৃতির উপশম ঘটে।

অবাধ্যতা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের সব শিশুর মধ্যেই কোন না কোন সময় অবাধ্যতা দেখা যায়। বাবা, মা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা কোনও কাজ করতে বললে শিশু হয়তো তাতে কানই দেয় না, নয়তো বলে, "আমি করব না" বা "আমি পারব না"। এর কারণ কি ?

সাধারণতঃ আমরা মনে করি, যেহেতু শিশুরা বয়সে ছোট, সেজন্যই সে বড়দের বাধ্য হবে। কিন্তু বাধ্য হতে হলে শিশুকে তার নিজের যে সংযম আছে, তার চেয়েও বেশী আত্ম-সংযমে অভ্যস্ত হতে হয়। তাছাড়া ছেলেবেলায় **শিশুর ইচ্ছাশক্তি অতি প্রবল থাকে, অহং-ভাবের প্রাধান্য থাকে,** আর **একগুঁয়েমি থাকে অত্যধিক।** কাজেই 'বাধ্যতা' এই গুণটি আয়ত্ত করার

আগে শিশুকে আত্মসংযমে অভ্যস্ত করানো উচিত। খুব ছোট বয়সে **সর্বদাই** বড়দের আদেশ মান্য করতে বাধ্য করা হলে, শিশুর **নৈতিক ও বৌদ্ধিক** স্বাধীন চিন্তার ভিতটি নড়বড়ে হয়ে যায়, এবং সে আত্মশাসনে অভ্যস্ত না হয়ে, বাইরের শাসনের পক্ষপাতী হয়। বড়দের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে শিশু হয় বিদ্রোহী ও অবাধ্য, নয়তো একান্তভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

তা হলে কি ধরেই নেব যে, ছোটরা অবাধ্যতা করবেই, আর বড়রা হতবাক হয়ে তা সহ্য করবে? **তা নয়।** স্বাভাবিক শিশুকে যদি ঠিকভাবে ও ঠিক জায়গায় বাধ্য হতে অনুরোধ করা হয়, তা হলে শিশু শুধু যে মেনেই চলে তা নয়, সে বাধ্য হবে বলেই তৈরী থাকে। কাজেই বড়রা আছেন, দরকার মত তারা তাকে সাহায্য করতে পারেন—এই বোধটি থাকায়, শিশু আগ্রহী হয়ে নিজের কাজ করে যেতে পারে। শিশুকে বাধ্যতা শেখাতে হলে, সর্ব-প্রথম **বড়দের ব্যবহারে সামঞ্জস্য থাকা** দরকার। একই কাজের জন্য যদি শিশু একদিন প্রশংসা পায় এবং অন্যদিন শাস্তি পায়, তবে একই পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিত, তা শিশু বুঝতে পারে না। "শালা" গালাগালিটি শিশুর আধ-আধ উচ্চারণে "ছালা" শুনে অনেক সময় বড়রা বেশ আনন্দ পান, হাসাহাসি করেন, আর বারবার শিশুর কাছে তা শুনতেও চান। পরে হয়তো গণ্যমান্য অতিথির উপস্থিতিতে শিশু যখন ঐ শব্দটি উচ্চারণ করে প্রশংসা অর্জন করতে ও বাহাদুরি পেতে চায়, তখন তার কপালে জোটে প্রহার। বড়দের ব্যবহারের সামঞ্জস্যের এই অভাবের কারণ শিশুদের বোধের অগম্য।

২½ বা ৩ বৎসরের শিশুদের মধ্যে চরম অবাধ্যতা দেখা দেয়; তার কারণ এই বয়সে শিশু নিজে তার স্বাধীন সত্তাকে চিনতে শিখছে—সে নিজের কাজগুলি নিজে নিজেই করতে চায়, নিজের জামা খুলতে বা পরতে চায়, নিজের হাতে খেতে চায় ইত্যাদি। এই সময় বড়দের খানিকটা অসুবিধে হলেও, শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে (যেমন—চান করতে বা খেতে দিলে) আর তার স্বাধীন কাজের সমর্থন করলে শিশুর **আত্ম-সংযমের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়**, এবং **সে বাধ্য হতে শেখে।**

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশু অবাধ্য হলেও, তাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। যদি সে বড়দের আদেশ, অনুরোধ না শুনতে চায়, তবে তার কারণটি খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ দেখতে হবে বাড়িতে তার মা, বাবা বা অন্য বয়স্করা, তার স্কুলের শিক্ষিকা বা সাহায্যকারিণীরা তার সঙ্গে যথাযথ

ব্যবহার করছে কিনা, তার পারিপার্শিক তার সুস্থ বিকাশের উপযুক্ত কিনা, সে প্রচুর খেলাধুলা ও সঙ্গীদের সাথে মেশার সুযোগ পায় কিনা, অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ষিত অথবা অবহেলিত হয়ে, **সে অবাধ্যতা দ্বারা নিজেকে জাহির করতে চায় কিনা।** যে শিশু তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম পায়, সে সব সময়েই "দুষ্টু" বলে আখ্যা পায়। কাজেই শিশু অবাধ্য হলে, তাকে প্রথমেই শাস্তি না দিয়ে তার পরিবেশের পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা দরকার।

শিশুদের বাধ্যতা শেখাতে হলে **আদেশ** দিলে চলে না—তাকে **অনুরোধ** করলে কাজ সহজ হয়। "তুমি কি এ কাজ করতে পছন্দ কর?" অথবা "তুমি কি কাজটি করবে?" বললে, শিশুর পক্ষে করবে কি করবে না, option রাখলে—বড়দের প্রস্তাব সে গ্রহণ করবে না বর্জন করবে, তা স্বাধীনভাবে ভেবে ঠিক করতে পারে। আরও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, শিশু যাঁকে ভালবাসে তিনি যদি কোন কিছু করতে বলেন শিশু হাসিমুখে করে,—অন্যে বললে বলে, "পারব না"।

প্রত্যেক বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে খানিকটা অবাধ্যতা স্বাভাবিক; একে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রতিহত করতে গেলে শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অবাধ্যতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শাসনের দারকার। তবে তার পেছনে যেন বড়দের ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না থাকে, সেটা লক্ষ্য করতে হবে। এমন কতকগুলি সময় আসে যখন শিশুর নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্যের কথা ভেবে "বাধ্যতা"কে বাধ্যতামূলক করা হয়। খাবার আগে ভাল করে হাত ধোওয়া, ধার জিনিস ব্যবহার না করা, যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলা, বিশ্রী গালাগালি না করা, বিশ্রামের সময় কথা না বলা বা খেলা না করা--এগুলো শিশুকে মেনে চলতেই হয়। এখানে শিশুদের পছন্দ ও অপছন্দের কথা অবান্তর; বাধ্যতা এক্ষেত্রে পালনীয়।

চুরি করা

অনেক সময় দুই বা তিন বৎসরের শিশু চুরি করে বলে বড়রা অনুযোগ করেন। ছোট শিশুদের ব্যবহার বোঝেন না বলেই বড়দের এরূপ অনুযোগ। বস্তুতঃ এই অনুযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ছোট শিশুর আপন-পর বোধ কম,—আর সে বুঝতে পারে না যে, যে-জিনিসটি তার পছন্দ, সে কেন তা নিতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অপরের জিনিস নিলেও, তাকে "চোর" বলে অপরাধী করা চলে না। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে জিনিসটি **তার নিজের নয়—অপরের।** আর অন্যের কোনও জিনিস নিলে, তা ফিরিয়ে দিতে হয়।

নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের অনেক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বাড়ি যাবার আগে প্যাণ্টের পকেট বা ফ্রকের পেটের কাছটা উঁচু হয়ে রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে কি আছে দেখতে চাইলে, শিশুরা সরল মনে পকেট উজার করে লাল নীল কাঠের টুকরো বের করে দেয় অথবা ফ্রকের ভেতর থেকে অম্লানবদনে বল বা পুতুল বের করে আনে। সাধারণতঃ বিশেষ কোনও দুরভিসন্ধি নিয়েই যে শিশুরা এ কাজ করে, তা নয়,—রংচঙে খেলনায় আকৃষ্ট হয়ে শিশু সেই সব খেলনা নিজের কাছে রাখতে চায়। কিন্তু যদি দীর্ঘদিন ধরে শিশুর এই প্রবণতা চলতে থাকে, তবে অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে যে ঐ শিশুর হয়তো নিজের বলে কোনও খেলনা নেই, অথবা যদিও বা আছে হয় তা ভাঙা, নয় বিবর্ণ। এক্ষেত্রে তাকে কোন একটি খেলনা একেবারে দিয়ে দিতে পারলে, সাধারণত শিশুর এই অভ্যাস দূর হয়ে যায়। যদি তাতেও সুফল না হয়, তবে বুঝতে হবে শিশুর এই বদভ্যাসের পেছনে অন্য গুরুতর কারণ বর্তমান।

শিশু কেন চুরি করে, তার কতকগুলি কারণ হল—(১) বাড়ি বা পারিপার্শ্বিকের ঘটনা শিশুকে চুরি করতে প্রণোদিত করে। একান্নভুক্ত পরিবারের সকলেই যদি একই সাবান বা একই কৌটার পাউডার ব্যবহার করতে থাকে, তবে সেই পরিবারের শিশুর আপন-পর জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম হয়—অন্যের কোনও জিনিস নেওয়া **উচিত বা উচিত নয় ;** তা সে বুঝতে পারে না। (২) বয়স্কেরা যেখানে ছোটদের জিনিস তাদের **অনুমতি না নিয়ে** ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে তারা ছোটদের ও বড়দের জিনিস ব্যবহারে অনুরূপ কার্যে উৎসাহিত করে। (৩) শিশু-বয়সে স্কুল বা অন্য বাড়ি থেকে কোন জিনিস নিয়ে এলে যদি শিশুকে উৎসাহিত করা হয়, তবে তা শিশুর ভাল লাগে এবং চুরি করা ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। পরে সে যখন ঐ একই কাজ করে, তখন শাস্তি পেলে সে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে না। (৪) বাড়িতে যদি অশান্তি বা ঝগড়াঝাটি চলতে থাকে, তবে অনেক সময় শিশু তার নিরাপত্তার অভাব চুরির মাধ্যমে প্রকাশ করে। (৫) বাড়ির সবচেয়ে ছোট শিশু বা পরিবারের একক শিশু অত্যধিক আদরে প্রতিপালিত হয়, সে অনেক সময় তার ইচ্ছা পূর্ণ না হলে, চুরি করে সে অভাব-বোধ মেটায়। (৬) যে শিশু অতি কঠোর শাসনে মানুষ হচ্ছে, যাকে সকলেই **সমালোচনা বা উপহাস** করে, সে শিশু অনুভব করে যে সে বাড়িতে **অবাঞ্ছিত**—সেই সব শিশু অনেক সময় চুরি করে। অন্য শিশুরা

যদি কোন ছেলেকে সর্বদাই খ্যাপায় বা অবহেলা করে, তা হলে অনেক সময় দেখা যায়, সে শিশু টাকাপয়সা চুরি করে, তা দিয়ে লজেন্স, টফি ইত্যাদি কিনে সঙ্গীদের বিতরণ করে জনপ্রিয় হতে চাইছে। (৭) মায়ের বা মাতৃসমা স্নেহময়ীর মৃত্যুর পর, বা ছোট ভাইবোনের জন্মের ফলে মায়ের কোলটিকে হারাবার ভয়ে, অথবা বাবা মারা গেলে মা যেখানে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, সে সব ক্ষেত্রে শিশু চুরি করতে শুরু করে—চুরি করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শিশু নিজের প্রক্ষোভজনিত অশান্তির উপশম খোঁজে। (৮) উপযুক্ত খেলাধুলার সরঞ্জাম ও খেলা করার বিস্তৃত জায়গার অভাবেও অনেক শিশু চুরি করে। কারণ শিশুর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনাত্মক স্পৃহা সুস্থ প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে, চুরি করে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে। (৯) তাছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, শিশু চুরির জন্যই চুরি করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অমীমাংসিত সংঘাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এসব শিশু চুরি করে—এই অপরাধকে **Kleptomonia** বলা হয়। ধরা পড়লে এরা মিথ্যা কথা বলে না—স্বীকার করে যে চুরি করেছে। এদের চিকিৎসার জন্য মনোচিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন।

উপরে যে কারণগুলো দেওয়া হল প্রতিটি ক্ষেত্রে কারণ নির্ণয় করে ও তার সমাধানের চেষ্টা করলে শিশুর চুরি করা বন্ধ হবে। শিশুর নিজস্ব সঞ্চয়, নিরাপত্তা-বোধ, স্নেহপূর্ণ পারিবারিক আবহাওয়া, খেলাধুলা ও সৃজনাত্মক কাজের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শিশু সঙ্গ—এ সব কিছুই শিশুকে চুরির প্রবণতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। শিশুরা একটু বড় হলে তাদের **বিশ্বাস করে দায়িত্ব দিলে,** তারা প্রাণপণে সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করে। জিনিসপত্র বা টাকা-পয়সা সরিয়ে নিতে বা চুরি করতে চেষ্টাও করে না।

শিশুর ভয়

শিশুর ভয় নানা প্রকারের হতে পারে। সে কোন বড় বা লোমশ জন্তু, পুলিশ, ডাক্তার, অন্ধকার, অপরিচিত লোক, উচ্চ শব্দ—এসব কিছুকেই ভয় করতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে শিশুর ভয় জন্মগত ; কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের দরুন শিশুর ভয় **Conditional** অর্থাৎ কৃত্রিম ও অবস্থা-সৃষ্ট। অন্ধকার ঘরে শিশু কিছুই দেখতে পায় না ; এই সময় হঠাৎ যদি কেউ "তোকে ভূতে খেয়ে ফেলবে" বা "ওরে বাবা! জুজুতে ধরলো রে"—বলে

উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে ভয় দেখায়, তবে জুজু বা ভূতের ভয় ও অন্ধকারের ভয় এক হয়ে যায় ; এতে শিশু অন্ধকার ঘরে যেতে ভয় পায়। **একবার ভয় পেলে, শিশুদের ঐ ভীতি সহজে দূর করা যায় না।** তাকে 'ভীতু', 'কচি খোকা', 'বোকা'—এসব বলে উপহাস করলে কোন লাভই হয় না। বরং তাকে উপযুক্ত ভাবে সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়া প্রয়োজন। অন্ধকারের ভয় দূর করতে হলে, শিশুকে হাত ধরে অন্ধকার ঘর বা কোন অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আলো জ্বালিয়ে তাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে সে স্থানে ভূত, জুজু, রাক্ষস, খোক্কস এসব কিছুই নেই। বার কয়েক আলো জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে দেখালে ক্রমে শিশু অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে—আর ভয় পাবে না। শোবার সময় ঘর অন্ধকার না করে, ঘরে মৃদু আলো জ্বালিয়ে রাখলে অনেক শিশু এই ভয় থেকে মুক্তি পায়।

শোবার আগে শিশুদের রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য দানব, তাদের নিষ্ঠুরতা বা অমানুষিকতা অথবা অন্য কোনও তীব্র হিংস্র কাহিনী না বলাই শ্রেয়। এতে অনেক সময় রাত্রে ছোটরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তাদের বুক ধড়ফড় করে, গায়ে ঘাম দেখা দেয়।

কোন কোনও শিশুর অপরিচিত লোক সম্বন্ধে অযথা প্রচণ্ড ভয় থাকে। এ-ভয়টা যে অবস্থা-সৃষ্ট, তা, আমাদের নার্সারীর একটি বাচ্চার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। ছোট ২½ বৎসরের মেয়ে মিনু বেশ হাসিখুশী। একদিন তার বাড়িতে জলের পাইপ মেরামত করতে কিছু লোক এসেছিল। স্বভাবতঃই তারা প্রচণ্ড শব্দ করে বাড়ির অংশ ভেঙে ফেলেছিল। এই দেখে মিনুর কী কান্না—"আমাদের বাড়ি ভেঙ্গে ফেলল—আমরা কোথায় থাকব!" বাড়ি ভাঙার জন্য নিরাপত্তার অভাব পরে প্রতিফলিত হল ঐ নূতন লোকদের ওপর। এরপর থেকে মিনু অন্য কোন লোকের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারত না,—নূতন কাউকে দেখলে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। ডাক্তার বা মনোবৈজ্ঞানিককে দেখাবারও কোন উপায় ছিল না। দিনে দিনে মিনু অত্যন্ত রোগা ও খিটখিটে হয়ে উঠল। তখন বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিলেন—পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন করলে হয়তো মিনুর উপকার হবে। মিনুর বাবা-মা অনেক কষ্ট করে ওকে দূরে সিমলায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য নিয়ে গেলেন। ট্রেনে ওঠার সময়ও সমস্যা—মিনু কোন লোক দেখতে চায় না, সারাক্ষণই মায়ের কোলে চোখ বুজে থাকছে। ভাগ্যক্রমে ছোট্ট একটি "কুপ" পাওয়া গিয়েছিল। তাতে চড়ে মিনুরা

সিমলায় গিয়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে সে স্বাভাবিক হয়—নূতন লোক দেখলে আর ভয় পায় না।

সাধারণতঃ হয়তো ছোট শিশু একটা কুকুর বা লোমওয়ালা জন্তু দেখে ভয় পায় না। কিন্তু শিশু সেই জন্তুকে আদর করার সময় হঠাৎ যদি কুকুরটা আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে ওঠে, আর তার ফলে শিশুটি উলটে পড়ে যায়, তবে তার কুকুর সম্বন্ধে ভীতি জন্মাবে। কুকুরটিকে আদর করার সময় হঠাৎ যদি সে খুব জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে, তবে সেই উচ্চ শব্দে শিশু ভয় পাবে,—আর তার সেই ভীতি কুকুর বা অন্য কোনও লোমশ প্রাণীর ওপর বর্তাবে। এই ধরনের ভয় ভাঙা একদিনের কাজ নয়। এতে দীর্ঘদিনের সাধনা ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবারা ছোটদের পুলিশ সম্বন্ধে অযথা ভয় দেখান। "দুধ না খেলে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে", শীগ্‌গির চুপ করে ঘুমাও, নইলে পুলিশ এসে মারবে"—এই ভাবে মায়েরা ছোটদের পুলিশের ভয় দেখিয়ে বাধ্য বা শান্ত করার চেষ্টা করেন। মায়েদের এই অমনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারের ফলে শিশুরা অযথা পুলিশ সম্বন্ধে ভীত হয়; রাস্তায় বা গলির মোড়ে পুলিশ দেখলে চিৎকার করে কাঁদা বা বড়দের শক্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে—এরূপ দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। পুলিশ যে আমাদের কত উপকার করে—আমাদের শত্রুদের ধরে আটকিয়ে রাখে, রাস্তা হারিয়ে গেলে ছোটদের সাহায্য করে—সে যে আমাদের বন্ধু। এ-ভাবটা প্রথম থেকে শিশুদের মধ্যে জাগাতে পারলে—অহেতুক ভয় কেটে যাবে।

ছোটদের ভয় দূর করা খুব সহজ ব্যাপার না হলেও, বয়স্কেরা তাদের পরিণত বিচার-বিবেচনা দ্বারা ও সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা অনেকক্ষেত্রেই শিশুদের ভয়-নিবারণে সহায়তা করতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে এবং আবারও বলছি যে, শিশু ভীত হলে, তাকে লজ্জা দেওয়া বা দোষী ভাবা ঠিক নয়, কারণ এতে ফল খুবই খারাপ হয়। **প্রথমতঃ**. এতে শিশুর ভয় তো কাটেই না, বরং শিশু সে ভয়টাকে প্রকাশ **না করে চেপে রাখে।** **দ্বিতীয়তঃ**, বড়দের এ ধরনের বিরূপ ব্যবহারে **শিশু নিজেকে অপরাধী মনে করে।** এ দুটোই তার সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত করে।

কুকুর বা অন্য লোমশ জন্তু নিয়ে যে শিশুরা ভয় পায়, তাদের ভয় ভাঙাবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা যায়—বড়দের কেউ খুব ছোট্ট ও সুন্দর লোমওয়ালা কুকুরকে শিশুর সামনে আদর করবেন ও খেতে দেবেন—ফলে কুকুরটি লেজ নাড়বে ও খেলা করবে। ২।৪ দিন শিশু এভাবে কুকুর দেখার পর, বড়রা

কুকুরের গায়ে হাত বোলাবেন ও শিশুকেও তা করতে বলবেন। প্রথম দিন শিশুটি হয়তো আঙ্গুলের আগা দিয়ে কুকুরটিকে একবারমাত্র ছুঁয়ে দেখবে ; ক্রমে তার ভয় ভেঙে যাবে—সে কুকুরকে খেলতে দেখলে খুশী হবে, হয়তো বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে তাকে খেতে দেবে—তারপর আস্তে আস্তে সে নিজেই কুকুরের সঙ্গে খেলবে। এমনি করে সহানুভূতি, ধৈর্য ও তিতীক্ষার পর, শিশুর ভয় ভেঙ্গে যায়।

কিন্তু সব শিশুর সব ভয় এত সহজে দূর হয় না। অতীতের কোন বিস্মৃত ঘটনার সঙ্গে যে ভয় জড়িত, তার মূল বের করা সাধারণের পক্ষে সহজ কাজ নয় ; এ সব ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসকের সাহায্য দরকার।

তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে শিশু যদি সুস্থ ও স্নেহপূর্ণ পারিবারিক আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে, তার মা, বাবা যদি ভয়-উৎপাদক অনেক কথা ও কাজ পরিহার করতে পারেন। শিশুকে যদি অবাধ স্বাধীনতা ও পরিণত guidance দেওয়া যায়, তার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তবে সেই শিশুর জীবনে ভয় উপস্থিত হলেও, তা স্থায়ী হয় না বা কোন স্থায়ী কুফল রেখে যায় না।

বুদ্ধিমান মা-বাবা ছেলেকে সাবধানে রেখে মানুষ করার চেষ্টা করলেও, বাইরের থেকে অনেক সময় শিশু ভয়ের উপাদান সংগ্রহ করে। অশিক্ষিত ঝি, চাকর অথবা স্কুলের অপরিণত সঙ্গীসাথীর কাছে খুন-জখম, ভূত-পেত্নী, স্কন্ধকাটা, একানোড়ে, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনে তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়—তাই হঠাৎ শিশুটি অন্ধকারে যেতে বা একা থাকতে ভয় পেতে আরম্ভ করে। শিশুদের এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই বাবা-মার দৃষ্টি এড়ায় না। তাকে **বকাঝকা না করে** অথবা **নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ** না করে কৌশল করে জেনে নিতে হবে—স্কুলে বা ঝি, চাকরের কাছে সেদিন সে কি গল্প শুনেছে। ছেলে সরল মনে সব কথা বলে ফেলে ; তাতে তার ভয়ের কারণ বুঝতে পারা যায়। বুদ্ধিমান মা-বাবা তাকে ভূত-পেত্নী, রাক্ষস-খোক্কসের যে কোন অস্তিত্ব নেই—এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারলে তার ভয় কেটে যায়।

মনের মধ্যে যে শিশু ভয় পোষণ করে রেখে বেড়ে ওঠে, সে বড় **হয়েও কোন কাজ সুসম্পন্ন** করতে অপরাগ হয়, **আর সুস্থ ও সুখী জীবন যাপন করতে পারে না**। কেননা, ভয় মানুষের প্রক্ষোভ-জীবনের অন্যতম প্রধান ধ্বংসাত্মক বৃত্তি।
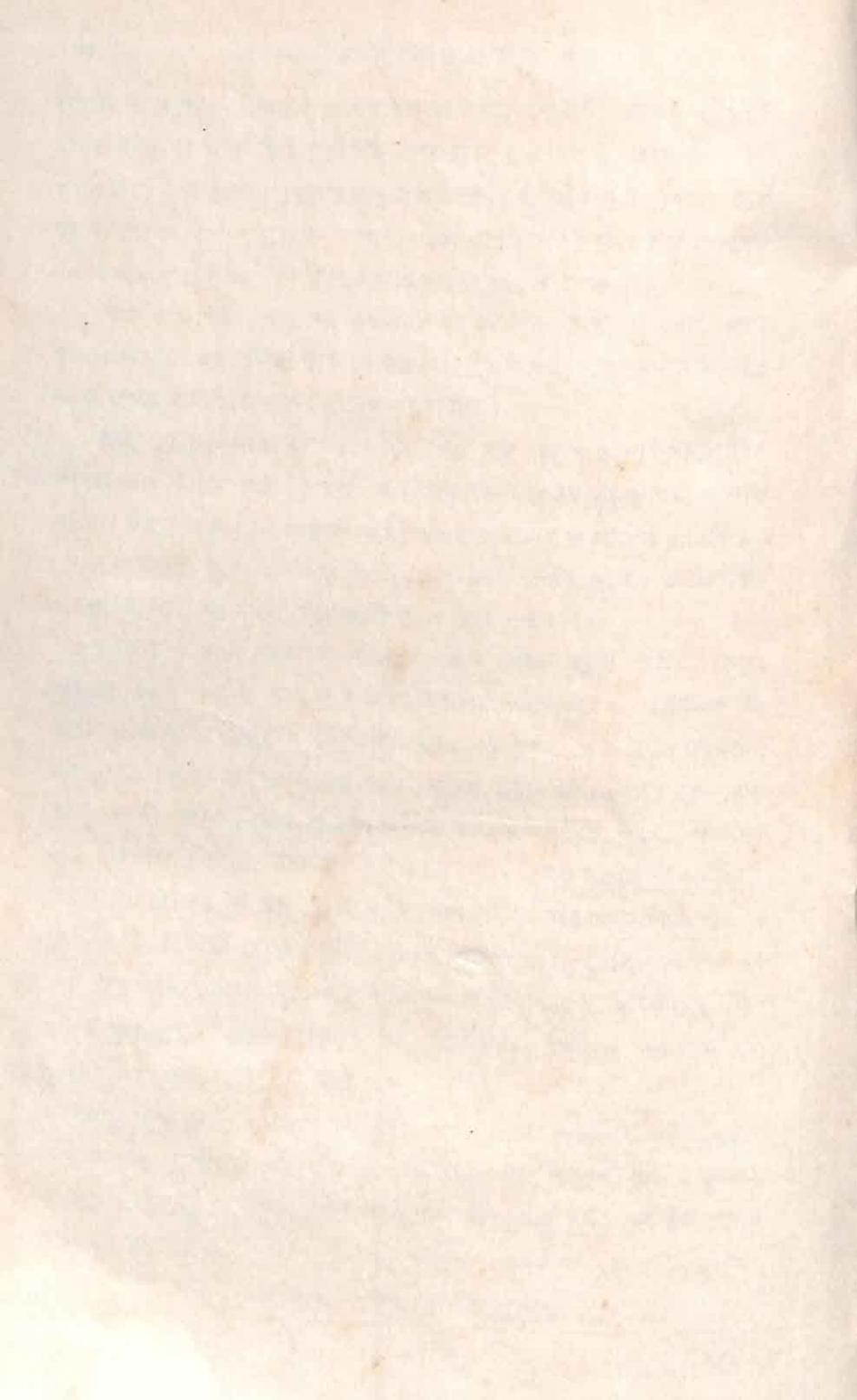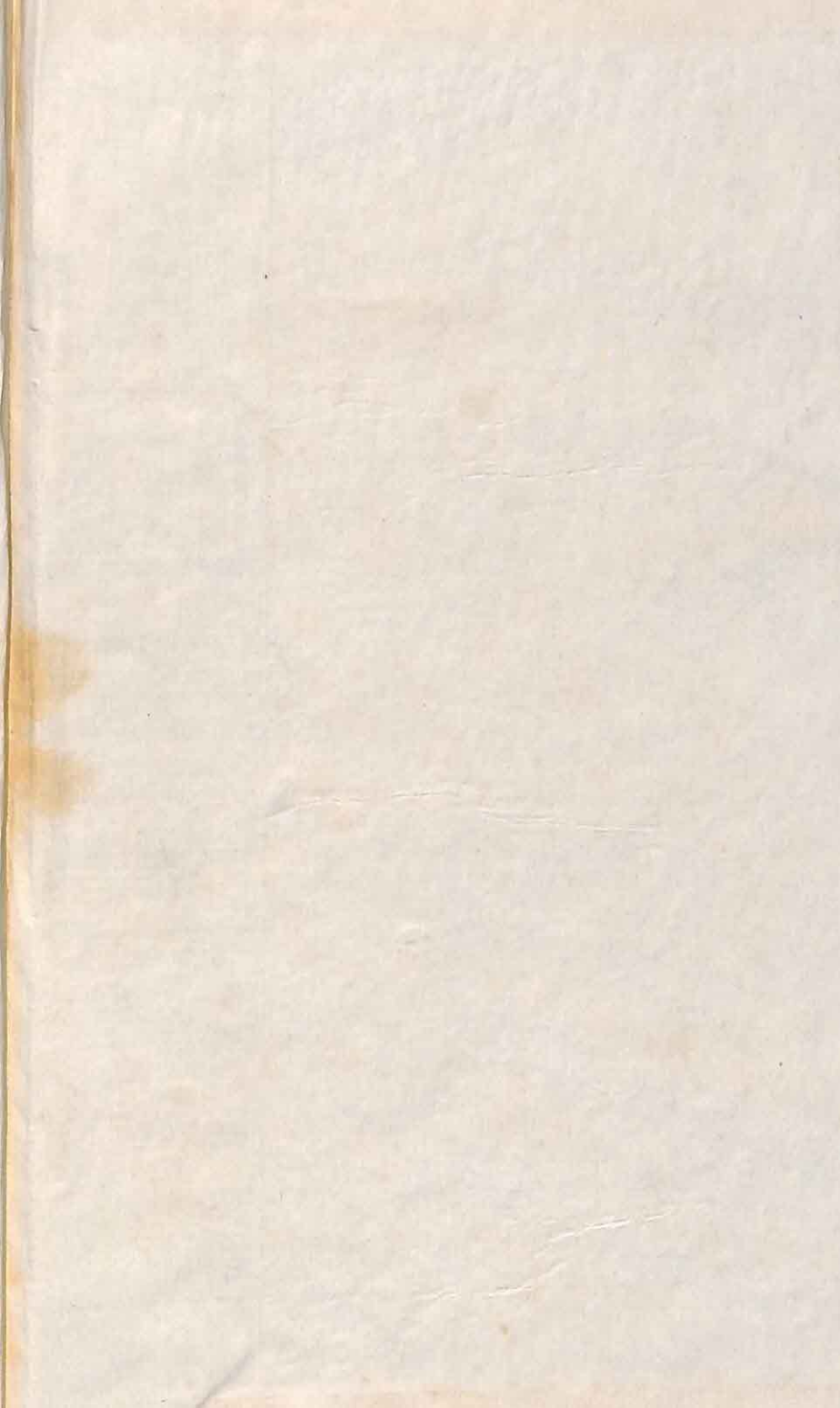
শিশুশিক্ষা শিক্ষণ ক্ষেত্রে অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্নুবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রসংসদি লব্ধকীর্তি। বহু বছর ধরে উনি বি-এড ক্লাসে অধ্যাপনায় রত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মডেল নার্শারী বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভারও এঁর উপর ন্যস্ত ছিল। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ফুলব্রাইট ও স্মিথ-মাণ্ড স্কলার হিসাবে শিশুশিক্ষায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আমাদের দেশের উপযোগী করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে লেখা এই বইখানা লেখিকার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।